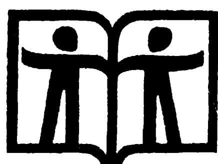
মূক ধরণীর মৌন জীবন-গান

মূক ধরণীর মৌন জীবন-গান



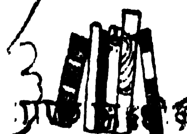
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদসজ্জা :
বিশ্বনাথ দাস

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীশুকদেব চন্দ্র চন্দ্র
বিবেকানন্দ প্রেস,
১১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬



উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশে



"চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—আধুনিক ভারতীয়
ভাষার বিকাশ"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে বইটির মূল্য সুলভ করা সম্ভব হয়েছে।

কথা কও

যে-কোনও এক টুকরো পাথর। আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ। প্রয়োজনীয় বস্তুদের পংক্তিতে পড়ে না। কোন দামই হয়তো তার নেই। তুচ্ছ এক টুকরো পাথর ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু তার তুচ্ছতার আবরণ ভেদ করে যদি চিনতে চেষ্টা করি, তাহলে দেখব যে, তার খণ্ড-বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সে, তার অন্তর্নিহিত জড় উপাদানগুলি সব ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর স্তরে স্তরে। তখন বুঝতে পারি যে সামান্য পাথরের টুকরোটি যেন পৃথিবীর একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ।

বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে গেলে এক টুকরো পাথর কয়েকটি খনিজের সমষ্টি। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তা যেন পৃথিবীর আত্ম-চরিতের একটি বিচ্ছিন্ন পাতা। সৃষ্টির আদি পর্ব থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিবর্তনের বিভিন্ন ক্রমগুলির মধ্যে এই পাথরের টুকরোটিরও নিজস্ব স্থান আছে। যথাস্থানে তাকে স্থাপিত করলে তার ভেতরকার প্রচ্ছন্ন বক্তব্য হবে ব্যক্ত।

পাথরের জড়তার আড়ালে অনেক কথা জমা আছে। সেই সব কথা বুঝতে চেষ্টা করেন ভূতত্ত্ববিদ্‌রা। পাথরে প্রচ্ছন্ন শিলালিপির পাঠোদ্ধারের জন্য তাঁরা চেষ্টা করেন।

এক টুকরো বেলেপাথর। বালি পাথরে জমাট বেঁধেছে। দেখতে গেলে এ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বালির কণাগুলির মধ্যে আছে তাদের গড়ে-ওঠার ইতিহাসের স্বাক্ষর। পাথরে জমাট বাঁধার আগে বালি জমেছে। কোটি কোটি বছর আগে জল বা বাতাসে বাহিত হয়ে অনুকূল আধারে সঞ্চিত হয়েছে। জলের আধারে ধরা পড়ে থাকা বালির কণায় জলের স্বাক্ষর পড়েছে। সে জল শান্ত হ্রদ, কি উত্তাল সমুদ্র, বালির কণার মধ্যে তার ইতিহাসও হয়েছে চিহ্নিত। নদীর ধারাপথে বালি জমে থাকলে জলের স্রোতের সূক্ষ্ম রেখাগুলি বালিতে উৎকীর্ণ হয়েছে। পাথরে জমাট বাঁধার সময়ও এই চিহ্নগুলি থেকে গেছে। তাদের দেখে কোটি কোটি বছর আগেকার বিলুপ্ত কোনও সমুদ্র, হ্রদ বা নদীকে চিনেছি আমরা।

মাঝে মাঝে মরুভূমির বালি পাথরে জমাট বেঁধেছে। সেই মরুভূমি লোপ পেলেও পাথরের বালির কণায় তার স্বাক্ষর বিরাজ করে। মরুভূমির বালিতে জলের চিহ্ন পড়ে না, বাতাস বয়ে এসে বলিরেখা আঁকে। বালি যখন পাথরে

পরিণত হয়, বলিরেখাগুলি পাথরে উৎকীর্ণ হয়ে থাকে। লুপ্ত মরুভূমির স্মারকলিপি তারা।

হিমা ‘য় পর্বতমালার কঠিন কাঠামো রচিত হয়েছে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত পাথর দিয়ে। এই পাথরগুলি হিমালয়ের আকাশ-ছোঁয়া উত্তুঙ্গতাকে সম্ভব করেছে। তারা মূর্তিমান ঋজুতা। সমতল ভূমির নরম মাটির সঙ্গে তাদের সুস্পষ্ট বিরোধ রয়েছে।

কিন্তু যদি হিমালয়ের স্তরগুলিকে পরীক্ষা করি, তা হলে দেখতে পাব যে, তাদের মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণীদের দেহের অবশেষ রয়েছে। তারা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে যে, পাথরের স্তরগুলির উৎপত্তি সমুদ্রের গর্ভেই হয়েছিল।

হিমালয়ের পাথরে প্রোথিত সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, কোটি কোটি বছর আগে হিমালয়জোড়া বিপুল একটা সমুদ্র ছিল। হিমালয়ের শিলাস্তরগুলি সেই সমুদ্রের সঞ্চয়। তাদের অঙ্গে অঙ্গে সমুদ্রের চিহ্ন। সমস্ত হিমালয় জুড়ে একটি মহাসমুদ্র সংহত হয়ে আছে।

রাস্তা তৈরি বা মেরামতের জন্য শক্ত কালো পাথর ব্যবহার করা হয়। তাকে আমরা রোড্ মেটাল (Road metal) বলে জানি। সে পাথর আমাদের নজরে আসে প্রায়ই, কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না কখনও। নিতান্তই সাধারণ পাথর। শক্ত বলে সড়কে তার ব্যবহার। নয়তো ব্যবহারে আসত না।

কিন্তু এই পাথরের এক টুকরো তুলে নিয়ে যদি পরীক্ষা করি, তাহলে দেখতে পাব যে আগ্নেয়গিরির লাভা (Lava) থেকে তার সৃষ্টি। পাথরের টুকরোটি আমাদের কাছে ব্যক্ত করে কোটি কোটি বছর আগেকার কোন আগ্নেয়গিরির অগ্নিপ্রবাহের ইতিহাস।

পাথর যেন পুঁথি। পৃথিবীর ইতিহাসের এক এক টুকরো তার মধ্যে ধরা আছে। ভূবিদের কাজ হল তার পাঠোদ্ধার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক পঠন-পাঠনে যখন রত ছিলাম, অধ্যাপকরা বলেছিলেন যে পুঁথিগত জ্ঞান আহরণ বা ল্যাবোরেটারিতে পাথর বা খনিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যথেষ্ট নয়—প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে পাথরের ভাষা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

অধ্যাপকদের ইচ্ছামত আমাদের জন্য প্রকৃতি-পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। পাহাড়-পর্বতে অরণ্য প্রান্তরে বহু যোজন অতিক্রম

করেছি আমরা। মাটির সবুজ আবরণের অন্তর্নিহিত মূক ধরণীর মৌন জীবন-গানকে শুনতে চেষ্টা করেছি। লক্ষ যুগের নীরবতার মধ্যে সংহৃত বাণীকে চেয়েছি জেনে নিতে। মাটি ও পাথরের প্রতিটি কণার কথা চেয়েছি শুনতে।

নানা জায়গায় পর্যটন করে আমরা কেওঞ্ঝরের বড়বিলে এসেছিলাম। এখানকার নিবিড় অরণ্যে প্রচ্ছন্ন আছে ম্যাঙ্গানিজ ও লোহা। বড় বড় কালো পাথরের পিণ্ডে ম্যাঙ্গানিজ আছে কয়েকটি রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে। ম্যাঙ্গানিজের পাশাপাশি আছে লোহার পাহাড়। বিশুদ্ধ লোহা নয় অবশ্য—অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে আছে। লোহা ও অক্সিজেনযুক্ত খনিজকে বলে হেমাটাইট (**Hematite**)। দেখতে প্রায় লোহার মত। অধ্যাপকের নির্দেশে ম্যাঙ্গানিজ ও লোহার সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করি।

অধ্যাপক আমাদের বললেন, ভাল করে খুঁটিয়ে দেখ। যা স্থূল, তাতো চোখে পড়বেই। সূক্ষ্ম খুঁটি-নাটিগুলোর দিকেও নজর দেওয়া চাই। পাথরের কণার নিজস্ব বক্তব্য আছে। যত দেখবে, ততই তা পরিস্ফুট হবে তোমাদের কাছে। দেখবার মত যদি চোখ তোমাদের থাকে, তোমাদের চোখের সামনেই ব্যক্ত হবে সব রহস্য—আমাকে আর বকতে হবে না।

অধ্যাপকের উপদেশের প্রেরণায় আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে যথাসম্ভব সজাগ রাখার চেষ্টা করি। যা কিছু দেখি, দু চোখ ভরে দেখি। যথাসম্ভব সতর্কও হই, যাতে কিছুই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়।

লোহার খনিজ হেমাটাইটের সৃষ্টির রহস্যভেদের জন্য থরে থরে সাজানো হেমাটাইট পাথর পরখ করি। বিশুদ্ধ হেমাটাইটের নীচে হেমাটাইট ও কোয়ার্টজের (**Quartz**) সংমিশ্রণ ঘটেছে। দুয়ের মাঝখানে হেমাটাইটের উৎপত্তির কারণের দিশারি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার চিহ্ন খুঁজি তন্ন তন্ন করে। কিন্তু পাথরের স্তরগুলির ওপরে সময়ের প্রলেপ পড়েছে। তাদের উৎপত্তির সময়কার মূল বিন্যাসে এসেছে বিশৃঙ্খলা। মৌল রাসায়নিক ক্রিয়ার চিহ্নগুলির ওপরে ক্ষয়ের ছাপ পড়েছে। যাকে খুঁজছিলাম তাকে পেলাম না, লোহার পাহাড়ের উৎপত্তি-তত্ত্ব নাগালের বাইরেই রয়ে গেল।

অধ্যাপক বলেছিলেন যে, ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেই পাথরের ভেতরকার উহ্য রহস্য ব্যক্ত হবে। কিন্তু দেখতে গিয়ে দেখি যে, বাজে জিনিস এসে ভিড় করেছে চোখের সামনে। রহস্য রইল অব্যক্ত। জড় শিলাস্তরের মৌনভঙ্গ হল না।

স্থানীয় লোহার খনির ম্যানেজার ষষ্ঠীচরণবাবু আমাকে প্রশ্ন করলেন, পাথরে হাতুড়ি ঠুকে, কম্পাস কষে অত যে দেখেছেন, হদিস কী কিছুর মিলছে?

ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে আমি বললাম, মিলছে না। ব্যাপারটি বেশ জটিল।

—জটিল বলে জটিল! সব জটিলতা এখানে এসে যেন জটলা পাকিয়েছে। একটানা বিশ বছর ধরে এখানে কাজ করছি—কিন্তু আজ পর্যন্ত জট ছাড়াতে পারি নি। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার কী জানেন—এখানকার আদিবাসীরা এই পাথরগুলোকে যেন আদ্যোপান্ত বুঝে নিয়েছে। তারা ভূতত্ত্বের ধার ধরে না, অথচ পাথরগুলিকে খুব অন্তরঙ্গভাবে চেনে। হেমাটাইটকে হেমাটাইট বলে যদিও চিনতে পারবে না, কিন্তু পাথরে পাথরে সূক্ষ্মতম পার্থক্যও ওরা নির্ভুলভাবে ধরে ফেলবে।

ঈষৎ হেসে আমি বলি, তাহলে আর আমরা খেটে মরি কেন? ওদের হাতে এ-সব ছেড়ে দিলেই তো হয়!

ম্যানেজার বললেন, আমার কথা বোধ হয় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। বেশ, নিজের চোখেই দেখবেন, চলুন।

ম্যানেজারকে অনুসরণ করে খনির পাশে একটি লম্বা চালাঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকি। তার ভেতরে দুধারে সারি দিয়ে বসে আছে প্রায় চল্লিশজন আদিবাসী মেয়ে। তাদের সামনে স্তূপ করা আছে তাল তাল হেমাটাইট পাথর। এক একটি পাথরের তাল তুলে এনে বসাচ্ছে তারা বড় বড় নেহাইয়ের ওপর। তারপর হাতুড়ির আঘাত হেনে তাদের টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। অবশেষে পাথরের টুকরোগুলোকে ভাগে ভাগে সাজিয়ে ফেলছে তারা। দেখে মনে হল যেন শ্রেণীবিভাগ করা হচ্ছে।

কালো রংয়ের একই ধরনের পাথর। পাথরের টুকরোগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যাচ্ছিল না। অথচ তাদের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম পার্থক্য আদিবাসী মেয়েরা যেন প্রত্যক্ষ করেছে।

ম্যানেজার বললেন, এগুলো আমাদের খনির হেমাটাইট। দেখলে মনে হবে যেন একই ধরনের হেমাটাইট। এদের একই রকম মজবুত গড়ন ও কালো রং দেখে মনে হয় যেন এদের মধ্যে লোহার পরিমাণের কোন তারতম্য নেই। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শতকরা প্রায় দশ ভাগ পর্যন্ত তফাৎ রয়েছে। শতকরা ষাট ভাগ লোহাযুক্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হেমাটাইটের পাশাপাশি সহাবস্থান করছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লোহাযুক্ত মধ্যম শ্রেণীর

হেমাটাইট। অথচ খালি চোখে তা বোঝার জো নেই। রাসায়নিক পরীক্ষা করলে তবে তার হদিস মেলে। কিন্তু এই আদিবাসী মেয়েরা চোখে দেখে ও হাত দিয়ে নাড়াচড়া করে লোহার পরিমাণের তারতম্য অনুযায়ী পাথরগুলিকে ভাগ করে ফেলছে অনায়াসেই। আপনার সামনে যে মেয়েটা বসে আছে, সে, দেখুন পাশাপাশি তিনটে স্তূপ সাজিয়ে ফেলেছে। তার বাঁ পাশের স্তূপটিতে লোহার পরিমাণ হল শতকরা পঞ্চাশ থেকে বাহান্ন—মাঝেরটিতে আছে শতকরা পঞ্চান্ন থেকে সাতান্ন ভাগ লোহা এবং ডান পাশেরটিতে রয়েছে শতকরা আটান্ন থেকে ষাট ভাগ লোহা। কেমিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করান, দেখবেন লোহার পরিমাণ অনুযায়ী পাথর বাছতে মেয়েটি একটুও ভুল করেনি।

আপনাদের তাহলে কেমিস্টের দরকারই হয় না!—আমি বলে উঠি।

—দরকার হয় না, তা নয়। কারণ কেমিকেল টেস্টের রিপোর্ট না দিলে গ্রেড ঠিক করা যায় না। গ্রেড ঠিক না হলে সঠিক মূল্য মেলে না। কিন্তু কেমিস্টের কাজ খুব সহজ করে দিয়েছে এই মেয়েরা। টেস্ট করার আগেই কেমিস্ট বুঝে যান লোহার পরিমাণ শতকরা কত হবে।

—আশ্চর্য ব্যাপার, সন্দেহ নেই! কিন্তু কী করে বোঝে ওরা? পাথরের রং বা গড়নের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন পার্থক্য ওরা দেখতে পায়, যা আমাদের চোখে পড়ে না।

—হয়তো তাই। কিন্তু ওদের প্রশ্ন করে দেখুন, ওরা বলতে পারবে না। ব্যাপারটা ওদের কাছে এতই সহজ যে, এ নিয়ে কৌতূহলকে ওরা কৌতুকজনক মনে করে। আসল কথা কী জানেন, যা আমরা ভূ-বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়ন-শাস্ত্রের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি, তা ওরা সোজাসুজি বুঝে নেয়। আপনারা শুনে হয়তো হাসবেন, কিন্তু আমার তো মনে হয় যে, এই পাথরগুলোর ভাষা ওরা বোঝে। আমাদের কাছে পাথরগুলো বোবা, কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা কয়।

আমার সামনে বসে যে মেয়েটি পাথর বাছছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে আমি প্রশ্ন করলাম, বেছে বেছে আলাদা করছ কী করে বুঝিয়ে দেবে আমাকে? আমি তো কোন তফাৎ দেখিনে।

মেয়েটি নিৰ্বাক। আমার কথা যেন তার কানেও যায় না। আর সব মেয়েরা হাসতে থাকে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে।

ওরা হাসছে কেন? —হতবুদ্ধি হয়ে আমি ম্যানেজারকে প্রশ্ন করি।

ম্যানেজার হেসে জবাব দেন, যে মেয়েটিকে আপনি প্রশ্ন করলেন, সে জন্ম থেকেই বোবা—কানেও শোনে না। মানুষের ভাষা তার কানে যায়নি কখনো। তাই ওরা হাসছে।

আমি চুপ করে থাকি। শব্দময় পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও মূক-ধরণীর মৌন ভাষা মেয়েটি কী করে বুঝল, ভেবে পাই নে। মানুষের ভাষা তাকে স্পর্শ করে না, অথচ পাথরের ভাষা সে বোঝে। তাই সে পাথরগুলোকে থরে থরে সাজিয়ে যাচ্ছে অনায়াস নৈপুণ্যে।

যাদের চোখ আছে

বহু বছর আগেকার কথা। ঘাটশিলার শিলায় শিলায় ভূতত্ত্বের পাঠ নিচ্ছিলাম।

ঘাটশিলায় বেড়াতে এসে সুবর্ণরেখা নদীর ধারে বেড়াতে না গিয়ে উপায় নেই। নদীতীরের সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে। সকলের সৌন্দর্যবোধ সমান না হলেও যা জনমত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত, তাকে স্বীকৃতি দিতেই হয়। তাই ঘাটশিলাতে এলেই সকলে নদীতে আসে। নদীতে জল কম—পাথরেরই প্রাধান্য। নদী-খাত পাথরে মোড়া। পাথরে প্রতিহত হয়ে নদীর জল সৃষ্টি করেছে ছোট ছোট প্রপাতের। পাথরের বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে জায়গায় জায়গায় ঘূর্ণির আবর্তেরও সঞ্চার হয়েছে।

ঘাটশিলার উত্তর-পশ্চিম দিকে মৌভাণ্ডারের তামার কারখানা পেরিয়ে এক জায়গায় নদীতে পাথরের স্তূপ বাঁধের মত অনেকখানি জলকে ঘিরে রেখেছে। গ্রীষ্মকালে নদী শুকিয়ে গেলেও এখানে জল থাকে। পাথরের ফ্রেমে আঁটা অনেকটা জল নদীর মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নীলাভ স্বচ্ছতা বিকীর্ণ করে। দেখতে ভালই লাগে।

তাছাড়া দাহিগোড়া পাড়ার কাছাকাছি নদীর ধারে পাথরে উৎকীর্ণ পাঁচটি মানুষের মূর্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, এগুলো প্রাচীন চিত্রকলার নিদর্শন। পাঁচটি মূর্তি আঁকা হয়েছে বলে সবাই বলেন পঞ্চপাণ্ডব। ঘাটশিলাতে এসে বায়ু পরিবর্তনকারীরা ঘাটশিলার বিশিষ্ট দ্রষ্টব্যগুলোর মধ্যে পঞ্চপাণ্ডবের খ্যাতি শোনেন। এ পর্যন্ত অবশ্য কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এসে ঐ পাথরে খোদাই চিত্রকলা পরীক্ষা করে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেননি। স্বাস্থ্যান্বেষীদের মধ্যেও তাঁদের মতামত জানতে আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। তাঁরা সাধারণতঃ চান না তাঁদের কল্পনাকে খর্ব করতে।

সুবর্ণরেখার গতিপথকে আকীর্ণ করে আছে অনেক পাথরের সমাবেশে রচিত রম্য স্থল। পাথরকে বাদ দিয়ে নদীকে তেমন মনোরম বলে বোধ হত কি না সন্দেহ।

যে পাথর আমাদের মনের সৌন্দর্যবোধের উদ্বোধন করে, তাকে আমরা জানি প্রকৃতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে। তাকে সর্বদা দেখি বলে তার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ অনুভব করি না সাধারণতঃ।

কাজেই আমি যখন সুবর্ণরেখার গতিপথে পাথরের স্তূপে প্রচ্ছন্ন রহস্যভেদে রত হলাম, তখন ঘাটশিলায় বেড়াতে আসা স্বাস্থ্যান্বেষীরা আমার পাথর পরখ করার বিষয়ে বিশেষ কৌতুক বোধ করলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জানতে চাইলেন, বিশেষ কোনও মূল্যবান খনিজ পদার্থের সন্ধান আমি করছি কি না।

আমার নেতিসূচক উত্তরে স্তম্ভিত হয়ে তাঁরা বললেন, কিছুই খুঁজছেন না?

—না।

—সুবর্ণরেখার বালিতে সোনা আছে শুনেছিলুম—

—আমিও শুনেছিলুম। কিন্তু সোনা আমি চাইনে।

—সোনা না খুঁজুন, রূপা-সীসা-দস্তার খোঁজও তো করতে পারেন। ঐ তো মোসাবনীতে তামার খনি রয়েছে। তামার ছিটেফোঁটা তো এখানেও থাকতে পারে।

—তা পারে। কিন্তু রূপো, সীসা, দস্তা, তামা কিছুই তো আমি খুঁজছি নে।

—তবে খুঁজছেন কী? কিছুই খুঁজছেন না, অথচ খুঁজে চলেছেন—এ আবার কী ধরনের হেঁয়ালি!

—পাথরের রহস্যকে জেনে নিতে চাই। তাই সূত্র খুঁজে চলেছি।

—এই-সব ফালতু পাথরের আবার রহস্য কী! কিছু নেই-ই যখন এতে।

—কিছু নেই বলেই তো রহস্যটা গভীর ও জটিল।

এরপর প্রশ্নকর্তারা কেউ কিছু বলেন না; আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সম্ভবতঃ সন্দিহান হয়ে ওঠেন তাঁরা। আমার অহেতুক অন্বেষণের প্রসঙ্গে আর কিছু না বলে তাঁরা সরে পড়েন।

সুবর্ণরেখা নদীর খাত মাটির আবরণ সরিয়ে পাথরের স্তরকে করেছে উদ্ঘাটিত। নদীর দুই তীরে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজ মাটি হঠাৎ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বিরস পাথরের পুঞ্জে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন পাথরের স্তূপ—দেখলে মনে হয় আলাদা আলাদা পাথরের ঢিবি। কিন্তু আসলে তারা একই শিলাস্তরের অংশ। গোড়াতে এক ও অবিভক্ত ছিল। তারপর জায়গায় জায়গায় ক্ষয় পেয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শিলাস্তরটির ভূ-বৈজ্ঞানিক নাম মাইকা-সিস্ট্। অভ্র, কোয়ার্টজ, গার্নেট প্রভৃতি খনিজ পদার্থের কণা দিয়ে শিলাস্তরটি গড়ে উঠেছে।

নদীর স্রোতে ভাঙছে এই পাথরের স্তর। পাথর বিশ্লিষ্ট হচ্ছে বালির কণায়। এক মুঠো বালি তুলে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে, তা মাইকা-সিস্টেরই ভগ্নাবশেষ।

নদীতে জলের ধারাই শুধু প্রকাশ্য। জলের স্রোতে ভেসে-যাওয়া বালির প্রবাহ থাকে উহ্য। ঘাটশিলা পাহাড়ী জায়গা। নদীতে জলের স্রোত এখানে প্রবল। কাজেই যতটা বালি জমতে পারে নদীর দুই তীরে, তার অনেক গুণ ভেসে যায়। সমুদ্র-মোহনার কাছে পৌঁছে নদীর স্রোত স্তিমিত হলে বালি জমতে শুরু করে। তখন শুধুই সঞ্চয়। জমতে জমতে রচিত হয় পলিমাটির স্তর। কালক্রমে পাথরে জমাট-বাঁধার সম্ভাবনা থাকে তার। ভূগর্ভের তাপ ও চাপের প্রভাবে লক্ষ লক্ষ বছরে পলিমাটির স্তর প্রস্তরীভূত হতে পারে।

অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ঘাটশিলার শিলাস্তরগুলির সৃষ্টি হয়েছে বলে ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা। তাঁরা বলেন যে, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট কোটি বছর আগে ঘাটশিলা দিয়ে বয়ে যেত এক নদী—যে নদীর কোনও চিহ্ন আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই নদীর গতিপথে যে পলিমাটি জমেছে, সেই মাটি ক্রমশ জমাট বেঁধেছে পাথরে। পলিমাটি থেকে সোজাসুজি যে পাথরের উৎপত্তি হয়েছিল, তা হল কাদা-পাথর ও বেলে-পাথর। কালক্রমে কাদা-পাথরের রূপান্তর ঘটেছে মাইকা-সিস্টে এবং বেলে পাথর পরিণত হয়েছে কোয়ার্টজাইটের স্তরে। সুবর্ণরেখা নদীর উত্তরদিকে ঘাটশিলা থেকে গালুডি পর্যন্ত কোয়ার্টজাইটের স্তর ছোট ছোট ঢিবির আকারে একটানা বিস্তৃত। কোয়ার্টজাইটের গায়ে উৎকীর্ণ হয়ে আছে সেই প্রাচীন নদীর প্রবাহের চিহ্ন। বহু কোটি বছর হল, সেই নদী নিশ্চিহ্ন হয়েছে, কিন্তু তার প্রবাহের স্বাক্ষর চিরস্থায়ী হয়ে রয়ে গিয়েছে পাথরের গায়ে।

সুবর্ণরেখা থেকে শুরু করে ঘাটশিলার পশ্চিম দিকের পাহাড় পর্যন্ত পর্যটন করে পাথরের স্তরে স্তরে অতীতকে পর্যবেক্ষণ করি। পাথরগুলো আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ, বিশেষভাবে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। দেখে মনে হয়, আমরা যেন ওদের খুব বেশি করেই চিনি। এই অতি পরিচয়ের আবরণ থেকে তাদের সত্য স্বরূপকে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করি।

আমার এই ঘোরাঘুরিতে ঘাটশিলার সকলে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে উঠে আমাকে স্থানীয় নদী-নালা, পাহাড় ও পাথরের সঙ্গে এক করে দেখতে শুরু করেন—তাদেরই মত অনাবশ্যক অথচ অনতিক্রমণীয়। নদীর ধারে বুনো কাঁটার ঝোপ-গুলোর মত আমাকেও তাঁরা এড়াতে পারেন না। মাঠে চরে বেড়ানো গরু-

মোষগুলোর মত আমার উপস্থিতি বা গতিবিধিকে তাঁরা সহ্য করেন। শিলান্তরের রহস্য সন্ধানের মধ্যে আমি থাকি একঘরে হয়ে।

পথে পথে ছড়ানো পাথরে একা একা সন্ধানে রত ছিলাম। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, আমি একা নই। আমার সন্ধানকে আগ্রহভরে অনুসরণ করে চলেছে এক জোড়া উৎসুক চোখ। আমার সন্ধানের প্রতি এই অকৃত্রিম অনুসন্ধানী আর কেউ নন, বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। প্রতি বছর এ সময়টা তিনি ঘাটশিলায় অতিবাহিত করেন।

আগেই আমার দাদার দাহিগোড়ার বাসাতে আলাপ হয়েছিল বিভূতিবাবুর সঙ্গে। একই পাড়ায় বিভূতিভূষণের বাসা। প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলায় আমার দাদার বাসায় এসে আসর জমাতেন তিনি। বায়োকনিষ্ঠ হয়েও আসরের এক কোণে ঠাঁই পেয়েছিলাম আমি। অবশ্য অবাধ আলাপচারিতার সাহস ছিল না। অধিকাংশ সময়ে নীরব শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হত।

বয়োজ্যেষ্ঠদের সমাবেশের মধ্যে নগণ্য হয়ে থাকলেও আমি ভূতত্ত্বের ছাত্র জেনে আমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন বিভূতিভূষণ। হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন তিনি, ভূতত্ত্ব আমারও খুব ভাল লাগে। ভারি ইচ্ছে করে, রোজ তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে ঘাটশিলার মাটি-পাথরের রহস্যকে চিনে নিই।

আমি ঈষৎ ইতস্তত করে বললাম, হাতুড়ি ঠুকে পাথর পরীক্ষা করি আমি। কাজটা খুবই একঘেয়ে। আমার সঙ্গে ঘুরে হয়তো ক্লান্ত বোধ করবেন আপনি।

না, না।—রীতিমত জোর দিয়ে বললেন বিভূতিভূষণ।—ক্লান্তি বোধ করব কেন! যে প্রকৃতিকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, তার রহস্যকে চিনে নিতে আমার খারাপ লাগবে কেন!

একটু বিব্রতভাবে আমি বললাম, আপনার খারাপ লাগবে এ কথা তো আমি বলতে চাইনি। আমি মনে করেছিলাম যে, আপনার কষ্ট হতে পারে।

উত্তেজিতভাবে বিভূতিভূষণ বললেন, কষ্ট হতে পারে, মানে! জান, এখান থেকে একদিন হেঁটে চলে গিয়েছিলাম ঐ সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের কাছাকাছি। প্রায় দশ মাইল হবে এখান থেকে। তুমি নিশ্চয়ই গিয়েছ ওখানে। দেখেছ তো কী রকম খাড়া পাহাড়! ঐ পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে ঘুরে বেড়িয়েছি।

আসরে আর যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, দাদা তো সেদিন ঐ পাহাড় ছেড়ে ফিরে আসতেই চান না। দলছুট

হয়ে গভীর শালবনের মধ্যে ঝর্নার ধারে বসেছিলেন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমরা তো তাঁকে খুঁজে পাই নে। বনটাতে চিতাবাঘ ও ভাল্লুক ঘোরাঘুরি করে বেড়ায় বলে শুনেছিলাম। একটা হাতির পালও কাছাকাছি আসে বলে শুনলুম। ভয়ে তো আমাদের অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম হল। কিন্তু দাদা নির্বিকারভাবে ঝর্নার ধারে বসে রইলেন। সন্ধ্যার আগে তিনি বন থেকে বেরোলেনই না। মোসাবনী-টাটানগরের সড়কের একটি কালভার্টে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমরা ভাবলুম বুঝি তাঁকে চিতাবাঘেই ধরে নিয়ে গিয়েছে। তাঁর ফিরে আসার আশা প্রায় ছেড়েই দিতে বসেছি, এমন সময় পাহাড় থেকে নেমে এসে তিনি বললেন, ওঃ! সে যা দেখে এলাম! শুধু একটা বন নয়, যেন একটা রূপকথা। আর ঝর্ণাটিই বা কী চমৎকার!

গম্ভীরমুখে বিভূতিভূষণ বললেন, সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেদিন, বুঝলে! কেউ কোথাও নেই, ঝর্ণার ধারে আমি একা। চারধারে কালো পাথরের স্তূপ। সাধারণ পাথর ছাড়া যদিও কিছুই নয়, তবু মনে হচ্ছিল কী একটা রহস্য যেন লুকিয়ে আছে পাথরগুলোতে। আচ্ছা, ওখানে তো অনেক কৃতী বড় বড় জিয়োলজিস্টই কাজ করেছেন। ওখানকার রহস্য তো সবই তাঁরা জেনে ফেলেছেন, তাই না?

আমি বললাম, তাই তো জানি। ওখানকার ভূতাত্ত্বিক খুঁটিনাটি সবই তাঁদের নখ-দর্পণে বলে শুনেছি।

—ওখানে তামা আছে?

—হ্যাঁ আছে। সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের কাছেই রাখার তামার খনি। ত্রিশ বছর আগে অবশ্য খনির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পশ্চিম দিকের ঐ পাহাড়টা আগাগোড়া তামায় ভরা। তামার পাহাড় বলা চলে ওকে। দক্ষিণ-পশ্চিমে মোসাবনীতে তামার খনি আছি। নতুন তামার খনি পত্তনের আয়োজন হচ্ছে সুর্দাতে। রাখা মাইন্‌সে আবার কাজ শুরু করা হবে শুনছি। এখানে খুব প্রাচীন তামার খনির নিদর্শন রয়েছে। যে সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ে গিয়েছিলেন, সেই পাহাড়ে প্রাগৈতিহাসিক কালের খনির চিহ্ন আছে।

—তামা ছাড়া আর কী কিছু নেই ও পাহাড়ে?

—ফস্‌ফেট্ আছে—ফস্‌ফেট্‌যুক্ত খনিজ পদার্থকে বলা হয় অ্যাপেটাইট।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে ধূমপান করে বিভূতিভূষণ বললেন, সেদিন ওখানে বসে থেকে আমার মনে হচ্ছিল, যেন পাহাড়টির রহস্যের পুরোপুরি সমাধান হয়নি।

তামা বা ফস্‌ফেট্‌ বা অন্য যে-কোনও খনিজ পদার্থ তোমরা ওখানে আবিষ্কার করতে পার, কিন্তু পাহাড়টির সম্পূর্ণ রহস্যভেদ করতে হয়তো পারবে না তোমরা। হয়তো তা তোমাদের ভূতাত্ত্বিক সন্ধানেরই আওতায় আসে না।

আমাদের এই কথোপকথনের পর, দিন কয়েক পরে ভোরবেলায় দাহিগোড়ার রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং-এর কাছে বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি যাচ্ছিলাম গালুডির দিকে। বিভূতিভূষণ বেরিয়েছিলেন প্রাতর্ভ্রমণে। ফুলটুংরি পাহাড়ের পাশে একটি দীঘি আছে, সেই দীঘির দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার কাঁধে ঝোলানো হ্যাভারস্যাক্‌ ব্যাগ, হাতের হাতুড়ি ও কোমরে বেল্টে লাগানো কম্পাসের কেস্‌—সব কিছুর ওপর চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, খুবই ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে ঘুরতে। ধারাগিরির দিকে যাবে বুঝি আজ?

আমি জবাব দিলাম, আজ্ঞে না, গালুডির দিকে যাব।

আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বিভূতিভূষণ বললেন, তোমার সঙ্গে বেরোবো আমি একদিন—নিয়ে যাব তোমাকে পশ্চিম-দিকের পাহাড়ে ঝাটিঝর্না, রানী-ঝর্নার ধারে। এমন সব রহস্যের সন্ধান দেব, যা তোমরা ভূতাত্ত্বিকরা কল্পনাও করতে পার না। মনে থাকে যেন, দু' চার দিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গী হব আমি।

আমার মনে ছিল। কিন্তু আমার পর্যটনের সঙ্গী হবার আগেই আমাদের সকলের সঙ্গ ছেড়ে বুঝি তাঁর ঈপ্সিত "শাশ্বত রহস্যভরা অনন্ত জীবনের উৎসধারা"র উদ্দেশ্যে প্রয়াণ করলেন তিনি। দাহিগোড়ার মোড়ে লেভেল ক্রসিং-এর কাছে তাঁর সঙ্গে আমার সেই শেষ আলাপের পর কয়েকদিন পরেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন বিভূতিভূষণ।

বিভূতিভূষণের যে দুর্লভ সাহচর্য আমি পাইনি, ঘাটশিলার চারপাশে পর্যটন-কালে তা যেন অদৃশ্য পার্শ্বচরের মত ঘিরে থাকে আমাকে।

ঘাটশিলার পশ্চিমদিকের পাহাড়ে অনেক ঘুরেছি, অনেক জটিল ভূতাত্ত্বিক জট ছাড়াবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিভূতিভূষণ যে চিররহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতির কথা বলেছিলেন, তার রহস্যাবরণ সামান্যতম উন্মোচন করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। কোন ভূতাত্ত্বিকই বোধ হয় পারেননি। বিভূতিভূষণ সেই রহস্যের ঢাকনা সরিয়ে যে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে তা জেনে নেওয়ার সুযোগ হয়নি আমার।

শিল্পী-প্রকৃতি

কোনও এক সংবাদপত্রে আসামের কয়লা-খাদের দুটি ছবি ছাপা হয়েছিল। ছবি দুটিতে স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল যে, কয়লা-কাটা পুরুষ কুলির দল কয়লা কেটে ঝুড়ি বোঝাই করছে এবং মেয়েকুলিরা সেই সব ঝুড়ি পিঠে বেঁধে টেনে তুলছে। ছবি দুটিতে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত আর কিছু আমাদের চোখে পড়েনি।

কিন্তু জনৈক পাঠকের নজরে এল, বেলেপাথরের গায়ে খোদাই করা বিচিত্র ভাস্কর্য। বিশেষ বিশেষ জায়গা চিহ্নিত করে ছবিগুলো আবার ছাপা হল ঐ পত্রিকায়। একই ছবি দ্বিতীয়বার দেখলাম আমরা—কিন্তু এবারে নতুন করে। উক্ত পাঠক যা দেখেছিলেন, আমরা সবাই তা' দেখলাম সুস্পষ্টভাবে।

উক্ত পাঠকের মতে, ঐ পাথরের গায়ে খোদাই-করা ভাস্কর্যগুলি প্রকৃতির শিল্পকৃতি, যাকে আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি না। তিনি বলতে চাইলেন যে, প্রকৃতির মধ্যে রহস্যজনকভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে অবস্থান করছে একজন শিল্পী, যাকে প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করতে দেখি পাহাড়ে ও গুহায় রকমারি ভাস্কর্যের মধ্যে, ভাসমান মেঘের বুকে ফুটে-ওঠা সঞ্চরণশীল এলোমেলো ছবির আদলে। কোথায় কী ভাবে সেই শিল্পীর অদৃশ্য ছেনি ও তুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে তা' অবশ্য মানুষের বুদ্ধির অগম্য।

মনীষীরা প্রকৃতিকে মহৎ শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। গান্ধীজী শ্রীদিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন (তীর্থংকর, পৃষ্ঠা ৪০), 'আমার প্রেরণার জন্য ছবির কোন দরকার নেই······প্রকৃতিই আমার কাছে যথেষ্ট।···প্রান্তর, কান্তার, গিরি, নদী, সাগর, পর্বত, এ সব থেকে যখনই চেয়েছি মেটে নি কী আমার সৌন্দর্যের ক্ষুধা?...প্রকৃতি আমার বেঁচে থাক—আর কোন প্রেরণাই আমি চাই না। আজো তাঁর রহস্যভাণ্ডার আমার কাছে তেমনি অফুরন্ত, আনন্দময়, স্বপ্নভরা। মানুষের ছেলেমানুষি কারুকলায় কী দরকার আমার?'

অথচ শিল্পবোধ মানুষেরই বিশেষ একটি চিত্তবৃত্তি। প্রকৃতির মধ্যে রঙে রেখায় অনুরঞ্জিত চিত্র-বিচিত্র শিল্পকৃতির সমঝদার মানুষই। 'প্রকৃতি সজ্ঞানে শিল্পকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে পাথরের বুকে বিস্ময়কর ভাস্কর্য ফুটিয়ে তুলেছে, এ-ও মানুষেরই কল্পনা।

সমঝদার শ্রোতা না থাকলে যেমন সঙ্গীত ব্যর্থ, তেমনি দেখবার মত চোখ ও

গ্রহণ করবার মত মন না থাকলে যে-কোনও শিল্পকর্মও নিষ্ফল। কয়লাখাদের ছবির মধ্যে মানুষের ও সিংহের মূর্তি লাখ লাখ পাঠকের মধ্যে কেবলমাত্র একজনের চোখে পড়েছে—সাদা চোখে আমরা সাধারণ একটি কয়লাখাদ ছাড়া আর কিছু দেখিনি। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, এই সব ভাস্কর্য বিশেষ এক জনের কল্পনার মধ্যেই সুস্পষ্ট।

প্রকৃতি আমাদের কাছে রহস্যময়ী। রহস্যাবরণ উন্মোচন করে, ভেতরকার বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ঘাটন করে, কল্পনাকে খর্ব করতে আমরা কুণ্ঠিত বোধ করি। প্রকৃতির রূপ-রস উপভোগে আমরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী বুদ্ধিকে সরিয়ে রাখি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেন শবব্যবচ্ছেদের ছুরির মত নদী, নালা, পাহাড়-পর্বত সব কিছুর ওপর থেকে নানা রঙের ঐকতানের বিচিত্র সুষমাকে বিশ্লিষ্ট করে বিলুপ্ত ক'রে দেয়।

আমাদের সৌন্দর্যবোধের মধ্যে আছে বহু যুগ-সঞ্চিত সংস্কার। সভ্যতার প্রথম প্রহরে মানুষের যখন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির উন্মেষ হয়নি, তখন থেকেই প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধের আবেদন মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে। যে সৌন্দর্য মানুষকে দেহের সীমা অতিক্রম করে নিয়ে গেছে আকাশের সুদূর নীলিমার পানে, তার মধ্যে সে পেয়েছে অতল রহস্যের সন্ধান। তার বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজবার বিশ্লেষণী প্রবণতা তখন ছিল না। পরবর্তীকালে মানুষের বুদ্ধি ক্রমশঃ যখন বৈজ্ঞানিকভাবে বস্তুজগৎকে বুঝতে চেষ্টা করছে, তখনও তার সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে অর্জিত সংস্কারকে অতিক্রম করে বৈজ্ঞানিক সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সে কুণ্ঠিত বোধ করেছে। আজকের দিনেও যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণকে বৈজ্ঞানিকভাবে চিনে নেবার চূড়ান্ত আয়োজন চলছে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের রসসম্ভোগে বিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতে চায় না বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মানুষও।

কিন্তু সত্য যা তাই সুন্দর—এই যদি সত্য হয়, বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে রূপ-রস-গন্ধভরা প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের হৃদয়ের সহজ গ্রহণশীলতায় বিরোধ থাকা উচিত নয়। অজ্ঞানতিমিরাবৃত রহস্যের মধ্যে যে রস আছে, তাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকলে মিথ্যার বেসাতি করা হ'বে এবং ফলে সত্যের মধ্যে অবস্থিত সুন্দর হবে আমাদের আয়ত্তের অতীত।

কয়লাখাদে পাথরে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যকে অবৈজ্ঞানিক কল্পনার আশ্রয়ে প্রকৃতিকৃত ভেবে রহস্যঘন বিস্ময় ও রোমাঞ্চের স্বাদ পেতে পারি আমরা, কিন্তু বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-



পাথরের গায়ে নক্‌শা (শিল্পীপ্রকৃতি)
আলোকচিত্র—এম. এস. আনন্দ

রস আহরণ করতে পারি না এই অলীক কল্পনা বিলাস থেকে। প্রকৃতির নিয়মের রাজত্বে প্রকৃতির স্বেচ্ছাকৃত শিল্পীর ভূমিকা গ্রহণের কল্পনা প্রায় রূপকথার পর্যায়ে পড়ে। কারণ প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনের ফলে যে সব পরিবর্তন পাথর, মাটি এবং গিরিপর্বতে চিহ্নিত হয়, রেখা ও রঙের বিচিত্র বিন্যাসে ফুটে ওঠে তার ইতিহাস। তাদের মধ্যে শিল্পকর্ম বা ভাস্কর্যের নমুনা পাওয়া অসম্ভব নয়। নদী-নালা, সমুদ্র বৃষ্টি, বাতাস, শীতাতপের তারতম্য প্রভৃতির প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির বুকে যে অবক্ষয় চলে, তার মধ্যে হঠাৎ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোনও ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হতেও পারে।

স্যার জেম্স্ জীনস্ তাঁর 'বিশ্বরহস্য' (Mysterious Universe) বইটিতে লিখেছেন, প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ লক্ষ লক্ষ বছরের পৌনঃপুনিকতার দরুণ অপ্রত্যাশিত সুন্দর কিছু সৃষ্টি করলে, তাকে আকস্মিক ব্যতিক্রম বলে মনে হলেও সম্ভবপরের কোঠাতেই ফেলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলছেন, একটি বাঁদর যদি একটি টাইপ-রাইটার যন্ত্র নিয়ে অন্ধভাবে লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে টাইপ ক'রে যায়, তার পক্ষে হঠাৎ একটি শেক্স্পীয়ারের সনেট টাইপ ক'রে ফেলা বিস্ময়কর হলেও অসম্ভব নয়।

এর থেকে অবশ্য প্রমাণ হয় না যে, মানুষের সজ্ঞানকৃত শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে প্রকৃতির চেষ্টাহীন অন্ধ ক্রিয়াকলাপকে একাসনে বসানো যেতে পারে। শিল্পীর সৃষ্টির তাগিদ অমোঘ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক বিবর্তনের মধ্যে যে নেই, তা বলাই বাহুল্য।

ছাত্রজীবনে বনে-পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে যখন ভূতত্ত্বের প্রথম পাঠ নিচ্ছিলাম, তখন একদিন আমরা পূর্ব সিংভূমে বরদাবাঁকি পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি ছোট্ট টিলায় পাথরের গায়ে আঁকা পরস্পর সমান্তরাল কয়েকটি রেখার নক্সার সুসমঞ্জস সুষমা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কালো ও সাদা রেখাগুলি যেন সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে একটি নীরস পাথরের স্তূপকে মিলিয়ে দিয়েছে চারপাশের বন-পাহাড়ের সবুজ শোভন মোহনরূপের ছন্দের সঙ্গে। আমাদের মনে হয়েছিল, পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ বিচিত্র ছবিটি ফুটিয়ে তোলার জন্যই যেন ঐ বরদাবাঁকি পাহাড়ের ধূসর পটভূমিকার আয়োজন। মুগ্ধ হলাম আমরা। আমার সহপাঠী বন্ধু চাইল ক্যামেরার কালো আধারে আলোকচিত্ররেখার ডোরে তাকে বেঁধে রাখতে।

কিন্তু কেবল দু-চোখের মুগ্ধ বিস্ময় দিয়ে হৃদয়ের স্বীকৃতি দিলে চলবে না,

বৈজ্ঞানিক ব্যাখা চাই। অধ্যাপক তাড়া দিয়ে বললেন, এই পাথরের গায়ে এই সাদা-কালো আঁকি-বুঁকিগুলি কেন, পার বলতে?

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকি নির্বাকভাবে।

অধ্যাপক ব্যঙ্গ করে বললেন, খুব উৎসাহের সঙ্গে ছবি তো তুলছ, কিন্তু কিসের ছবি তুললে তা-ও জান না!

মুখ লাল হয়ে ওঠে আমাদের সকলেরই। অধ্যাপক বুঝিয়ে দিলেন, সাদা ও কালোয় মেশানো এই যে নক্সা দেখে তোমাদের ভাল লেগেছে, এর সৃষ্টি হয়েছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। এই টিলা, ঐ বরদাবাঁকি পাহাড় আর পূর্বদিকের পাহাড়গুলি, সব মিলিয়ে একটা বিরাট রাসায়নিক ক্রিয়াকে স্পষ্ট দেখতে পাই। পূর্বদিকে যে-সব আগ্নেয়শিলা তোমাদের দেখিয়েছি, সেগুলো সুস্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে কোটি কোটি বছর আগে এখানে কয়েকটি আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বের। আগ্নেয়গিরিগুলি থেকে অগ্ন্যুদ্গারের ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঢাকা পড়েছে 'লাভায়'—ঐ কালো পাথরগুলোতে যার পরিবর্তিত রূপ দেখতে পাচ্ছ তোমরা। কিন্তু 'লাভা' শুধু নয়, 'লাভার' সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল নানা রকম রাসায়নিক তরল পদার্থ, তখনকার পাথরের স্তরগুলির সঙ্গে যাদের সংসর্গ ও সংঘর্ষের চিহ্ন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই টিলাতে হানা দিয়েছিল 'সিলিকা' (Silica) নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ তরলিত অবস্থায়। 'সিলিকা' কাকে বলে তা' নিশ্চয়ই জান। ধূলা, বালি ও আমাদের পরিচিত পাথরগুলিতে 'সিলিকার' প্রাধান্য রয়েছে। হানাদার ঐ 'সিলিকা' এখানে বন্দী হয়েছে এই সূক্ষ্ম স্তরে স্তরে কালো ও সাদা রেখায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এমন হ'ল—মুক্ত তরল 'সিলিকার' পায়ে শেকল পরাল কে? এই পাথরে সুস্পষ্ট হদিস না পেলেও জবাবটা অনুমান ক'রে নিতে অসুবিধে হ'বে না। 'সিলিকা'র তরল স্রোত যখন এই টিলায় পাথরের স্তূপে এসে ঘা দিল, তখন হয়তো এখানে ছিল চুণাপাথরের সমারোহ। 'সিলিকা'র সংযোগে রাসায়নিক নিয়মে চুণাপাথর থেকে বেরিয়ে এল ক্যালসিয়াম কার্বনেট, মিশে গেল তরল পদার্থের মধ্যে, 'সিলিকা'কে সরিয়ে। 'সিলিকা' বন্দী হ'য়ে রইল এই টিলায়।

অধ্যাপকের ব্যাখ্যায় প্রতিবাদ জানাবার মত ছিল না কিছুই। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দরুণই যে ঐ পাথরের গায়ে চিত্রিত নক্সাগুলির সৌন্দর্য, তা' মেনে নিতে মনে মনে সঙ্কুচিত বোধ করছিলাম তখন।

প্রকৃতিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখেও সৌন্দর্যের মূল কারণকে প্রকৃতির

নিয়মের রাজত্বে প্রত্যক্ষ করতে অসুবিধে হয় আমাদের, তাকে দেখি আমাদের মনের গ্রহণশীলতায়। বাইরে যা সুন্দর, তার সৌন্দর্যের উৎস আমাদের মনের মধ্যে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মনের মিতালিকে আবিষ্কার করি আমরা বনে-পাহাড়ে, নদী-প্রান্তরে রূপ ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে।

মাটি

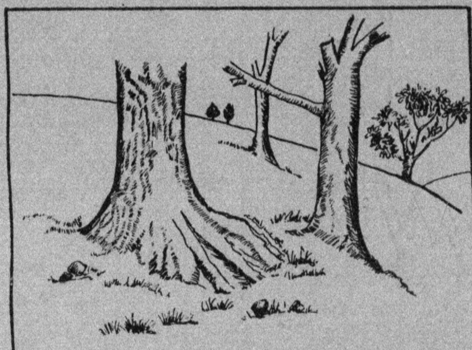
মধ্যপ্রদেশের চিরিমিরি পাহাড়ে ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের কাজে গিয়ে দেখলাম সেখানে মাইলের পর মাইল বে-আব্রু পাথরের রুক্ষতা। মাঝে মাঝে মাটির সূক্ষ্ম প্রলেপ চোখে পড়ে—কিন্তু পাথরের নিরবচ্ছিন্নতার মাঝখানে নিতান্তই ক্ষীণজীবী মনে হয় তার নগণ্য অস্তিত্বকে।

চিরিমিরি পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে খরগাঁও ডুবছোলার সমতলভূমি। এখানে নরম মাটির আবরণে ঢাকা পড়েছে পাথরের কঙ্কাল। এখান থেকে দু'হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের ঋজুতাকে স্পষ্ট করে দেখলাম। পাহাড়টা যেন এই সমতলের সামান্যতার উদ্দেশে অভ্রভেদী অবজ্ঞার ভ্রূকুটি। সবুজ মাঠে, ধানের ক্ষেতে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য যতই অবারিত হোক, পাহাড়ের আকাশ ছুঁতে যাওয়া স্পর্ধাকেই বড় করে দেখতে ইচ্ছে করে। মাটির ভেতরে বীজ থেকে অঙ্কুরের পথ বেয়ে যে প্রাণের বিবর্তন চলছে, তাকে তুচ্ছ মনে হয় পাষাণ-হৃদয়ের নিষ্প্রাণ রুক্ষতার তুলনায়।

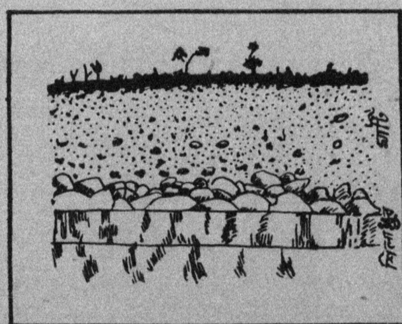
পাহাড় আমার চোখ ধাঁধিয়েছিল—তার মধ্যে দেখেছিলাম পরিণামহীন স্থায়িত্ব। বাইবেলের একটি স্তোত্র-সঙ্গীতে, 'অবিনশ্বর পর্বতমালার' উদ্দেশে বন্দনা আছে। এই চিরিমিরি পাহাড়ও যেন প্রকৃতির চিরন্তন কালজয়ী একটি মহিমাকে প্রকাশ করছে।

চিরিমিরি পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে একটা নালার মধ্যে এসে পড়লাম। আমার পথপ্রদর্শক সুখলাল বললে যে, নালাটির নাম 'বিজাওর ঝরিয়া'। নালাটির গভীর খাতের অতলে ধূসর ছায়ার গায়ে শীর্ণ একটা রুপালি ধারা চোখে পড়ল। সুখলালকে বললাম যে, নীচে ঐ ঝর্ণার কাছে যাব। সুখলাল বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল আমার মুখের পানে। প্রায় দুশো ফুট দুর্গম উৎরাই বেয়ে আমার অবতরণের অভিপ্রায়টা তার কাছে রীতিমত দুঃসাহসিক ঠেকল। সে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে আমার ঐভাবে নামাটা কী রকম ভয়াবহ পদস্খলনে রূপ নিতে পারে। কিন্তু ততক্ষণে এই অতলস্পর্শী গহ্বরের দুর্বার আকর্ষণে হরিণদের পায়ে পায়ে প্রস্তুত পাথরের গায়ে চিহ্নিত অস্পষ্ট পথের রেখায় পা দিয়ে নিম্নগামী হয়েছি। অগত্যা আমার অনুবর্তী হল সুখলাল—অবশ্য সপ্রতিবাদে।

কয়েক পা দ্বিপদী পদক্ষেপের পর বুঝলাম যে হস্তক্ষেপেরও প্রয়োজন রয়েছে। যে পথ চতুষ্পদীয়দের চতুষ্পদক্ষেপে প্রস্তুত হয়েছে, তাতে বিচরণের জন্য দুটি পা-ই



মাটির সংরক্ষক গাছপালা (মাটি)



মাটির উৎপত্তি (মাটি)

যথেষ্ট নয়। হাত দুটোকেও বাড়িয়ে দিলে পা দুটোর ভারসাম্য রক্ষা পায়।

কাজেই শুরু করলাম হামাগুড়ি দিতে। নামতে নামতে নালার খাতটির গভীরতা যে কত বিপুল, তা' বুঝতে পেরে চমৎকৃত বোধ করছিলাম। যে পাহাড়কে অবিনশ্বর বলে জেনেছি, তার ক্ষয়ের পথটি সুস্পষ্ট হ'ল আমার চোখের সামনে। সামান্য একটি পাহাড়ী নালা পাষাণস্তূপের অচলায়তনকে কী ভয়াবহ ভাবেই না বিশ্লিষ্ট করেছে!

অনেকক্ষণের রুদ্ধশ্বাস অবতরণের পর ঝর্ণার ধারে এসে দাঁড়ালাম। শ্যাওলা-ধরা কালো বেলে-পাথরের স্তূপের গা বেয়ে নেমে আসছে যেন রোদে ঝলসানো তলোয়ার। পাথরে পাথরে প্রতিহত হ'য়ে তার গতির বেগ যাচ্ছে ক্রমশঃ বেড়ে।

পাথরের নিশ্চল গাম্ভীর্যের পাশাপাশি খুবই চটুল মনে হ'ল এই পাহাড়ী ঝর্ণাটিকে। কিন্তু এর তরলিত হাল্কা উচ্ছ্বাসের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করলাম অমোঘ মারণাস্ত্রকে। তখন যদিও নির্জলা শীতকাল, বর্ষার দাক্ষিণ্য বাষ্পের আকারে উবে গিয়ে যদিও ঝর্ণার ভরা যৌবনকে শুকিয়ে বিশীর্ণ ক'রে দিয়েছে, তবুও দেখলাম যে তার বিনাশ-শক্তির কমতি নেই। তার ক্ষীণধারা লম্বা একটা ধারালো অসির মত বেলে-পাথরের বিরাট স্তূপগুলিকে ভেঙ্গে চুরমার করেছে। পাহাড়ের কঠোর ও কঠিন প্রতিরোধ বিচূর্ণ হচ্ছে হাজার হাজার উপলখণ্ডে। পাহাড়ের সঙ্গে অঙ্গীভূত হ'য়ে যা ছিল নিশ্চল হয়ে, ভাঙ্গনের স্রোতে মুক্তি পেয়ে তা' নৃত্যতরঙ্গিত ঝর্ণার গতির বেগে সুদূর পরিণামের দিকে দ্রুত গতিতে ব'য়ে যাচ্ছে।

নগণ্য 'বিজাওর ঝরিয়া' নালার নগণ্যতর একটি ঝর্ণার মধ্যে চিরিমিরি পাহাড়ের বিনাশকে প্রত্যক্ষ করলাম। টেনিসনের একটি কবিতার প্রতিধ্বনি করে বলা যেতে পারে যে, পাহাড়ে পাথরের জাড্য যেন মেঘের মত রকমারি আকারে রূপান্তরিত হ'তে হ'তে ছায়ার মত মিলিয়ে যেতে উদ্যত…।

'বিজাওর ঝরিয়ায়' দুঃসাহসী অভিযানের পর চিরিমিরি পাহাড়কে নতুন চোখে দেখতে শুরু করলাম। নিশ্চল মহিমার অবক্ষয়কে শুধু ঝর্ণার জলের ধারায় নয়, সর্বত্র প্রত্যক্ষ করি। যেখানে এক ফোঁটাও জল নেই, সেখানেও গরমে সম্প্রসারিত ও ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হ'য়ে পাথরগুলোতে ভাঙ্গন ধরে। বর্ষাকালে

জোলো বাতাসের ছোঁওয়ায় অনেক মজবুত পাথর মরচে ধ'রে ক্ষ'য়ে যেতে থাকে।

ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষতিটা প্রকট হয়ে ওঠে না। ফেটে যাওয়া ও চূর্ণ হওয়া পাথরের টুকরোগুলি সঙ্গে সঙ্গে অপসারিত হয় না—ঝর্ণার বা নালার জলের আনুকূল্য সর্বত্র নেই। কাজেই পাহাড় থেকে বিযুক্ত পাথরের টুকরোগুলো অনেক জায়গায় জমতে থাকে। জমা পাথরের খণ্ডগুলো প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের ক্রীড়নক হয়ে আরও ভাঙ্গতে থাকে। ভাঙ্গা পাথরের সূক্ষ্ম কণাগুলি আল্‌গাভাবে অবস্থান করে। বৃষ্টির জলে তা' সহজেই ধুয়ে যেতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে পচে যাওয়া গাছপালার অবশেষের সংযোগে নতুন বাঁধনে বাঁধা পড়ে। এইভাবে চিরিমিরি পাহাড়ে অনেক জায়গায় মাটির সূক্ষ্ম স্তরের সৃষ্টি হ'তে দেখেছি। কিন্তু পাহাড়ী বন্ধুরতার রাজত্বে নির্মম ভাঙ্গনের পালার মাঝখানে এই সব মাটির স্তর খুবই ক্ষীণায়ু হয়। গ্রীষ্মের তাপে শুকিয়ে ফুটিফাটা হ'য়ে বৃষ্টির জলে সহজেই ফেঁপেফুলে উঠে এ মাটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যায় সমতলভূমির দিকে। কিন্তু মাঝে এই অস্থায়ী মাটিতেও গাছপালা দেখা দেয়। নতুন সৃষ্টি হওয়া টিলে মাটির স্তরকে সংরক্ষণ করার জন্যই যেন বিরস পাষাণপুঞ্জে ওড়ে মরু-বিজয়ের কেতন। বৃষ্টির জলে যে মাটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যেতে চায়, বাঁধের মত তার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে এ-সব গাছপালা। ফলে দেখা যায় যে ঢালের অভিমুখে গাছের নীচের দিকের মাটি স'রে গিয়ে গাছের মূলগুলোকে উদ্ঘাটিত করলেও ওপরের দিকে মাটি জমতে জমতে মাটির স্তরকে ক্রমশঃ পুরু করে তোলে।

দেখা যাচ্ছে যে, পাহাড়ের অবক্ষয়ের ক্ষতি শুধু ক্ষতি নয়। ক্ষতির সঙ্গে ক্ষতিপূরণের পালাও জমে পাহাড়ের পাথরের ভগ্নদশা থেকে উৎপন্ন মাটির স্তরে। অবশ্য খুবই ক্ষীণভাবে। ক্ষতির তুলনায় তা' খুবই তুচ্ছ।

কিন্তু ক্ষতিপূরণের ব্যাপক সমারোহ দেখা যায় পাহাড়ের সংলগ্ন সমতল-ভূমিতে। চিরিমিরি পাহাড়ের দক্ষিণদিকে ডুবছোলা গাঁয়ের পাশে 'বিজাওর ঝরিয়া' নালা যেখানে সমতলভূমিতে এসে মিশেছে, সেখানে গিয়ে দেখলাম যে চিরিমিরি পাহাড়ে যে গতির আবেগ ছিল, নালাটিতে তা' স্তিমিত হ'য়ে এসেছে। সেই পাহাড়ী ঝর্ণার স্মৃতিটুকুও ধরা পড়ে না প্রায় স্রোত-হারানো জলের রূপালি রেখায়। ভাঙ্গনের পালা শেষ হয়ে শুরু হ'য়েছে সঞ্চয়ের আয়োজন। নালার দুপাশে চিরিমিরি পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উর্বর

মাটির বিস্তীর্ণ বিস্তার ধানক্ষেতে, আমবাগানে গরু চরাবার মাঠে। 'বিজ্ঞাওর ঝরিয়া' ও আরও অনেক পাহাড়ী নালা চিরিমিরি পাহাড়কে ভেঙ্গে গড়ে তুলেছে এই সবুজ মাটি। পাহাড়ে যে নালাটিকে দেখছিলাম সংহার মূর্তিতে, এখানে তাকে দেখলাম সৃষ্টির শান্ত মহিমায়। প্রাক্তন ভাঙ্গনের কিছু কিছু চিহ্ন অবশ্য নালার বুকে র'য়ে গেছে। ক্ষয় হয়ে যাওয়া গোলাকার পাথরের স্তূপ সেই সংহারের স্মারকলিপি। মনে হয় বুঝি চিরিমিরি পাহাড় দক্ষিণের সমতলভূমির অনেকখানি জুড়ে ছিল—ব্যাপক বিনাশের ফলে ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করেছে—এই পাথরের স্তূপ যেন চিরিমিরি পাহাড়েরই অবশেষ।

চিরিমিরিতে এসেই পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম—এই সমতল সবুজ মাটির উদ্দেশে পাহাড়ের অভ্রভেদী অবজ্ঞা আমার মনেও প্রতিফলিত হ'য়েছিল। কিন্তু প্রথম দেখার ঘোর কাটিয়ে উঠে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখবার চেষ্টা ক'রে দেখলাম যে, বাইরে থেকে যাকে বড় দেখা যায়, সেই যে যথার্থ বড়, তা' নয়। যে মাটিকে অবজ্ঞা করেছিলাম, তার সঙ্গে সহৃদয় মমতা গড়ে উঠল আমার মনের মধ্যে। ডুবছোলা, খরগাঁও ও আরও অনেক গ্রামে স্থায়ী জনবসতির মধ্যে দেখলাম সমতল মাটির উদ্দেশ্যে মানুষের স্বীকৃতি। কিন্তু চিরিমিরি পাহাড়ে কয়লার খনিগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যে অস্থায়ী কলোনি, সেখানকার মানুষদের অস্থির জীবনযাত্রার মধ্যে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় গড়ার অনুকূল আবহাওয়া পাইনি খুঁজে।

আমরাও শিবির পত্তন করেছিলাম পাহাড়ের মাথায়। পাহাড়ে কাজ, কাজেই পাহাড়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য কামনা করেছিলাম। অস্থায়ী আবাস। কিন্তু বসবাসের জন্য পুরোমাত্রায় আয়োজন করতে হয়েছিল।

আমাদের শিবির সংগঠনের আয়োজন যখন চলছিল, আমাদের পথপ্রদর্শক সুখলাল বলেছিল, এ পাহাড়ে ক্যাম্প করলে আপনাদের দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, কিসের দুর্ভোগ?

—আপনাদের ক্যাম্পে কাজ-কর্ম করবার মত লোক পাবেন না এখানে। এখানকার কোলিয়ারির লোকগুলোকে বিশ্বাস করা চলে না।

সুখলালের কথায় কর্ণপাত করি নি। কারণ আশে পাশে কোলিয়ারিগুলো থেকে অনেক লোক এসে ধন্না দিতে শুরু করেছিল আমাদের ক্যাম্পে কাজ করবে ব'লে।

কিন্তু কিছুদিন বাদেই আমরা মর্মান্তিকভাবে বুঝতে পারলাম যে সুখলাল সত্যি কথাই বলেছিল।

যারা কাজ করতে এসেছিল, তারা কাজে মন বসাতে পারে নি। একে একে সবাই কাজ ছেড়ে চলে গেল। শুনলাম তারা বিলাসপুর-রায়পুরের দিকে চলে গেছে। এখানকার লোক নয় তারা—কোথা থেকে এসেছিল এখানে কেউ জানে না। বিলাসপুর-রায়পুরে কিসের আকর্ষণে গেছে তারা তাও বলতে পারল না কেউ।

সুখলাল মুখ টিপে হেসে বললে, মাটির টান নেই, তাই এরা টিকতে পারে নি এখানে।

আমি বললাম, মনের মত কাজ-কর্ম পেলেই পারত টিকতে।

গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে সুখলাল বললে, না স্যার, গাছের মত শিকড় গাঁথতে যে মানুষ মাটি খুঁজে পায় নি বা অবস্থা বিপাকে যার জীবন ঝড়ে ওপড়ানো গাছের মত মাটি থেকে আলগা হ'য়ে পড়েছে, সে কোথাও তিষ্ঠোতে পারে না।

আমি ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে বললাম, বক্তৃতা রাখ—এখন কাজে টিকবে এমন কিছু লোক ঠিক ক'রে আন।

—আমার ডুবছোলা গাঁয়ের লোকগুলো তো ধান কাটার কাজ শেষ ক'রে বেকার বসে আছে। যদি হুকুম করেন—

—কিন্তু ওরা কী কাজ-কর্মে সে রকম চটপটে হবে!

—তা হবে না। কিন্তু কাজ ছেড়ে পালাবে না।

—কী ক'রে জানলে?

—আমারি মত ডুবছোলার মাটিতে ওদের শিকড় গাঁথা—কাজেই ওদের বিশ্বাস করতে পারেন।

কথাগুলি এমনি জোর দিয়ে সুখলাল বললে যে আর তর্ক না করে মেনে নিলাম আমি। বুঝলাম, সুখলালের এই গভীর আত্মপ্রত্যয়ের উৎস রয়েছে ডুবছোলার মাটিতে—সেখানে নিবিড়ভাবে বাঁধা পড়েছে তার অস্তিত্ব। অতএব তারই অনুমোদনমত ডুবছোলার কয়েকটি লোককে কাজে বহাল করলাম।

চিরিমিরি পাহাড়ে শিবির পত্তন করলেও ডুবছোলার মাটির মানুষদেরই ডেকে আনতে হ'ল আমাদের পাহাড়ে অবস্থানকে নির্বিঘ্ন করতে।

ক্ষয়

হাজারিবাগ জেলায় করণপুরার কয়লাক্ষেত্র। সে বছর শীতের শুরুতে বরদাচরণ সেখানে এলেন। সঙ্গে তাঁর আর্দালি রামসিং।

পত্রাতু নামে গ্রামটির বাইরে শিবির পত্তন করলেন বরদাচরণ। তাঁর সুইস্-কটেজ্ তাঁবুর পাশে রামসিং-এর ছোলদারি ও রান্নার তাঁবু খাটানো হ'ল। সুইস্ কটেজের পেছনে রইল স্নানের তাঁবু।

বরদাচরণের কর্মজীবনের এই শেষ সফর। শেষবারের মত মূক ধরণীর মৌন রহস্য ভেদ করতে বেরিয়েছেন তিনি। প্রায় ত্রিশ বছর ধ'রে জড় পাথরের স্তূপের আচ্ছাদন উন্মোচন ক'রে প্রকৃতির ভেতরকার প্রচ্ছন্ন সত্যকে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন। শুক্তির ভেতরে যেমন মুক্তা, তাঁর অনুসন্ধানের ভেতরে তেমনি এক পরমাশ্চর্যের প্রত্যাশা ছিল।

কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বরদাচরণ অবশ্য বুঝতে পারছেন যে, আকাঙ্ক্ষিত পরমাশ্চর্য অধরাই থেকে গেছে। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ক'রে যা কিছু পেয়েছেন, কোনটাই তাঁর কল্পনার পরমাশ্চর্যের সঙ্গে খাপ খায়নি।

তাঁর কর্মজীবনের ভূবৈজ্ঞানিক পর্যটনের শেষ ঋতুটিতে কোনও রকম বিস্ময়ের প্রত্যাশা নেই। মনের প্রত্যাশাবোধে তাঁর দেহমনের মতই ক্ষয় ধরেছে। বয়স তাঁর প্রৌঢ়ত্বের সীমা পেরিয়ে বার্ধক্যের দিকে ঝুঁকেছে। যৌবনে তাঁর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে যে সামগ্রিকতা ছিল, তা ক্ষয় হ'তে হতে সঙ্কুচিত হয়েছে।

মন নিবীর্য, শরীর অপটু। অনিচ্ছুক দেহটাকে তাঁবু থেকে টেনে বের ক'রে যান্ত্রিকভাবে পত্রাতুর চারপাশে ঘুরে বেড়িয়ে নির্দিষ্ট কর্মসূচীতে আগ্রহলেশহীন-ভাবে শুধু দাগা বোলান তিনি।

ঘুরতে ঘুরতে বরদাচরণ দেখলেন যে, জায়গাটি খোয়াই দিয়ে আচ্ছন্ন। পাথরে ক্ষয় ধরেছে। বেলে-পাথর ও কাদা-পাথরের স্তরগুলি ক্ষ'য়ে গিয়ে বিশ্লিষ্ট হচ্ছে। মাটির আচ্ছাদনও ক্ষয় হ'তে হ'তে আলগা হ'য়ে গিয়েছে। মাটিকে বেঁধে রাখে যে রস, তা অপসৃত হ'য়ে নিষ্প্রাণ বালির কণাগুলিকে অনাবৃত ক'রে দিয়েছে। প্রয়োজনীয় জীবনরস আহরণ করতে না পেরে এখানে গাছপালা গজায় না। যতদূর দৃষ্টি চলে ধূ ধূ করছে মরুগ্রাসের কবলিত রুক্ষ প্রান্তর।

প্রকৃতির বুকে ব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যে নিজের ক্ষয়ীভূত সত্তাকে প্রতিফলিত দেখলেন বরদাচরণ। পত্রাতুর রুক্ষ ভূবিন্যাস যেন তাঁর নিজের ক্ষয়াবশেষকে

ব্যঙ্গ করছে। মনে মনে বড় একটা ধাক্কা খান বরদাচরণ। নিষ্ঠুরতম খোঁচা দিয়ে প্রকৃতি যেন বিনাশের দিগ্বিজয়ী শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেছে তাঁর সাম্‌নে।

বরদাচরণের মনে হ'ল যেন ক্ষয় বা বিনাশই সত্য। তিনি নিজে যেমন ক্রমশঃ নিঃশেষ হ'য়ে যাচ্ছেন, প্রকৃতিও তেমনি বিনাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। স্থিতি বা সৃষ্টি সাময়িক বিভ্রম মাত্র। সৃষ্টিকে বলা চলে ধ্বংসের পথে অগ্রসরের প্রথম ধাপ।

সেদিন পত্রাতু গ্রামের অদূরে একটি টিলার নীচে কয়েকটি পাথরের ঢিবি পরীক্ষা করছিলেন বরদাচরণ। ঢিবিগুলো অঙ্গার-যুক্ত কাদা-পাথরের। কয়লাবাহী শিলাস্তরপুঞ্জের ওপর এর অবস্থান। এতে অঙ্গারের ছোপ থাকলেও এর সঙ্গে কয়লার স্তর নেই। তাই এর নামকরণ হইয়াছে **Barren Measures** অর্থাৎ বন্ধ্যা শিলা।

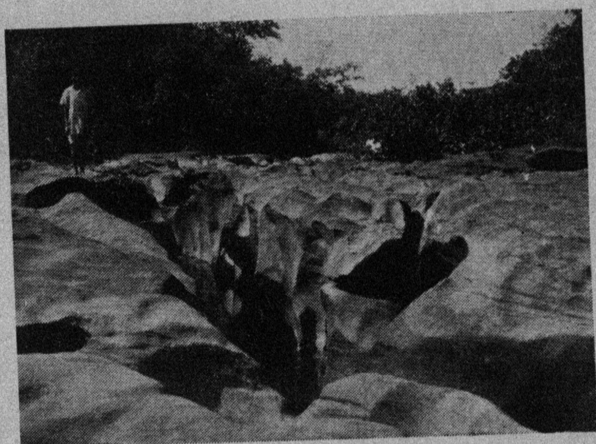
হাতুড়ি দিয়ে এক টুকরো লালচে কালো পাথর ভেঙ্গে নিয়ে লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন বরদাচরণ অভ্যস্ত নিস্পৃহতার সঙ্গে। তাঁর পাশে পাথরের স্যাম্পল্‌ রাখার ঝোলা ও জলের বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আর্দালি রাম সিং। সে হঠাৎ বলে উঠল, স্যার, পাথরগুলোকে দেখে কী মনে হয় না যেন এক তাল বাঁধাকপি প'ড়ে রয়েছে!

বরদাচরণের ভুরু দুটো কুঁচকে ওঠে। পাথরের স্তূপগুলোর দিকে চেয়ে তিনি দেখলেন যে, রাম সিং ঠিকই বলেছে। কাদা-পাথরের পাতলা স্তরগুলো ক্ষ'য়ে গিয়ে উন্মোচিত হচ্ছে চক্রাকারে—ঠিক যেন বাঁধাকপি। ভূবৈজ্ঞানিক ভাষায় এই ধরণের ক্ষয়কে বলে **Spheroidal weathering** বা চক্রাকৃতি ক্ষয়।

বরদাচরণের মনে হ'ল যে এমনি ক'রে ক্ষয় হ'তে হ'তে কাদা-পাথরের ঢিবিগুলো হয়তো একদিন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হ'বে।

তাঁর নিজের মধ্যে অনুরূপ ক্ষয়কে অনুভব করলেন বরদাচরণ। কাদা-পাথরের স্তরগুলির মত তাঁর সত্তা যেন বহু ভগ্নাংশে বিশ্লিষ্ট হয়ে বিযুক্ত হচ্ছে। তাঁর ব্যক্তিসত্তা যেন একটার পর একটা আচ্ছাদন ত্যাগ করে সঙ্কুচিত হচ্ছে।

সেদিন আর কাজে মন দিতে পারলেন না বরদাচরণ। তাঁবুতে ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন তিনি তাঁর ক্যাম্পখাটে। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনজোড়া ব্যাপক অবক্ষয়ের একটা ধূসর বিষণ্ণ ছবি তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ত্রিশ বছরের কর্তব্যপরায়ণতা ও নিরলস কর্মতৎপরতার স্বীকৃতি আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। বছরের পর বছর মনের মধ্যে দুর্নিবার অনুসন্ধিৎসার বর্তিকা জ্বেলে



বেলেপাথরে জলের ক্রিয়ায় উৎকীর্ণ গহ্বর (ক্ষয়)
আলোকচিত্র—এম. এস. আনন্দ

বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বতে তিনি যে দুর্গম থেকে দুর্গমতর পথ অতিক্রম করেছেন, তার কথা অফিসের পুরোনো ধূলোর পুরু প্রলেপলাগা ফাইলগুলির মধ্যে আজ মুখ লুকিয়েছে। সাময়িক সরকারী প্রয়োজন সিদ্ধ করে তাঁর কাজ-কর্ম সব আজ অর্থ হারিয়েছে। পত্রাতুর চারপাশের ভূবিন্যাসের মত তাঁর জীবনের সবকিছু ক্ষয়ে গিয়েছে। এখন চরম রিক্ততাবোধই শুধু সম্বল।

বরদাচরণ ঠিক করলেন যে, তাঁর সফরের বাকি কটা মাস আর ঘোরাঘুরি না ক'রে তাঁবুতে ব'সেই কাটিয়ে দেবেন। অবসর গ্রহণের নির্দিষ্ট দিনের আগেই কাজ থেকে অবসর নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এমন সময় বরদাচরণের সঙ্গে কাজ করতে এল নবীন ভূতাত্ত্বিক তেজেশ। নতুন চাকরিতে বহাল হয়েছে সে। বরদাচরণের কাছে পাঠানো হয়েছে তাকে কাজ শেখাবার জন্য।

তাকে পেয়ে বরদাচরণ খুশি হতে পারলেন না। তাঁর রিক্ততাবোধের মধ্যে তিনি নিজেকে তাঁর চারপাশ থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর একলা আপনের ঢাকা খুলে বেরিয়ে আসতে আর তাঁর প্রবৃত্তি নেই। কারুর সান্নিধ্যই তাঁর কাছে প্রীতিকর নয়। বিশেষ করে তেজেশের মত তরুণ যুবকের সাহচর্য তাঁর কাছে দুঃসহ মনে হল। তেজশকে তাঁর কাছে পাঠাবার জন্যে কর্তৃপক্ষের প্রতি রীতিমত অসন্তোষ বোধ করলেন তিনি।

তথাপি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী তেজেশকে ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজে প্রাথমিক পাঠ দেবার দায়িত্ব নিতে হয়। চাকরির জোয়ালের বাঁধন থেকে মুক্তি না-পাওয়া পর্যন্ত নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া চলে না। পত্রাতুর চার পাশের ভূসংস্থানের পাঠোদ্ধারের পাঠ দিতে শুরু করেন তিনি তেজেশকে।

তেজেশকে নিয়ে দিন কয়েক ঘোরাঘুরি করে বরদাচরণ বুঝলেন যে, শিখবার অকৃত্রিম আগ্রহ আছে তেজেশের। পত্রাতুর ভূতত্ত্বের মধ্যে এমন জটিলতা ছিল, মস্তিষ্ককে যা নিষ্পেষিত করতে পারে। কিন্তু তেজেশ তার স্বচ্ছ বুদ্ধি দিয়ে বরদাচরণের কাছ থেকে সব বুঝে নিল অনায়াসে।

চমৎকৃত হলেন বরদাচরণ। তেজেশের বুদ্ধির আয়নায় তিনি নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন। তাঁর যে এত দেবার আছে, তেজেশের গ্রহণশীলতার মধ্যে তা যেন উদ্‌ঘাটিত হল।

সেদিন তেজেশকে নিয়ে গিড়ির দিকে গিয়েছিলেন বরদাচরণ সেখানকার ভূতত্ত্ব সম্পর্কে পরিচিত হবার জন্য। সেখানে প্রায় সারাদিন ঘোরাঘুরি করে

দিনান্তে তাঁরা দামোদর নদের ধারে গিয়ে পৌঁছলেন। চারপাশে ক্ষয়িষ্ণু ভূচিত্রের মাঝখানে স্বচ্ছ জলের ধারা তাঁদের দুজনের চোখ জুড়িয়ে দিল। জলের ধারার সমকোণে কালো 'ডলারাইট' পাথরের স্তূপ জল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে,—যেন নদীর বুকে প্রকৃতিদত্ত একটা বাঁধ। এই পাথরে আটকে উজানের দিকে খানিকটা জল জমেছে। ডলারাইট আগ্নেয় শিলা—স্থানীয় স্তরীভূত বেলে-পাথরের আবরণ ভেদ করে ভূগর্ভ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে।

নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেন বরদাচরণ তেজেশকে নিয়ে। বালির তীরের প্রান্তে পলিমাটি পড়েছে। জলকে ছুঁয়েছে কাঁচা-মাটি। বালির রুক্ষতাকে ঢেকেছে জলে-ভেজা সরস মাটির আবরণ।

বালির একটানা বিস্তারের মাঝখানে সামান্য একটুখানি কাঁচা মাটি। কিন্তু বরদাচরণের চোখে তা অসামান্য হয়ে ধরা দিল। তুচ্ছ এক ফালি মাটির মধ্যে প্রকৃতির এক চির পুরাতন সত্যকে তিনি যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন।

বরদাচরণের চোখের ওপর থেকে একটা আবরণ অপসৃত হল। পত্রাতুর চারপাশে, মাটি ও পাথরে একটানা ব্যাপক ক্ষয়কেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, এই ক্ষয়ই সত্য। এখন দামোদর নদের ধারে এসে দেখেছেন ক্ষয় থেকে উদ্ভূত নতুন সৃষ্টির পালাকে। চারপাশে ভূবিন্যাস ক্ষয়ে গিয়ে নদীর জলে জমা করছে নতুন পলিমাটির স্তর। এক দিকে ক্ষয়, অন্যদিকে সঞ্চয়। কোথাও কোন ক্ষতি নেই, কিছু হারাচ্ছে না।

এমন সময় তেজেশের দিকে দৃষ্টি গেল তাঁর। সারাদিনের ঘোরাঘুরির ক্লান্তির আচ্ছাদনকে ভেদ করে বেরিয়ে আসছে তারুণ্যের অম্লান দীপ্তি। প্রদীপ্ত দুটি চোখে জ্ঞানের পিপাসা, জানবার ও শিখবার দুর্বার আগ্রহ। বরদাচরণের যা-কিছু দেবার আছে সব যেন সে উজাড করে গ্রহণ করতে চায়। বরদাচরণের অন্তরের অন্তস্তল মথিত হয়ে উঠল একটি দিব্য অনুভূতিতে, যে তিনি এখনও ফুরিয়ে যান নি। তাঁর ভেতরে যা কিছু ক্ষয় পেয়েছে, সব গিয়ে যেন সঞ্চিত হচ্ছে তেজেশ ও তার মত তরুণদের মধ্যে। তাঁর ফুরিয়ে আসা সঙ্কুচিত সত্তার পরিপূরক যেন ওরা। অক্ষয় জীবনবোধের মধ্যে যেন তিনি আবার বেঁচে উঠলেন।

জল

আমার এক সহকর্মী বন্ধুর খুব শখ যে-কোনও ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় অগ্রগামী হবেন তিনি। আগে-ভাগে এগিয়ে গিয়ে নতুন শিবির পত্তন করার কৃতিত্বটা তাঁকে ডিঙ্গিয়ে আর কেউ অর্জন করলে তিনি মোটেই খুশি হন না।

মধ্যপ্রদেশে সিধি জেলার সিংরৌলি তহশিলে কয়লার অনুসন্ধানের কাজ শুরু করার নির্দেশ যখন ওপর থেকে এল, তখন তিনি ভাবলেন যে, সবার আগে গিয়ে প্রারম্ভিক যাবতীয় বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব তিনিই নেবেন।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোমাত্র তাঁর উদ্যোগ আয়োজনের সমারোহে ও আতিশয্যে আমরা সবাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

কোথায় আমরা ক্যাম্প করব তা' ঠিক হওয়ামাত্র সাময়িক কুটির নির্মাণের উপকরণ সংগ্রহে রীতিমত তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। প্রথমে বন-বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে কাঠ ও বাঁশের বন্দোবস্ত করা হ'ল। তারপর কাঁচা ইঁট ও খাপরা সংগ্রহের পালা। স্থানীয় একজন ঠিকাদার এসে বললে যে, কাঁচা ইঁট ও খাপরা সরবরাহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সে নেবে। বন্ধু তার সঙ্গে দর-দস্তুর শুরু করলেন।

ঠিকাদার বললে, কাঁচা ইঁট হাজার প্রতি ছ' টাকা, খাপরা হাজারপ্রতি দশ টাকার কমে হবে না।

বন্ধু লোকটির মুখের পানে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললেন, কী দিয়ে তৈরী কর তোমরা ইঁট-খাপরা? সোনা-রুপো দিয়ে?

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে লোকটা বললে,—না সাহেব, সোনা-রুপো দিয়ে করব কেন! মাটি-জল দিয়ে।

—মাটি জল দিয়ে—বেশ। এখন বল তো বাপু, কার মাটি, কার জল।

—মাটি আমারি সাহেব, আর কারুর নয়। দশ বিঘা জমি আছে আমার।

—তোমার মানে! বন্দোবস্ত নিলেই মাটি তোমার হ'য়ে গেল। শোন হে কত্তা, মাটি তোমার নয়, কারুর নয়—মাটি ভগবানের। আর জল—

—জল আমারি সার, কোন শালার নয়। আমার জমির সীমানার মধ্যে একটা পুকুর, দু-দুটো কুয়ো।

—আমার আমার করছ কেন হে ছোঁড়া? জল তোমার বলছ, আস্পর্ধা তো কম নয়! শুনে রাখ, জল তোমার বা তোমার চৌদ্দ-পুরুষের কারুর নয়।

ভগবানের জল, ভগবানের মাটি, তাই দিয়ে খাপরা ও ইঁট তৈরি করবে—অথচ তার জন্য এমন চড়া দর হাঁকছ! তোমার নরকেও জায়গা হবে না।

নরক সম্বন্ধে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না থাকলেও লোকটা জল বা মাটির ওপর তার স্বত্ব সম্পর্কে আমার বন্ধুর রায় মেনে নিতে রাজি ছিল না। কারণ জমির জন্য রীতিমত কর দিচ্ছে সে—পুকুরটা এবং কুয়ো দুটো খোঁড়াতে তার কম টাকা খরচ হয়নি। মুখ বেজার ক'রে সে চ'লে গেল আমায় বন্ধুর নির্ধারিত দরে ইঁট বা খাপরা দিতে অস্বীকার করে।

বন্ধু বিন্দুমাত্রও দমে না গিয়ে বললেন, কুছ পরোয়া নেহি—দরকার হ'লে খাপরা ও ইঁট আমরাই বানাব। ভগবানের জল ও মাটি তো আছেই।

আমাদের ক্যাম্পের জন্য নির্দিষ্ট জমিটা পাথুরে। ইঁট-খাপরা প্রস্তুতের উপযুক্ত মাটি রয়েছে আশে-পাশে বেসরকারী জমিতে। কিন্তু জমির মালিকের কাছ থেকে এক মুঠো ধূলোও পাওয়া গেল না। তা' ছাড়া যে-সব পুকুরের সন্ধান পেলাম, সে-সব পুকুর থেকে যথেচ্ছ জল তুলে নেওয়ার স্বাধীনতা আমাদের দিতে চাইল না পুকুরগুলোর মালিকেরা। তাদের সবিনীত নিষেধের আড়ালে হিংস্র প্রতিরোধের প্রস্তুতিকে প্রত্যক্ষ করলাম।

ভগবানের মাটি ও জল যে সহজলভ্য নয় তা' অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে উপলব্ধি ক'রে আমার বন্ধু সেই ঠিকাদারকেই ডেকে পাঠালেন আবার, এবং তার নির্ধারিত দরেই খাপরা ও ইঁট কেনার ব্যবস্থা করলেন।

আমি বলেছিলাম, জল বা মাটি ভগবানের হলেও খোদার ওপর খোদকারি করনেওয়ালাদের কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। উপায়ও নেই। আইন-কানুন এদেরি পক্ষে, ভগবানের পক্ষে নয়।

বন্ধু চুপ ক'রে রইলেন গম্ভীর মুখে।

বন্ধুর ইচ্ছে ছিল সিংরৌলি পাহাড়ের মাথায় ক্যাম্প করবেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, পাহাড়ের ওপরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা এবং স্বাস্থ্যকর। কিন্তু আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলাম যে, এই নীরস পাথুরে পাহাড়ে জল সহজলভ্য হ'বে না।

বন্ধু বলেছিলেন, তাতে কী—পাঁচ পাঁচটা টিউবওয়েল বসাব।

—তা' নয় বসাবে। কিন্তু জল কত নীচে আছে জান?

বন্ধু ড্রিলিং এঞ্জিনীয়ার। ড্রিলিং মেসিনের সার্থক যন্ত্রী হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। মাটির নীচে প্রায় দেড় হাজার ফুট পর্যন্ত শিলান্তর বিদারণে তৎপর

বড বড় কয়েকটা মেশিন আছে তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি বলিলেন, যত নীচেই হোক না কেন, আমার বড় বড় ড্রিলিং মেশিনগুলোর নাগালের বাইরে হবে না নিশ্চয়।

আমি বললাম, তা' নয়। কিন্তু সাধারণ টিউবওয়েল বসিয়ে জলটা তুলতে পারবে না—ইলেক্‌ট্রিক পাম্পের দরকার হ'বে। আছে তোমার কাছে ?

আমতা আমতা ক'রে বন্ধু বললেন, তা' নেই। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ? ঐ ঝর্ণা আছে একটা, ওখান থেকে জল পাম্প ক'রে আনলে হয় না ?

—সে তো প্রায় মাইল দেড়েক দূরে। আছে তোমার অত লম্বা পাইপ লাইন ?

দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে বন্ধু বললেন, না, নেই। কিন্তু ভাই এত জল যায় কোথায় ? এখানে বৃষ্টির তো কমতি নেই। তবে পাহাড়টা শুকনো খটখটে কেন ?

এই প্রশ্নটি উৎপীড়িত করেছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের বিজ্ঞানী পিয়ের পেরোর মন। 'সেইন' নদীর উপত্যকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় নদী-প্রবাহের শীর্ণতা তাঁর কাছে প্রহেলিকা মনে হয়েছিল। বৈজ্ঞানিকভাবে পরিমাপ ক'রে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে নদীতে যত জল, তার চেয়ে অনেক গুণ জল বৃষ্টির ধারায় নেমে আসে।

পিয়ের পেরোর পর্যবেক্ষণকে অনুসরণ ক'রে আমরাও ভাবতে চেষ্টা করি সিংরৌলি পাহাড়ে যে এত বৃষ্টি হয়, তার জল যায় কোথায়।

বৃষ্টির জলের বিলি-ব্যবস্থা নিম্নলিখিত মত হ'য়ে থাকে ব'লে ভূ-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন :

(১) খানিকটা মাটির ওপর দিয়ে বা মাটির স্তরের ভেতর দিয়ে নদী-নালার অভিমুখে ব'য়ে যায় ; (২) মাটি ও শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে নিম্নগামী হ'তে থাকে কিছুটা ; (৩) যৎসামান্য পরিমাণে মাটি ও গাছপালায় শোষণের কবলিত হয় ; এবং (৪) অবশিষ্ট অংশ মাটিতে পড়ার আগেই বাষ্পীভূত হয়।

কাজেই যতটা জল মেঘ থেকে নামে, তার পুরোটার হিসেব আমরা সাদা চোখে দেখতে পাইনে।

ভূগর্ভে জল-সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করে জলবাহী শিলাস্তরগুলো। মাটির নীচে জলে পুরোপুরি সম্পৃক্ত একটি স্তর আছে জল বহনে সক্ষম শিলাপুঞ্জে। যে-সব পাথর জলের আধার হ'তে সক্ষম, তাদের বিশেষত্ব হ'ল এই যে; তারা নিরেট নয় ; অর্থাৎ তাদের দানাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক আলগা। অথবা, তাদের মধ্যে

প্রচুর ফাটল আছে, যেখানে জল জমতে পারে। এই স্থায়ী জলবাহী স্তরটি ভূপৃষ্ঠের বিন্যাসের সমান্তরাল হ'য়ে থাকে।

যেখানে বৃষ্টি খুব বেশী ও আবহাওয়া বারমাসই স্যাঁতসেঁতে, এবং জমি সমতল, সেখানে জলে সম্পৃক্ত স্তরটি অগভীর। সিংরৌলি পাহাড়ে বর্ষাকাল বৃষ্টির প্রাচুর্যে ভরপুর থাকলেও শীত ও গ্রীষ্ম সম্পূর্ণ নির্জল। তা' ছাড়া অঞ্চলটি পাহাড়ী ও বন্ধুর। কাজেই জলের স্থায়ী স্তরে উপনীত হওয়ার আগে পরপর নিম্নলিখিত স্তরগুলির সাক্ষাৎ পাই ড্রিলিং মেশিন দিয়ে নলকূপ খুঁড়তে গিয়ে ঃ

(১) নির্জল-শিলাস্তর। এখান দিয়ে জল শুধু নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। কিছুটা জল অবশ্য মাটি শুষে নেয় গাছপালাগুলোকে পরিপুষ্ট করবার জন্য।

(২) অস্থায়ী জলবাহী শিলাস্তর। বর্ষার সময় এই স্তরটি জলে ভরা থাকে। অর্থাৎ বেশি বৃষ্টিপাতের দরুণ নীচের স্থায়ী জলের স্তরটি তার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে উঠে আসে।

(৩) স্থায়ী জলবাহী শিলাস্তর। এই স্তরটা বারমাসই জলে ভরা থাকে। অতিবৃষ্টি হ'লে এই স্তর উর্ধ্বগামী হ'য়ে অনেক সময় অস্থায়ী জলের স্তরকে ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। এই স্তরে না পৌছুতে পারলে স্থায়ী জলের আধার পাওয়া যাবে না। যে-সব নলকূপ বা কুয়া এই স্তর পর্যন্ত পৌছয়নি, তারা গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় সহজেই। যে নদীর এই স্তরের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, গ্রীষ্মকালে তার ধারা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়। যে নদীর খাত এই স্তরের সঙ্গে মিশেছে, তাতে জলের অভাব ঘটে না কখনো।

সিংরৌলি পাহাড়ের কয়েক মাইল দক্ষিণে রিহাণ্ড নদীতে দেখেছিলাম স্থায়ী জলের স্তরের সঙ্গে নদীর খাতের মিতালি। কিন্তু অল্প কিছু দূরেই সিংরৌলি পাহাড়টা নির্জল খটখটে, সেখানে এক গণ্ডূষ জলের জন্য প্রায় চারশ ফুট বেলে পাথরের স্তর বিদীর্ণ করতে হয়।

পাহাড়ের নীচে ক্যাম্প করতে আমার বন্ধু আর আপত্তি করেন নি। এখানে মাটির অল্প নীচেই বেলে-পাথরে উহ্য রয়েছে জলের স্থায়ী ধারা। পাঁচটা নলকূপের মাধ্যমে সেই জলকে আমরা আমাদের তৃষ্ণার বারি হিসেবে পেতে থাকি প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত পরিমাণে।

প্রকৃতি নাকি নিয়মের রাজত্ব। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্য প্রকৃতির নিয়মগুলোর সৃষ্টি হয় নি। প্রকৃতি তার নিয়মে সহজেই

দেয়, কিন্তু মানুষের সাধ্য নেই সেই দানকে সোজাসুজি হাত পেতে নেবার। তাকে অনেক খেটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আহরণ করতে হয় ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল।

বৃষ্টির ধারায় যে জল প্রকৃতির সহজ দানের মত ঝ'রে পড়ে, তাকে নিয়ে নিজের প্রয়োজন মেটাতে মানুষকে বিস্তর মেহনত করতে হয়েছে। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ না ক'রে প্রকৃতির দানের দিকে হাত বাড়াতে পারে নি সে। তাই মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন জলের জন্য বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা, নদীতে বাঁধ-বাঁধা, জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা।

মানুষ নিজে যাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার ওপর নিজের অধিকার আরোপ করতে সে কুণ্ঠিত নয়। সিংরৌলির ইঁট-খাপরার ঠিকাদার, তাই জল-মাটি সম্পর্কে তার অধিকারকে জাহির করেছে নিঃসঙ্কোচে।

তবু মাঝে মাঝে এই অধিকার বোধের অহমিকার মধ্যে নিজের ক্ষুদ্রতাকে প্রত্যক্ষ করে মানুষ। নিজের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য বলে, ভগবানের মাটি, ভগবানের দেওয়া জলে সকলের সমান অধিকার। তাই সে নদীর ধারে বা নদীর উৎসমুখে জলাশয়কে ঘিরে গ'ড়ে তোলে মন্দির। সেখানে সবাই আসবে, অবগাহন ক'রে দৈনন্দিন অস্তিত্বের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়োবে।

মধ্যপ্রদেশে অমরকণ্টক পাহাড়ে নর্মদার উৎসমুখে এমনি একটি তীর্থস্থানকে দেখেছিলাম। কাল ব্যাসল্ট পাথর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে স্বচ্ছতম জল ফোয়ারার মুখ দিয়ে। তারপর শুরু হয়েছে একটি ক্ষীণ রূপালি ধারার অভিযান পশ্চিম অভিমুখে। উৎসের জলকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে ছোট একটি জলাশয় গ'ড়ে তোলা হয়েছে। জলাশয়কে ঘিরে নির্মিত হয়েছে কয়েকটা মন্দির নর্মদেশ্বর ও নর্মদা দেবীর।

পুণ্যতোয়া নদীর উৎস—তীর্থবারি। অসংখ্য যাত্রী স্নান করে জলে নেমে। দেখে মনটা প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে।

হৃষ্টচিত্তে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় দেখলাম একটা লোক মন্দিরের বাইরে ম্লান মুখে ব'সে আছে একটি গাছের ছায়ায়। তার শুকনো শীর্ণ দীপ্তিহীন মুখের মতোই মলিন তার বেশ-বাস। সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে আছে সে মন্দিরের দরজার দিকে।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী, মন্দিরে যাবে না?

লোকটা মুখ নীচু ক'রে বললে, যাব কী ক'রে? আমি যে নীচু জাত, অচ্ছ্যুৎ।

আমি ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বললাম, নীচু জাত মানে! নতুন আইন-কানুনের কথা শোননি! কেউ আটকাতে পারে না তোমার মন্দিরে যাওয়া।

লোকটা গম্ভীর মুখে বললে, মানুষের আইন-কানুনের চেয়ে বড় ভগবানের আইন-কানুন। এ জল ভগবানের। আমার মত ছোট জাত ঐ জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেই অশুচি হ'য়ে যাবে সমস্ত জল।

আমি চুপ ক'রে রইলাম। মন্দির দিয়ে ঘেরা জলের স্বচ্ছতা যেন আগাগোড়া কালিমায় লিপ্ত হল।

নদী

হাওড়ার ব্রিজে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকাবার অবসর ছিল না তখন আমরা দু'জন ছাড়া আর কারুর। সকাল তখন ন'টা। ব্রিজের রূপালি নিশ্চলতার পটে ব্যস্ত শহরের উদ্দামতা প্রকাশ পাচ্ছে ট্রাম, বাস, ট্রাক ও মোটর গাড়ির গতির আবেগে। ঝুলন্ত ব্রিজকে কাঁপিয়ে উঠছে একটানা গুম্ গুম্ শব্দ নদীর কলতানকে ছাপিয়ে। গাড়ির মিছিলের সঙ্গে ছন্দ মেলানো জনস্রোত নদীর স্রোতের সমকোণে ব'য়ে যাচ্ছে একটানা, নিরবচ্ছিন্ন। নদীর দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল শহরের কর্মব্যস্ততা যেন নদীকেও আচ্ছন্ন করেছে। তীরে কারখানার শ্রেণী, চিমনির ধোঁয়া, জলে ছোট বড় স্টীমার, জাহাজ, গাদা-বোটের ভিড় নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে যেন ক্ষুন্ন করেছে। এখানে নদী যেন নদীত্ব হারিয়েছে। আবিল জলস্রোত যেন ব্যস্ত মহানগীর ধমনী—সমস্ত শহরকে জীবনীশক্তি আধান ক'রে হারিয়ে ফেলেছে স্বকীয় প্রাণের আবেগ।

ঘোলা জলের মধ্যে সেই নদীকে খুঁজছিলাম, হিমালয়ের হিমবাহ থেকে যা মুক্তি পেয়ে সুদূর সমুদ্রের আকর্ষণে ব'য়ে যাচ্ছে।

রোদের তেজ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। জলের ঘোলাটে বিবর্ণতার ওপর রূপালি জৌলুস খেলে। হঠাৎ কোন্ মন্ত্রবলে নদীর ভেতরকার সুপ্ত আত্মা যেন বেরিয়ে এল। ব্রিজ থেকে একটু দূরে উজান বেয়ে যাচ্ছিল একটি নৌকা। জলের স্রোতের বিপরীতে গতি সঞ্চারিত হচ্ছিল জলে দাঁড়ের আঘাত হেনে। চারপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে জলের নিরবচ্ছিন্নতা বিঘ্নিত হয়নি কোনও স্টীমারের সান্নিধ্যে। খানিকটা স্বাধীন জলের বিস্তার। আমার বন্ধু বলে উঠলেন, এক সঙ্গে এতখানি জলের মধ্যে একটিমাত্র নৌকা, হাওড়ার ব্রিজ থেকে এমন দৃশ্য কদাচিৎ চোখে পড়ে।

বন্ধু তার ক্যামেরার আধারে দৃশ্যটি ধ'রে রাখতে চাইলেন।

আমি বললাম, নদীতে নৌকো ভেসে যাচ্ছে, এই অতি সাধারণ দৃশ্যটির জন্য ফিল্ম খরচ করছ কেন?

বন্ধু বললেন, একদিন হয়তো এই হাওড়ার ব্রিজ, কল-কারখানা, স্টীমার-জাহাজ সমেত সমস্ত শহরটা লোপ পেয়ে গিয়ে নদীর মধ্যে নৌকো ভেসে যাওয়ার সাধারণ দৃশ্যটি শুধু অবশিষ্ট থাকবে।

আমি বললাম, কিন্তু এই নদীও তো একদিন লোপ পেতে পারে।

বন্ধু হেসে বললেন, তা' পারে। কিন্তু সে তো অনেক দূরের কথা। তোমাদের ভূতাত্ত্বিক হিসেবে লক্ষ লক্ষ বছর পরে এই নদী হয়তো তার ধারা হারাতেও পারে। কিন্তু অত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি দেবার দরকার কী?

বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, নদীর ধারা পরিবর্তনে অত সময় লাগে না। মাত্র তিন শ' বছর আগে পর্যন্ত কলকাতার দক্ষিণে আমরা যাকে আদি-গঙ্গা বলি, সেই আদিগঙ্গার খাতেই এই ভাগীরথী নদী সমুদ্র-যাত্রা করত। তার-পর একশ' বছরের মধ্যে আদিগঙ্গা তার এখনকার আকৃতিতে পরিণত হয়েছে—ভাগীরথী তার বর্তমান খাত দিয়ে সোজা দক্ষিণবাহী হয়েছে।

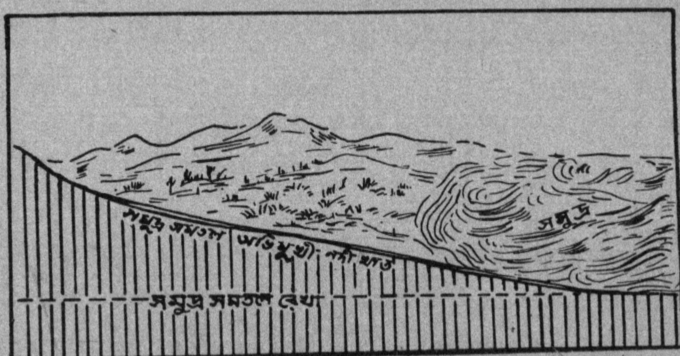
সমস্ত উত্তর ভারতের ইতিহাস রচনা করেছে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের অসংখ্য উপনদী ও শাখানদী। এরাই হিমালয় থেকে পলিমাটি ব'য়ে নিয়ে এসে উত্তর ভারতের বিপুল সমতলভূমি গ'ড়ে তুলেছে। এই নদীগুলির তীরে তীরে ঘন মানুষের বসতি, গ্রাম, শহর, কৃষিকর্ম, শিল্প-বাণিজ্য, সম্পদ-সমৃদ্ধি। এই নদীগুলোকে আশ্রয় ক'রেই এক বিচিত্র সভ্যতার বিকাশ। পলি ছড়িয়ে অতি উর্বর কৃষিযোগ্য সারবান মাটি সৃষ্টি করছে এই নদীগুলি। এদের বাদ দিয়ে ভারতের আর্যাবর্তকে কল্পনা করা যায় না—কল্পনা করা যায় না বৈদিক সভ্যতার ক্রমবিকাশকে। এই নদীগুলি না থাকলে আর্যরা হয়তো এদেশে পদার্পণ করতেন না এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে হ'ত।

যে নদীগুলি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তাদের আমরা স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নিয়ে সুসমৃদ্ধ ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করি। নদীগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা ভাবি না। এই নদীগুলি আছে ও চিরকাল থাকবে এই বিশ্বাসের ওপর ভর ক'রে চিরন্তন শস্যশ্যামলতার স্বপ্ন দেখি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে-সব পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা করা হচ্ছে তার ভিত্তি হ'ল চিরস্থায়ী ভূসংস্থান, যেখানে নদী-গুলি তাদের নির্দিষ্ট খাত দিয়ে ব'য়ে যাবে চিরকাল।

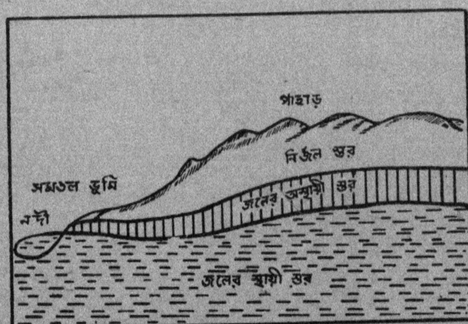
প্রাকৃতিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে চিরস্থায়ী বলতে কিছুই নেই। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা কিছুই না। এই যে গঙ্গা নদী পলে পলে পলিমাটি জমিয়ে বিস্তীর্ণ মৃত্তিকার স্তর গ'ড়ে তুলছে, কালক্রমে বেলেপাথর ও কাদাপাথরের পরিবর্তিত রূপের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকবে তার পরিচয়—গঙ্গা নদীকে চিনতে হবে ভূ-বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ক'রে। পাহাড়-পর্বতের অস্থিপঞ্জরে কত হারানো



হুগলী নদী ও নদীর চর (নদী)
আলোকচিত্র—ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়



সমুদ্র সমতল রেখা - নদীর নিম্ন অভিমুখী অবক্ষয় (নদী)



ভূগর্ভে জলবাহী শিলাস্তর (নদী)

নদীর স্বাক্ষর রয়েছে। এই নদীগুলোকে দেখেছে সেই সব জীবেরা যাদের দেহের অবশেষ পাথরের স্তরে স্তরে সংরক্ষিত র'য়েছে জীবাশ্ম-রূপে।

প্রকৃতির বিবর্তনের গতি খুবই সূক্ষ্ম, মানুষের স্থুল চোখ দিয়ে তাকে মাপা যায় না। গঙ্গার অববাহিকাতে জমা পলিমাটির পাথরে জমাট বাঁধতে লাগবে লক্ষ লক্ষ বৎসর। অতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চালাবার মত দূরদর্শিতা কারুর নেই। মানুষ ততদিন টিঁকে থাকবে কিনা সন্দেহ। বহুতর অবলুপ্ত প্রাণীর মত মানুষও হয়তো তখন লোপ পাবে। মানুষের পরিবর্তে অন্য কোনও প্রাণী হয়তো তখন পৃথিবীতে আধিপত্য করবে। মানুষের সভ্যতা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, অতীতের দিকে তাকিয়ে পাঁচ ছ' হাজার বছর পর্যন্ত সভ্যতার বিস্তারকে মেপে-ছেন তাঁরা—ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বেশি দূর পর্যন্ত কল্পনাকে অগ্রসর করতে তাঁরা ভরসা পান না।

অতএব লক্ষ লক্ষ বছরের হিসাবে আমাদের দেশের নদীগুলির বিবর্তন সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে নদীগুলোর বর্তমান অবস্থাকে অবশ্য যাচাই ক'রে দেখা যেতে পারে।

প্রায় ত্রিশটি বড় বড় নদী তাদের অসংখ্য শাখা ও উপনদী নিয়ে জটিল জালের মত গোটা ভারতবর্ষকে ছেয়ে ফেলেছে। এদের মধ্যে যাদের উৎপত্তি হিমালয় পর্বতে, তারা ভারতবর্ষের ভূসংস্থানের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। উত্তর ভারতের বিরাট সমতলভূমি এই সব নদীরই সৃষ্টি। বৃষ্টি ও মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন জলের আধার ছাড়া হিমালয়ের বিপুল হিমবাহ থেকে জল আহরণ ক'রে পরিপুষ্ট হয়েছে এই নদীগুলি। তাদের বিপুল জলধারার দুর্বার গতি বিশ্লিষ্ট করেছে হিমালয়ের ঋজুতাকে। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ বাধাকে অতিক্রম ক'রে নেমে এসেছে তারা সমতলভূমিতে। এখানে নদীগুলোর অন্য রূপ। ভাঙ্গনের পালার এখানে অবসান। হিমালয়ের পর্বতমালাকে বিদীর্ণ ক'রে আহরণ করা শিলাচূর্ণ এখানে সঞ্চিত হয়। হিমালয়ে নদী-উপত্যকাগুলি সঙ্কীর্ণ ও গভীর-সমতলভূমিতে নেমে এসে প্রশস্ত হ'তে হ'তে সমুদ্রসঙ্গমে এসে বিপুল প্রসার লাভ করে তারা।

গঙ্গা ও যমুনার দুই তীরে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মাঝামাঝি ভূভাগ ব্যাপ্ত ক'রে আছে যে বিশাল সমতলভূমি, তা' এই নদী দুটিরই উপত্যকা।

নদী-খাতের নিম্ন-অভিমুখী অবক্ষয়ের পালা শেষ হ'লে নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম ক'রে দুকূল ছাপিয়ে প্রসারিত হ'বার পালা আসে। সাধারণতঃ বড় বড় নদী

সমুদ্রে গিয়ে মেশে। কাজেই নদী-খাতের নিম্ন-অভিমুখী অবক্ষয়ের লক্ষ্য সমুদ্রের সমতল। সমুদ্র সমতলের সম-ভূমিতে পৌছানো মাত্র নদীর নিম্নগামী ক্ষয়ের পালা শেষ হয়।

গাঙ্গেয় উপত্যকার বিপুল প্রসার থেকে বোঝা যায় যে গঙ্গার খাত সমুদ্র-সমতলের সম-ভূমিতে পৌছাবার পর তার নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে সম্প্রসারণের পালা চলছে লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে। নদী-খাতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পলিমাটির সঞ্চয়। ফলে নদীর খাতের পরিবর্তন ঘটেছে। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত সুবিস্তৃত গাঙ্গেয় উপত্যকা জোড়া পলিমাটির বিস্তার সাক্ষ্য দিচ্ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গঙ্গার খাত পরিবর্তনের।

এর থেকে বোঝা যায় যে, গঙ্গার বর্তমান খাতটিরও স্থায়িত্ব নেই। নূতনতর খাতে স্থানান্তরের আয়োজন নদীপ্রবাহের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে চলছে।

এই নদীর খাত-পরিবর্তনের অপেক্ষাকৃত দ্রুততা আমরা বাংলাদেশে দেখতে পাই। সমুদ্র-মোহনার সান্নিধ্যে এখানকার জলের ধারা স্তিমিত—জলস্রোতে পরিবাহিত পালিমাটি সঞ্চিত হ'তে হ'তে খাতের গভীরতা কমে আসে। এমনি ক'রে ক্রমশঃ নদীর খাত মজে গিয়ে নূতনতর খাতের সম্ভবনার পথকে উন্মুক্ত করে।

বাংলাদেশে এসে গঙ্গা নদী দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। তার একটি শাখা রাজমহল পাহাড়কে বেষ্টন ক'রে দক্ষিণবাহিনী হয়েছে। এই হ'ল ভাগীরথী। একেই আমরা গঙ্গার মূল ধারা ব'লে জানি। অথচ গঙ্গার জলের বিপুল সম্ভারের অধিকাংশ ব'য়ে যাচ্ছে পদ্মার প্রশস্ত খাত দিয়ে। ভাগীরথী ও পদ্মা দুয়ে মিলে গড়ে তুলেছে দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ববঙ্গের অধিকাংশকে। নদীতে বয়ে-আসা পলি-মাটির বিস্তৃতভাবে সঞ্চয়ের ফল হ'ল বাংলার নরম মাটি।

পলিমাটি সঞ্চয়ের ব্যাপক বিস্তার বাংলাদেশের বর্তমান নদীগুলোর ঘন ঘন গতি-পরিবর্তন ও খাত-বদলের সাক্ষ্য দিচ্ছে। পলিমাটির স্তরে স্তরে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে কত মজে-যাওয়া নদীর স্মৃতি। গত পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে ভাগীরথী ও পদ্মার গতিপথ-পরিবর্তনের যে ইতিহাস সমসাময়িক ভূমি-নক্শা থেকে পাওয়া যায়, তা' থেকে বোঝা যায় যে উত্তর বাংলা বাদ দিয়ে অখণ্ড বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত ভূভাগকে ধুয়েছিল এই দুটি নদী।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কলকাতার দক্ষিণে আদিগঙ্গার খাত দিয়ে ভাগীরথীর মূল ধারা প্রবাহিত হ'ত সমুদ্রের উদ্দেশ্যে। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে

ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহ পরিবর্তিত হ'ল। আদিগঙ্গা বর্তমান আকারে পরিণত হ'ল। পূর্ববঙ্গে পদ্মার গতিপথ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কী পরিমাণ ভাঙ্গাগড়া এই নদীর দুই তীরে সংঘটিত হ'য়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, তা' প্রাচীন নক্‌শাগুলো বিশ্লেষণ ক'রে বোঝা যায়।

হিমালয় থেকে উদ্ভূত উত্তর ভারতের নদীগুলির তুলনায় বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণদিকের নদীগুলির প্রবাহপথ অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। তার প্রধান কারণ, এখানকার নদীগুলির জলের ধারার ক্ষীণতা। বর্ষাকালে বৃষ্টি দিয়ে সুপুষ্ট হ'লেও গ্রীষ্মকালে এরা শুকিয়ে যায় এবং শীতকাল থেকে শুরু ক'রে জলের ধারা নিরবচ্ছিন্নতা হারিয়ে ফেলে। নদীগুলি উৎস থেকে সমুদ্র-মোহনা পর্যন্ত সক্রিয় হ'বার সুযোগ পায় একমাত্র বর্ষাকালে। ফলে নদীখাতগুলি উত্তর ভারতের নদীগুলোর মত জলের ক্রিয়ায় অবক্ষয়ের কবলিত হয় না। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের দরুণ নদীর দুকূল ছাপিয়ে বন্যা হ'লেও নদী-খাতের দ্রুত পরিবর্তনের আশঙ্কা নেই।

ভারতের নদ-নদীর ইতিহাস ভারতেরই ইতিহাস। ভারতের নদ-নদীর বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অনেক অনুদ্‌ঘাটিত তথ্য ও বৈচিত্র্য প্রকাশ পাবে সন্দেহ নেই।

জলপ্রপাত

মধ্যপ্রদেশের সুরগুজা জেলায় বনাঞ্চলে ঘোরাঘুরি করছিলাম। চিরিমিরির উত্তরদিকে সোনহাট অঞ্চলে কয়লার সন্ধান ছিল আমার উদ্দেশ্য। রোজ ভোর-বেলায় ম্যাপ, কম্পাস, হাতুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি, সঙ্গী পথপ্রদর্শক সুখলাল। মহারাজপুর নামক গাঁয়ে ক্যাম্প করেছি। পূবে নগর থেকে পশ্চিমে বেলবাহারা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আমার বিচরণক্ষেত্র। প্রাথমিক সমীক্ষা শেষ হ'লে পর এখানে ড্রিলিং ক'রে মাটির নীচে কয়লার প্রচ্ছন্ন স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার পালা আসবে।

শালবনে ছাওয়া পাহাড়গুলিতে বেলেপাথরের স্তরগুলির গঠন বিশ্লেষণ ক'রে তাদের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস করি। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ী নালা বালির কণাযুক্ত পাথরের খোলস বিদীর্ণ ক'রে কয়লার স্তরকে অনাবৃত করেছে। সেখানে কয়লার স্তরের বিন্যাসকে বোঝবার চেষ্টা করি কম্পাস দিয়ে মাপজোক ক'রে।

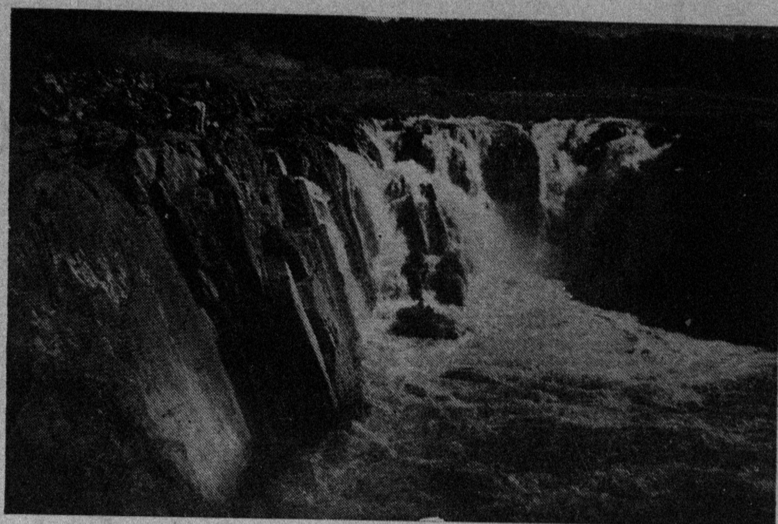
এমনি ক'রে ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ করতে করতে চিরিমিরি থেকে প্রায় বার মাইল উত্তরে কিরওয়াহি নামক গাঁয়ে গিয়ে হাজির হ'লাম। বন ও পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছোট গ্রাম। অদূরে পাহাড়ী নদী হেস্‌দো। গ্রামের সীমানার বাইরে একটি টিলার ওপরে বনবিভাগের ডাকবাংলো।

নদীর দিকে খানিকটা এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল একটা জলপ্রপাত। চোখে পড়বার আগেই অবশ্য জলের উচ্ছ্বাস কর্ণগোচর হয়েছিল।

নদী-খাত নেমে গিয়েছে প্রায় দেড়শ ফুট। গ্রীষ্মের শুকিয়ে-আসা বিশীর্ণ জলের ধারা প্রপাত বেয়ে পতনের সময়ে কয়েকটি ভাগে বিশ্লিষ্ট হয়েছে—নীচে পাথরের স্তূপে প্রতিহত হয়ে প্রচণ্ড গর্জনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। দুর্দম বেগের আবেগে জলের ভিতরকার প্রচ্ছন্ন শক্তি মুক্তি পেয়েছে।

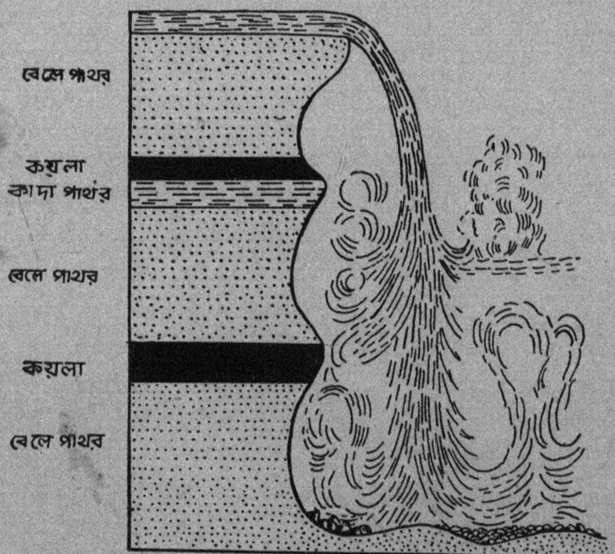
জলপ্রপাতের নীচে সামান্য কিছুদূর পর্যন্ত জলের ফেনিল আবর্ত। তারপর জলের ধারা আবার শান্ত ও স্তিমিত। জলপ্রপাত থেকে অল্প কিছু দূর গিয়ে নদীর খাত বাঁক নিয়ে উধাও হয়েছে ঘন বনের জমাট বাঁধা সবুজের মধ্যে। বাঁকের ওপর দাঁড়িয়ে জলপ্রপাতটিকে ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পেলাম।

বিচ্ছিন্নভাবে নেমে-আসা জলের ধারাগুলির ফাঁকে ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করেছে সাদা, ধূসর ও কালো রঙের রকমারি শিলাস্তর। শক্ত বেলেপাথরের নীচে



ভেরাঘাট জলপ্রপাত, জব্বলপুর (জলপ্রপাত)

আলোকচিত্র—এম. এস. আনন্দ



সমুতধারা জলপ্রপাত – হেসুয়ো নদীর খাতকে চিরে ফেললে যেমন দেখা যাবে

(জলপ্রপাত)

কাদাপাথর ও কয়লার নমনীয়তা। প্রকৃতির নিয়মের রাজত্বে শক্তের সঙ্গে নরমের সহাবস্থান সম্ভব নয়। শক্ত বেলেপাথরের নীচে কয়লা, কাদাপাথর ইত্যাদি নরম পাথরের স্তর জলের ধারার আঘাতে অপেক্ষাকৃত দ্রুত ভাঙ্গনের বশবর্তী হয়। ফলে নদী-খাত নিম্নগামী হয়ে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। সাধারণ ঢাল বেয়ে বয়ে-যাওয়া জলের ধারার তুলনায় পতনোন্মুখ জলের সংহারশক্তি অনেক বেশী। কাজেই ভাঙ্গনের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়ে। কমনীয় শিলাস্তর ক্ষয় হয়ে অপসৃত হ'লে ওপরের শক্ত পাথরের আবরণও হয় বিপর্যস্ত।

ভাঙ্গনের পালা অবিশ্রান্তভাবে চলছে। জলের ক্ষুরধারায় বিশ্লিষ্ট হয়ে রাশি রাশি পাথর খসে পড়ছে। নদীর স্রোতের সংহারলীলায় জলপ্রপাতটি ক্রমশঃ আয়তনে বাড়ছে।

পথপ্রদর্শক সুখলাল বললে, ইয়ে ঝরিয়াকা নাম 'অমৃতধারা'। শিউরাত্রিমে ইহা মেলা হোইস্—বহুত জোরদার মেলা।

আমি প্রশ্ন করলাম, অমৃতধারা নাম হ'ল কেন?

—ইয়ে ঝরিয়াকা পানিমে অমৃত মিলিস—যো পিনেসে মৌৎসে জী সকতা হায়।

কিরুওয়াহি গ্রামের উত্তর-পুর্বে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে সোনহাট গাঁয়ের অদূরে হেস্‌দো নদীর উৎস। প্রায় দু' হাজার ফুট উঁচু একটি পাহাড়ে গুটিকয়েক ঝর্ণা থেকে নদীটির ক্ষীণ সূচনা। তারপর পাহাড়ের পর পাহাড়ের বাধা অতিক্রম করে দক্ষিণ-অভিমুখী অভিযান—পাষাণ কারাগার ভেদ ক'রে দুঃসাহসী আত্মপ্রকাশ —বেলেপাথরের জড়তা বিশ্লিষ্ট হয়েছে তার প্রতিটি পদক্ষেপে। কিরওয়াহিতে এসে 'অমৃতধারায়' নদীটির প্রবাহের গভীর রেখা চিহ্নিত হয়েছে। চারপাশে পাহাড়ের নিশ্চলতাকে স্পন্দিত ক'রে এখানে জলের ভিতরকার শক্তি পেয়েছে মুক্তি।

এই শক্তিকেই আহরণ করে মানুষ নদীতে বাঁধ বেঁধে। জলের প্রচণ্ড বেগ অতিকায় টারবাইন-গুলোকে ঘুরিয়ে করে বৈদ্যুতিক শক্তির উদ্বোধন।

গ্রীষ্মকাল তখন। চারদিকে পাহাড়গুলি জুড়ে অগ্নি-অভিষেক চলছে। পাহাড়ের গায়ে ঘাসের আচ্ছাদন সূর্যের তাপে বিবর্ণ হয়ে এসেছে। গরম বাতাস বইছে—যেন পাহাড়ের গায়ে প্রচ্ছন্ন কোটি কোটি অগ্নিকুণ্ডের তপ্ত নিঃশ্বাস। কিন্তু কিরুওয়াহির এই জলপ্রপাতটিকে ঘিরে স্নিগ্ধ শীতল মনোরম একটা অখণ্ড আরামের আয়োজন। তপ্ত ধরিত্রীর বুকের সমস্ত রস যেন এখানে সঞ্চিত এবং জলপ্রপাতের ধারা বেয়ে সিঞ্চিত। যেন দিগ্বিদিক্ জুড়ে অসুরদের মত্ত অনুসন্ধান

থেকে অমৃতভাণ্ডকে বনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এই নদী-খাতে লুকিয়ে রেখেছেন দেবতারা। এখানকার বাতাস আমার রোদ-পোড়া শরীরে যেন চন্দনের প্রলেপের মতো লাগল।

মনের মধ্যে অনির্বচনীয় সুখের স্রোত বয়। প্রায় আশি বছর আগে ইংরেজ ভূতাত্ত্বিক থিয়োডোর হিউজেস্ এখানে এসে যে নির্মল আনন্দ অনুভব করেছিলেন, আমার মনের মুগ্ধতাবোধে এসে মেশে যেন তা'। আমাদের দু'জনের মাঝখানে প্রায় শতাব্দীকালের ব্যবধান থাকলেও একই পুলকরাশি আমাদের দু'জনকে ঐক্যসূত্রে বাঁধে। ভূতাত্ত্বিকদের মধ্যে থিয়োডোর হিউজেস্ই এখানে প্রথম আসেন। এখানে ভূতাত্ত্বিক জরিপ করতে করতে কির্ওয়াহির জলপ্রপাতটিকে দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর মুগ্ধ হৃদয়ের স্বাক্ষর রয়ে গেছে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের রিপোর্টে। বিরস ভূতাত্ত্বিক বর্ণনার মধ্যে কবিত্বের আমেজ এনে দিয়েছে জলপ্রপাতটি।

সূর্য মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে। ক্লান্তি বোধ করছিলাম। বসতে ইচ্ছে হ'ল। জলপ্রপাতের বিপরীত দিকে উঁচু পাহাড়ের মাথায় বন-বিভাগের ডাকবাংলোর সামনে পাশাপাশি দুটি লম্বা কংক্রিটের চেয়ার বেলেপাথরের মধ্যে গাঁথা রয়েছে। ভাবলাম চেয়ারদুটির একটিতে গিয়ে বসি।

আমি চেয়ারদুটির নিকটবর্তী হতেই একজন ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন, ডানপাশের ঐ চেয়ারটাতে বসবেন না দয়া করে। ওটা এইমাত্র মালীকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে রেখেছি। আমাদের বড় সাহেব এলেই ওখানে ভেলভেটের চাদর পেতে ওঁকে বসতে দেব।

ঈষৎ হেসে আমি বললাম, আমি বসলে কী চেয়ারটা নোংরা হয়ে যাবে! তা, ছাড়া ভেলভেটের ঢাকনা দিয়ে চেয়ারটা তো ঢাকবেনই।

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে ভদ্রলোকটি বললেন, না মশাই। বড় খুঁতখুঁতে আমাদের বড়সাহেব। কোন বিষয়ে কোনওরকম ত্রুটি সইতে পারেন না। আপনি ওপাশের চেয়ারটাতে বসুন না।

—হ্যাঁ, তাই বসছি। আপনিও বসুন না। দু'জনে মিলে গল্প করা যাবে। আপনার সঙ্গে তো পরিচয়ই হল না। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তৃতীয় ব্যক্তি যখন কেউ উপস্থিত নেই—

—আমার নাম শঙ্করলাল শ্রীবাস্তব। রেলওয়ের সার্ভেয়ার আমি। এখানে ক্যাম্প ক'রে সার্ভে করছি এদিকে বিজুরি থেকে কারোনজি পর্যন্ত যে নতুন

রেললাইন তৈরি হবে, তার জন্য। কিন্তু আপনার সঙ্গে গল্প করার সময় তো আমার নেই। যে-কোনও মুহূর্তে আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনীয়ার সাহেব এসে উপস্থিত হবেন।

আমি সোচ্ছ্বাসে বলে উঠি, এখানেই ক্যাম্প ক'রে আছেন আপনি? এই ফল্‌স্‌-এর কাছে! আপনার সৌভাগ্যে ঈর্ষাবোধ করছি আমি রীতিমত।

বিরস বদনে শঙ্করলাল বললেন, ঈর্ষা বোধ করার কিছু নেই। বরঞ্চ করুণা বোধ করুন আমার বিড়ম্বিত দশার জন্য। একটানা ছ'মাস ধরে এখানে থাকতে থাকতে ঐ ওয়াটার ফল্‌স্‌-এ অরুচি ধ'রে গেছে। আপনাদের কেন যে ঐ ওয়াটার ফল্‌স্‌-টাকে ভাল লাগে, তা' ভেবে পাই নে এখন। আমি তো ওদিকে আজকাল তাকাই-ই নে পারতপক্ষে।

সবিস্ময়ে আমি বললাম, সে কি! এমন সুন্দর ফল্‌স্‌-টা—আমি তো এমনটি কখনো দেখিনি।

—আমি যে একটানা ছ'মাস ধ'রে দেখছি। দেখতে দেখতে আমার মনের ভাল লাগাটা মরে গেছে। এখন যদি যাদুমন্ত্রবলে এই ফল্‌স্‌-টা একটা শহুরে সুইমিং পুলে পরিণত হয়, অখুশী হই নে। বিবেচনা ক'রে দেখুন, আপনি ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছেন, যতক্ষণ খুশি দেখবেন, তারপর চলে যাবেন মনের মধ্যে খুশির স্মৃতি নিয়ে। আর আমি! আমাকে এখানে কর্তব্যের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঐ ওয়াটার ফল্‌স্‌-টাকে বাধ্যতামূলকভাবে দেখতে হচ্ছে। আপনার দেখা বা না-দেখার স্বাধীনতা আছে, তাই আপনার ভাল লাগছে—কিন্তু আমার তা' নেই, কাজেই আমার ভাল লাগছে না।

আমি বললাম, বসুন না শ্রীবাস্তবজী। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন।

হাতজোড় করে শঙ্করলাল বললেন, আপনার বহুৎ মেহেরবানী বাবুজী, কিন্তু আমাকে বসতে বলবেন না ঐ চেয়ারে। ওখানে বসলে ঐ ওয়াটার ফল্‌স্‌-টা দু'চোখের সমস্ত নজর জুড়ে বসে। তা' ছাড়া যে-কোনও মুহূর্তে আমাদের বড়সাহেব এসে হাজির হতে পারেন। আমার বসে থাকাটা তাঁর পছন্দ হবে না। সবদিক থেকে এখন আমি তাঁকে খুশী রাখতে চাই। ঐ চেয়ারে ভেলভেটের চাদর পেতে দেব, যাতে ওখানে আরাম ক'রে বসে তিনি ওয়াটার ফল্‌স্‌-টাকে দেখতে পারেন। এখানে তিনি প্রথম আসছেন—এই প্রথম ফল্‌স্‌-টাকে দেখবেন। দেখে আনন্দ পাবেন নিশ্চয়ই—যেমন আপনি ও আর

সকলে পান। তা ছাড়া দৌলৎকে পাঠিয়েছি মুরগির খোঁজে। ডাকবাংলোর খানসামা খাসা রাঁধে—উৎকৃষ্ট মোরগ-মোসল্লম রেঁধে দেবে বলেছে সে। বড়সাহেব খুশি হ'লে বেস্‌-ক্যাম্প মানেন্দ্রগড়ে আমার বদলির আর্জিটা মঞ্জুর করবেন নিশ্চয়ই।

আমি বললাম, মানেন্দ্রগড় তো অতি বিশ্রী জায়গা। যেমন নোংরা, তেমনি শ্রীহীন।

শঙ্করলাল আমার মুখের ওপর সুতীব্র ভ্রূকুটি হেনে বললেন, 'বিশ্রী কাকে বলছেন! এ তল্লাটে ঐ তো একমাত্র শহর। ওখানে মেশবার মতো লোকজন আছে, দোকানপাট আছে, সিনেমা আছে। তা' ছাড়া আমার স্ত্রী ওখানে আসতে আপত্তি করবেন না। এখানে বন-বাদাড়ে তিষ্ঠোতে পারেন নি তিনি। ওয়াটার ফল্‌স্‌-টা তো তাঁর চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল।

—চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল!

—হ্যাঁ মশাই। লোক নেই, জন নেই, দোকানপাট নেই, সিনেমা-বায়োস্কোপ নেই, আছে শুধু একটা ওয়াটার ফল্‌স্‌—এমন একটি জায়গা কোনও রক্ত-মাংসের মানুষের সহ্য হতে পারে কি! আমার না হয় চাকরির দায় রয়েছে, কিন্তু আমার স্ত্রীর তো কোন দায় ঠেকেনি যে এমনি সৃষ্টি-ছাড়া পাণ্ডববর্জিত জায়গায় থাকবেন। কাজেই তিনি চলে গিয়েছেন লক্ষ্ণৌতে তাঁর বাপের বাড়ি। ব'লে গেছেন যে যদি কোনও শহুরে বা শহর-ঘেঁষা জায়গায় বদলির ব্যবস্থা করতে পারি, তা হ'লে তিনি ফিরে আসবেন, নচেৎ নয়। ঐ যাঃ, আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে আমার খেয়ালই নেই যে, শোবার ঘরে খাটের ওপর বৈকুণ্ঠপুরের রাজবাড়ির গেস্ট্‌-হাউস্‌ থেকে ধার-করে-আনা জাজিমটা বিছিয়ে দিতে হবে।

বলে শঙ্করলাল প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ডাকবাংলোর পেছন দিকে চলে গেলেন।

শঙ্করলাল এতক্ষণ যেন জলপ্রপাতটিকে আমার দৃষ্টিপথ থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন। তিনি চলে যেতেই রূপালী জলের ধারা আমার চোখের সামনে আবার নতুন করে অপাবৃত হ'ল। পাহাড় ও বনের সবুজ ও ধূসরে মেশানো পটের নিশ্চলতার বুকে শুভ্র রঙের গতির আবেগ সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির কোটি কোটি বছরের জড়তার আবরণ ভেঙ্গে যে উদ্দাম চঞ্চলতাকে মুক্তি দিয়েছে, তা' যেন শঙ্করলাল বা আমার নগণ্য অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। জলপ্রপাতের

শব্দের রেখা ধ'রে যেন কোন সুদূর যুগান্তরে আমাদের দৈনন্দিনতার সঙ্গে জড়িত ছোটখাট সুখদুঃখের নাগালের বাইরে উপনীত হ'লাম।

মাস দুয়েক বাদে কিরওয়াহি গাঁয়ে আবার যেতে হয়েছিল আমাকে, তার কাছাকাছি একটি নালা থেকে কয়লার নমুনা সংগ্রহ করবার জন্য। নালাটির জলের ধারা বেলেপাথরের আবরণ ভেদ ক'রে কয়লার স্তরকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। গর্ত খুঁড়ে কয়লার নমুনা আহরণ করতে বেশি সময় লাগল না। তারপর অমৃতধারার ধারে এসে দাঁড়ালাম।

আকাশ তখন ধোঁয়াটে মেঘে ঢাকা পড়েছে। বর্ষার পূর্বাভাস। যে-কোনও মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। কালো আকাশের ছায়া নেমে এসে বন ও পাহাড়ের ওপর ম্লান আচ্ছাদন টেনেছে। আকাশ-মাটিজোড়া এই ধূসর বিষণ্ণতাকে বিদীর্ণ ক'রে অট্টহাসির মত নেমে আসছে যেন জলপ্রপাতটি। নদীর উৎসমুখে বোধ হয় বৃষ্টি পড়েছে, জলপ্রপাতের জলের ধারা ফেঁপেফুলে জলের বিচ্ছিন্ন রেখাগুলিকে একত্র ক'রে দিয়েছে একটি বিপুল প্রবাহের ঐক্যবন্ধনে। বন ও পাহাড়ে ব্যাপ্ত একটা নিবিড় তপস্যাকে ভাঙছে যেন হাজার হাজার অপ্সরার কলহাসি।

জলপ্রপাতের কাছাকাছি নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম। পাথরে উৎক্ষিপ্ত জল লক্ষ লক্ষ মুক্তাবিন্দুর মতো আমাকে ঘিরে ফেলে। যেন একটা স্নিগ্ধ চপল কৌতুকের পালার মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ দেখলাম, জলের কিনারায় পাথরের ওপর বসে আছেন শঙ্করলাল। জলের স্রোতের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বোধ হয় নিজের ছায়াটিকে দেখছেন তিনি।

আমাকে দেখেও যেন তিনি দেখলেন না। আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, ব্যাপার কী—আপনি এখনো এখানে রয়েছেন! মানেন্দ্রগড়ে আপনার বদলি হওয়ার কথা ছিল না?

শঙ্করলাল আমার দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বললেন, কথা তো ছিল না। চেষ্টা করছিলাম অবশ্য। ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনীয়ার সাহেব যখন এসেছিলেন, তখন ভেবেছিলাম যে তিনি এই ওয়াটার ফল্‌স্‌-টাকে দেখে খুশী হয়ে আমার বদলির আর্জি মঞ্জুর করবেন। কিন্তু ফল্‌স্‌-টা তাঁর নজরেও এসেছে কিনা সন্দেহ। সোজাসুজি ডাকবাংলোর ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি কোনও দিকে না

তাকিয়ে। যে কয় ঘণ্টা এখানে ছিলেন, একটিবারের জন্যও ডাকবাংলোর বাইরে বেরিয়ে আসেন নি। সার্ভের কাজে আমি কিছু ভুল করেছিলাম, সেই ভুলগুলি সম্পর্কে আমাকে ওয়াকিবহাল ক'রে দেওয়ার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি ফিরে চলে গিয়েছিলেন। আর এমনি আমার পোড়া বরাত যে দৌলৎ ব্যাটা সে-দিন মুরগি জোগাড় করতে পারে নি। আলুর সব্জি দিয়ে চাপাটি খেয়ে তিনি যে খুব খুশী হয়েছিলেন তা' মনে হয় না। কাজেই বুঝতেই পারছেন—

বলে শঙ্করলাল হাসলেন। বড় করুণ সে-হাসি।

মনে মনে ব্যথিত হয়ে উঠে আমি বললাম, বর্ষা তো এসে গেল। সার্ভের কাজ তো এখন অসম্ভব। মানেন্দ্রগড়ে যাওয়াতে এখন নিশ্চয়ই কোন বাধা নেই।

—না নেই। অর্ডারও এসে গেছে এই ক্যাম্প বন্ধ ক'রে বেস্-ক্যাম্প-এ যাবার। কিন্তু গিয়ে কী করব! আমার স্ত্রী বর্ষাকালে লক্ষ্ণৌ শহর ছেড়ে এক পা-ও নড়বেন না বলেছেন। মানেন্দ্রগড় এ-তল্লাটে একমাত্র শহর হ'লেও লক্ষ্ণৌ কানপুরের তুলনায় একটা বড় গ্রাম বই তো নয়।

শঙ্করলালের বুক চিরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

তারপর জলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আগের বার আপনাকে বলেছিলাম যে, এই ওয়াটার ফল্‌স্-টাকে আমি সইতে পারছি নে—দেখে দেখে আমার অরুচি ধ'রে গেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে, ঐ ফল্‌স্-টার সঙ্গে আমার মিল রয়েছে। ওর মতো আমিও একা। সময় পেলেই এখানে জলের ধারে এসে বসি। জলের মধ্যে নিজের ছায়া দেখি। দেখে মনে হয়, আমি যেন আমি নেই, আমি একটা ছায়ামাত্র। জলের স্রোতে আমার ছায়াটার সঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার কল্পনা ক'রে অদ্ভুত আনন্দ পাই। এ জায়গাটি ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না আমার।

—কিন্তু ক্যাম্প বন্ধ করবার অর্ডার যখন এসে গেছে—

—তখন যেতে হবেই। বিড়ম্বনা একেই বলে। যখন এখানে থাকতে ভাল লাগছিল না, তখন থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু এখন যখন থাকতে চাই, তখন থাকবার জো নেই।

প্রচ্ছন্ন তাপ

মুঙ্গের জেলায় জামালপুরের দক্ষিণে অনেকগুলো পাহাড় শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আছে। পাহাড়গুলির পূব দিকে হাবেলি খড়গপুর নামে ছোট একটি শহরের নামে পাহাড়গুলিকে খড়্গপুর পাহাড় বলা হয়। এই সব পাহাড়ে এ্যালুমিনিয়ামযুক্ত খনিজ বক্সাইট-এর (Bauxite) সন্ধান করছিলাম আমি। পয়সরা নামে একটি গ্রাম থেকে উত্তর দিকের পাহাডগুলিকে পরখ করার পর দক্ষিণে ভীমবাঁধে এলাম। এখান থেকে দক্ষিণের পাহাড়গুলিকে প্রদক্ষিণ করব ঠিক করলাম।

ভীমবাঁধ গ্রামের পাশে একটি নালার ওপরে বাঁধের মত প্রলম্বিত হয়ে আছে কোয়ার্টজাইট্ (Quartzite) পাথরের স্তূপ। পাথরে বাধা পেয়ে জল বাঁধা পড়েছে নির্দিষ্ট একটি আধারে। গ্রামের লোকদের কাছে শুনলাম যে পাথরের স্তূপটা নাকি ভীমের তৈরী বাঁধ। এই বাঁধের নামে গ্রামের নাম ভীমবাঁধ হয়েছে।

নালার জলের ধারা বা বাঁধে-ধরা জল খুব গরম। তাপ ফুটন্ত জলের মত। তা' থেকে শাদা ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, যেমন বেরোয় ফুটন্ত জলের কেটলির মুখ দিয়ে। গ্রামের লোকেদের কাছে শুনলাম যে, এই ফুটন্ত জলের উৎস হ'ল কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ। গ্রামের অদূরে পশ্চিম দিকে কোয়ার্টজাইট পাথরের পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে গরম জলের স্রোত।

শ্রবণ মাত্র আগ্রহ হ'ল প্রস্রবণটিকে দেখতে যাবার। আমার আগ্রহ দেখে আমার সঙ্গী বনবিভাগের ফরেস্ট রেঞ্জার বললেন, প্রস্রবণগুলির একটি রয়েছে বনবিভাগের রেস্ট হাউসের কম্পাউণ্ড-এর মধ্যে। রেস্ট হাউস-এ আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সেখানে থেকে যত খুশি উপভোগ করুন প্রস্রবণের জলের তাপ।

ফরেস্ট রেঞ্জারের প্রস্তাব প্রসন্ন মনে মেনে নিই। উষ্ণ প্রস্রবণের উৎসের সামনে বনবিভাগের বিশ্রামাগারটিতে বিশ্রামের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ মিলল। বিশ্রাম-ভবনের সামনে লালচে শাদা রঙের কোয়ার্টজাইট-এর পাহাড়। পাহাড়ের দু-পাশে ঘন বন, কিন্তু পাহাড়টি রিক্ত। তাতে সবুজের কোন স্বাক্ষর পড়েনি। কিন্তু রিক্ততার বক্ষ ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসছে তপ্ত জলের ধারা। কোয়ার্টজাইট-এর নিরেট জড়তাকে বিশ্লিষ্ট করেছে অনেকগুলো ফাটল। ফাটলের ফাঁক দিয়ে গরম জল নির্গত হচ্ছে।

কোয়ার্টজাইট-এর কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে পৃথিবীর হৃদয়ের উষ্ণতা যেন তরলিত হয়ে বেরিয়ে আসছে। বেরিয়ে এসে বয়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট খাত বেয়ে। জল গরম হ'লেও তার স্পর্শে মাটি শ্যামল ও সরস হয়ে উঠেছে।

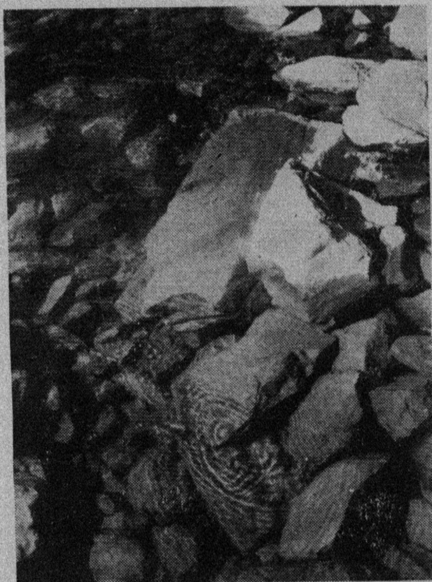
জলের কাছে গেলে তার তাপ যেমন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করা যায়, তেমনি চোখেও দেখা যায় কুণ্ডলীকৃত বাষ্পের আকারে। দিনের আলোয় অবশ্য তেমন স্পষ্ট নয়—কিন্তু ভোরে সূর্যোদয়ের আগে বা সন্ধ্যা বেলায় সূর্যাস্তের পরে জলের ওপরে ঘনীভূত শুভ্রতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। জলের ধারার মানচিত্র এই বাষ্পের কুণ্ডলীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

সেদিন ছিল শুক্ল পক্ষ। রাত্রে জ্যোৎস্নার ছোঁয়ায় উষ্ণ প্রস্রবণের ওপরে যেন একটা চন্দনের প্রলেপ পড়েছে। জলের উষ্ণতা থেকে উদ্গত শুভ্রতাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন আকাশের ছায়াপথ মাটিতে নেমে এসেছে।

বিশ্রামগৃহের সামনের বারান্দায় বসে আমি ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নার সঙ্গে জলের ধোঁয়াটে উষ্ণতার মিতালি উপভোগ করছিলাম, এমন সময় জনৈক বিহারী যুবক আমার পাশে এসে বসলেন। বিশ্রামগৃহে আমার পাশের ঘরেই থাকেন তিনি। এ পর্যন্ত অবশ্য আলাপ হয়নি। ভদ্রলোক একটি সিগারেট ধরিয়ে আমাকে বললেন, শীতের এই রাতে সবই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ওপরের আকাশ থেকে শুরু ক'রে পায়ের নীচে মাটি পর্যন্ত সবই যেন একটানা একটা ঠাণ্ডা ঘর। অথচ মাটির নীচেই প্রচ্ছন্ন আছে উষ্ণতা। তা এই হট্ স্প্রিংস্-এর (Hot springs) মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

আমি প্রশ্ন করলাম আপনি এখানে বেড়াতে এসেছেন বুঝি ?

—না, বেড়াতে আসিনি। অবশ্য ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে খুব। বিহারের যাবতীয় হট্ স্প্রিং পরীক্ষা করতে বেরিয়েছি আমি। হট্ স্প্রিং-গুলো ঠাণ্ডা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উষ্ণ আশ্বাসের মতো। দেখুন না, আমাদের চারপাশে সব কিছুই ঠাণ্ডা হয়ে জমে আছে। মানুষের জীবনও যেন ঠাণ্ডা ঘর। ছকবাঁধা সামাজিক আদান-প্রদানের মধ্যে বিন্দুমাত্রও উষ্ণতা নেই। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যেও নেই কোন তাপ-উত্তাপ। প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখুন, সূর্য থেকে যেটুকু তাপ পাওয়া যায়, তা' বাদ দিলে পৃথিবীর বাইরে সব কিছুই ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে আছে। কিন্তু ঠাণ্ডা আবরণের আড়ালে প্রচ্ছন্ন আছে উষ্ণতা। উষ্ণ প্রস্রবণ তাকে উদ্ঘাটিত করেছে। এই প্রচ্ছন্ন তাপের উৎস খুঁজে নিজের ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাওয়া অস্তিত্বকে তাতিয়ে তুলতে চাই। আচ্ছা, পেশায় আপনি



উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত উষ্ণ জলের
আবর্ত (প্রচ্ছন্ন তাপ)
আলোকচিত্র—সুনীল সেনশর্মা

তো জিয়োলজিস্ট্—বলতে পারেন কেন এই উষ্ণতা। খড়গপুর পাহাড়ের উষ্ণ প্রস্রবণগুলির উষ্ণতার ভূতত্ত্বগত কারণ কী ?

আমি জবাব দিলাম, খড়গপুর পাহাড়ে আমি বক্সাইট খুঁজছি—উষ্ণ প্রস্রবণ নিয়ে মাথা ঘামাইনি। ভাল কথা আপনার সঙ্গে আলাপ হল, কিন্তু নামটা তো জানা হয়নি।

ভদ্রলোক বললেন, নাম আমার রমেশ দয়াল। পেশায় আমিও ভূতাত্ত্বিক।

—পেশায় যখন ভূতাত্ত্বিক, তখন নিশ্চয়ই উষ্ণ প্রস্রবণের উষ্ণতার রহস্যভেদের চেষ্টা আপনি করেছেন। আপনিই বলুন না, কেন এই উষ্ণতা।

সিগারেটে বড়রকম একটা টান দিয়ে রমেশ দয়াল বললেন, এ-দেশের উষ্ণ প্রস্রবণগুলি বড় রহস্যময়। সাধারণতঃ পৃথিবীর যে-সব অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি আছে সে-সব অঞ্চলেই প্রস্রবণ থেকে গরম জল বেরোয়। কিন্তু এ-দেশের উষ্ণ প্রস্রবণগুলির কাছাকাছি তো কোন আগ্নেয়গিরি নেই।

—সক্রিয় কোন আগ্নেয়গিরি না থাকলেও সুপ্ত আগ্নেয়গিরি হয়তো আছে কোথাও। সুপ্ত মানে ধরুন কয়েক হাজার বছর আগে যা সক্রিয় ছিল, আপাততঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে সাময়িকভাবে।

—না, তেমন কোন আগ্নেয়গিরিও নেই। এ-দেশের উষ্ণ প্রস্রবণগুলির কাছে যে-সব আগ্নেয়গিরির চিহ্ন আছে, তারা সুপ্ত নয়, লুপ্ত—প্রায় সাত থেকে বারো কোটি বছর আগে তারা সক্রিয় ছিল। এখন তারা জড় পাথরের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়—আগুনের কণামাত্র স্ফুলিঙ্গও খুঁজে পাওয়া যাবে না তাদের মধ্যে।

আমি বললাম, আগ্নেয়গিরির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও অন্য কোন উৎস থেকে উষ্ণ প্রস্রবণের জল তাপ আহরণ করেছে ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। যেমন ধরুন, মাটির নীচে কোনও তেজস্ক্রিয় খনিজ থাকলে তার তেজে জল গরম হতে পারে। কিংবা মাটির নীচে শিলাস্তরে পাইরাইট্ (Pyrite) থাকলে, পাইরাইট-এর গন্ধক ও লোহা অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে তাপ বিকীর্ণ করতে পারে।

মাথা নেড়ে রমেশ দয়াল বললেন, উঁহু, এ-সবের কোন কিছুরই প্রমাণ এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণে পাওয়া যায়নি। শুধু এখানকার কেন, এ দেশের কোন উষ্ণ প্রস্রবণের সঙ্গে পাইরাইট বা তেজস্ক্রিয় খনিজের কোন সম্পর্ক নেই।

আমি বললাম, তা' হ'লে ধ'রে নিতে হয় যে ভূগর্ভের তাপ থেকে উষ্ণ প্রস্রবণের উষ্ণতা আহরিত হয়েছে। মাটির নীচে ভূগর্ভে তাপমাত্রা প্রতি পঞ্চাশ বা

একশো ফুটে এক ডিগ্রী ফারেনহাইট ক'রে বাড়ে। এই হিসেবে পাঁচ থেকে দশ হাজার ফুট নীচের তাপ প্রায় একশো ডিগ্রী হবে।

—অগত্যা তাই ধ'রে নিতে হয়। কিন্তু যে উষ্ণতা এই ভীমবাঁধের প্রস্রবণের জলে আছে, তার জন্য পাঁচ থেকে দশ হাজার ফুটেরও নীচে যেতে হবে। কিন্তু অত নীচে জলের স্তর থাকতে পারে কী? তাছাড়া ভূগর্ভের তাপই যদি উষ্ণ প্রস্রবণের উষ্ণতার উৎস হয়, সর্বত্র উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে পাইনে কেন? ভারত-বর্ষের উষ্ণ প্রস্রবণগুলি কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাংলায় বক্রেশ্বর, বিহারে পাটনা, হাজারিবাগ ও মুঙ্গের জেলা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীর, পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত এবং অন্ধ্র প্রদেশের করনুল জেলাতে এ-দেশের উল্লেখযোগ্য উষ্ণ প্রস্রবণবগুলি রয়েছে। ভূগর্ভের উষ্ণতা যদি সর্বত্র সক্রিয় না হয়, তা' হ'লে ধ'রে নিতে হবে যে ভূগর্ভের অতলে নিহিত উষ্ণতা স্থান-বিশেষে কোনও রন্ধ্রপথ বেয়ে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। কোনও কোনও বিজ্ঞানী মনে করেন যে, উষ্ণ প্রস্রবণের উৎস হ'ল ভূগর্ভের গলিত শিলাসমষ্টি বা ম্যাগমা-তে (Magma) প্রচ্ছন্ন গরম জল। আবার অন্য বিজ্ঞানীদের মতে ম্যাগমা থেকে উদ্‌গত গরম জলীয় বাষ্প ফাটল বেয়ে উপরে এসে জলকে তপ্ত করেছে। ম্যাগমা থেকে জল বা জলীয় বাষ্প যাই আসুক না কেন, তার আসার জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূগর্ভ পর্যন্ত প্রসারিত একটানা ফাটলের প্রয়োজন। পৃথিবীর ওপরকার স্তরগুলি প্রবল আলোড়নে টললে এমন গভীর ফাটলের সৃষ্টি হতে পারে। এখন দেখা দরকার, এই খড়্গপুর পাহাড়ের শিলাস্তরগুলি কতখানি বিপর্যস্ত হয়েছিল। এখানকার ভূতত্ত্ব তো আপনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন, খড়্গপুর পাহাড়ের শিলাস্তরগুলির বিন্যাস সম্বন্ধে আপনার কী মত?

আমি বললাম, শিলাস্তরগুলিতে অনেক ভাঁজ দেখতে পাচ্ছি। প্রবল আলোড়ন বা বিপর্যয় ঘটলে এমন ভাঁজ পড়তে পারে।

প্রদীপ্ত মুখে রমেশ দয়াল বললেন, ঐ আলোড়ন বা বিপর্যয় এখানকার শিলা-স্তরকে অনায়াসে বিশ্লিষ্ট করতে পারে। ফলে গভীর ফাটলের সৃষ্টি মোটেই অসম্ভব নয়। ভীমবাঁধের এই উষ্ণ প্রস্রবণটি এমনি একটি ভূগর্ভ পর্যন্ত প্রসারিত গভীর ফাটল বেয়ে উদ্‌গত হচ্ছে ব'লে ধ'রে নিতে পারি।

দয়াল ব'লে চলেন, কোন কোন উষ্ণ প্রস্রবণ খুব বেগে বেরোতে থাকে। এই বেগের আবেগ-সঞ্চারের মূলে রয়েছে বাষ্পের চাপ। বেগবান উষ্ণ প্রস্রবণ

গাইসার (Geyser) নামে পরিচিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের Yellowstone National Park-এর গাইসার বিখ্যাত। প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ ভীমবাঁধ এবং খড়্গপুর পাহাড়ের অন্যান্য উষ্ণ প্রস্রবণগুলি গাইসারের মত বেগবান ছিল। চীন দেশের পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ভারত পর্যটনের সময়ে এই খড়্গপুর পাহাড়ে এসেছিলেন। দূর থেকে পাহাড়ের মাথায় ধোঁয়া দেখেছিলেন তিনি। বোধ হয় তখন উষ্ণ প্রস্রবণগুলি গাইসারের মত বেগে উদ্‌গত হয়ে পাহাড়ের মাথায় বাষ্পের আবরণ রচনা করত এবং তা' হিউয়েন সাঙ্-এর চোখে পড়েছিল।

আমি ভীমবাঁধে আসার পর সেখানে প্রায় সপ্তাহখানেক ছিলেন রমেশ দয়াল। তারপর তিনি গেলেন রামেশ্বর কুণ্ডে। সেখানকার উষ্ণ প্রস্রবণের ধারে তাঁবু খাটিয়ে থাকবেন বললেন।

রমেশ দয়াল আমার কাছে বিদায় নিতে এলে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, পাটনায় ফিরছেন কবে?

রমেশ দয়াল জবাব দিলেন, এখানকার কাজ শেষ না ক'রে ফিরছিনে। খড়্গপুর পাহাড়ের সব ক'টা হট স্প্রিং পরীক্ষা করতে বছরখানেক লেগে যাবে আমার।

—কিন্তু বর্ষাকালে এখানকার পথ-ঘাট দুর্গম হয়ে ওঠে, তখন পারবেন কী এখানে থাকতে?

—বর্ষাটা ভীমবাঁধের এই রেস্ট-হাউস্-এ কাটাব। উষ্ণ প্রস্রবণের গরম ছেড়ে পাটনার ঠাণ্ডার মধ্যে যেতে চাইনে।

—বর্ষার পাটনা কী ঠাণ্ডা?

আমার কাছে পাটনা বারো মাসই ঠাণ্ডা। —ম্লান হেসে জবাব দিলেন রমেশ দয়াল। —সেখানে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে বিন্দুমাত্রও উষ্ণতা আছে। আমাদের পরিবারটা হ'ল বনেদী বড়লোকের রক্ষণশীল পরিবার। পারিবারিক অনুশাসনের বেড়ার মধ্যে পরিবারের সকলেরই মনের তাপ-উত্তাপ চাপা পড়ে গেছে।

রমেশ দয়াল ভীমবাঁধ থেকে চলে যাওয়ার দু'দিন বাদে রাত প্রায় আটটার সময় জনৈকা মহিলা তাঁর চাকরকে নিয়ে বিশ্রামগৃহে এসে হাজির হলেন।

তাঁকে দেখে চমকে উঠি। এমন আশ্চর্য রূপ কদাচিৎ চোখে পড়ে।

ভদ্রমহিলা আমাকে প্রশ্ন করলেন, মিস্টার দয়াল কী এখানে আছেন?

আমি জবাব দিলাম, দু'দিন আগে পর্যন্ত ছিলেন। এখন আছেন এখান থেকে প্রায় পনরো মাইল দূরে রামেশ্বর কুণ্ডে।

ভদ্রমহিলার মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে মুখ নীচু ক'রে তিনি বললেন, আমি রমেশ দয়ালের স্ত্রী। পাটনা থেকে আসছি। গাড়িতে ক'রে আসছিলাম। কিন্তু এখানকার বনের সড়কের গেটটার কাছে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে দেখি গেট বন্ধ হয়ে গেছে। বিস্তর অনুনয়-বিনয় ক'রেও চৌকিদারকে দিয়ে গেট-টা খোলাতে পারিনি। অগত্যা তাই গাড়িটা ওখানে রেখে চাকরকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম। যেমন ক'রে হোক, আজই আমাকে আমার স্বামীর কাছে পৌঁছতে হবে। রামেশ্বর কুণ্ডের পথটা আমাকে বাতলে দিন, আমি হাঁটতে হাঁটতেই যাব সেখানে।

—পনরো মাইল পথ হাঁটতে হাঁটতে যাবেন! বনের পথ, পদে পদে আমাদেরই গুলিয়ে যায়। পথ বাতলে দিলেও এ-পথ আপনি চিনে নিতে পারবেন না, মিসেস দয়াল।

শ্রীমতী দয়ালের চোখদুটি জলে ভরে ওঠে। কান্নায় কাঁপানো স্বরে তিনি বললেন, কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে। আজ আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী। এদিনে ওঁকে ছেড়ে তো থাকিনি কখনো।

জমাট-বাঁধা কোয়ার্টজাইট-এর শীতল আবরণ ভেদ ক'রে ভূগর্ভের উষ্ণতা যেমন উষ্ণ প্রস্রবণের ধারা বেয়ে অপাবৃত, তেমনি পারিবারিক অনুশাসনকে অতিক্রম ক'রে একটি নারীহৃদয়ের উষ্ণতার আত্মপ্রকাশকে প্রত্যক্ষ করি। হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন তাপ সব বাধা অপসারণ ক'রে বিকীর্ণ হয়েছে।

আমি বললাম, আমার কাছে জীপ আছে। ড্রাইভারকে ব'লে দিচ্ছি, সে আপনাকে পৌঁছে দেবে রামেশ্বর কুণ্ডে।

হ্রদ

রাজস্থান মরুস্থান। সেখানকার জনপদগুলি যেন মরু-বিজয়ের কেতন ওড়াবার প্রয়াস। মরুভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের ঝোঁক চাপল সম্বর হ্রদ দেখব।

একটা ট্রাকে ক'রে আমরা রওনা হ'লাম একদিন ভোরে। পাকা সড়ক দিয়ে যেতে অনেক ঘুরে যেতে হয়, তাই কাঁচা রাস্তা দিয়ে চললাম আমরা।

ট্রাক এসে পৌঁছল রূপনগর। রূপনগরের অদূরে সম্বর হ্রদ।

নোনা জলের হ্রদ সম্বর। আয়তনে প্রায় নব্বই বর্গমাইল। মরুভূমির মাঝখানে একটা বিপুল প্রসর নিচু জমিতে জল জমে এই হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। এই সুপ্রশস্ত ঢালু জমি স্থানীয় উন্নত ভূচিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। এখানে মাটির নীচের পাথরের স্তরগুলি বিচ্যুত হয়ে নেমে গিয়েছে সম্ভবত। ফলে ওপরের ডাঙা পারেনি স্বকীয় ঋজুতা বজায় রাখতে। তাই বাধ্য হয়েছে অবনত হতে। প্রকৃতির নিয়মের রাজত্বে ফাঁকের ফাঁকি অচল। তাই এখানকার এই গহ্বরের ফাঁককে জল দিয়ে ভরাতে এগিয়ে আসে স্থানীয় নদী-নালা। বৃষ্টির ধারাকে তারা ধ'রে নিয়ে আসে।

সম্বর হ্রদের জল নোনা। কেন নোনা ভূতাত্ত্বিকদের তাই ভাবনা। এখান থেকে সমুদ্র অনেক দূর। তবু জল লবণাক্ত হয় কী ক'রে?

এই লবণের কিছুটা হয়তো স্থানীয় জমির দান। আশেপাশে পাথর বা মাটিতে লবণের কোন সুস্পষ্ট সঞ্চয় নেই। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাটি ও পাথরের সাধারণ উপাদানগুলি থেকে এত লবণ মুক্তি পেতে পারে না। কাজেই ধ'রে নিতে হয় যে, সমুদ্রের নোনা জল থেকে সম্বরের লবণ আহ'রিত হয়েছে।

কিন্তু সমুদ্র অনেক দূর। এত দূর থেকে লবণ এল কী ক'রে বিজ্ঞানীদের কাছে তা একটি রহস্য।

ভূবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, আরব সাগরের তীরে গুজরাটের কচ্ছ থেকে লবণ এসেছে বাতাসে ভর ক'রে। কচ্ছ আরব সাগরের মধ্যে বিলম্বিত এক টুকরো দ্বীপ। চারপাশে তার নোনা খাঁড়ি—বর্ষায় জলে ভরে, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে শুকনো থাকে। জল সরে গেলে বালির সঙ্গে লবণও যায় শুকিয়ে বালির সঙ্গে লবণ মিশে থাকে অন্তরঙ্গভাবে। বাতাসে ঊর্ধ্বগামী

হয় বালির কণা। তার সঙ্গে থাকে লবণের চূর্ণ। বালিতে লবণে মিলে বায়ুযানে সওয়ারি হয়ে চলে রাজস্থানের দিকে। তারপর সম্বরে এসে নামে।

বেছে বেছে সম্বরেই নামে কেন, এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নিরুত্তর। উত্তর খোঁজার চেষ্টার অবশ্য ত্রুটি নেই।

সম্বর হ্রদের ধারে পৌছে দেখি যে, হ্রদের জল শুকিয়ে গেছে। ট্রাকের ড্রাইভার আমাদের বললে যে বর্ষা ও শরৎ ছাড়া অন্যান্য ঋতুতে হ্রদ নির্জলা থাকে।

চোখের সামনে বিপুল বালির বিস্তার—জল চোখে পড়ে না। আমাদের ট্রাক হ্রদের বালিতে এসে নামে।

বালিতে পথের কোন চিহ্ন নেই। পথের চিহ্নহীন পথ দিয়ে ট্রাক চলে। আমাদের মনে হচ্ছিল যেন নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছি।

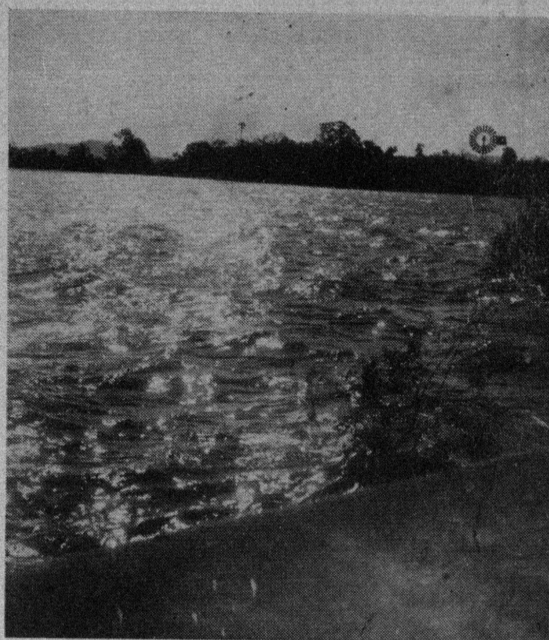
ডাঙ্গার বালি একাকার হয়েছে হ্রদের বালির সঙ্গে। জল নেই, ডাঙ্গা যেন নিজের সীমা অতিক্রম ক'রে হ্রদে নেমেছে। চারপাশের ঋজুতার তুলনায় অবনত ভূবিন্যাস দিয়েই হ্রদকে চিনে নিতে হয়। নুয়ে-পড়া ভূচিত্র হ্রদের স্বাক্ষর-বহন করছে।

কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যেতে শুকনো বালির শুভ্রতার ওপরে জলের রূপালী জলুস ঝলসে ওঠে। দলের একজন বলে ওঠে, সর্বনাশ, সামনেই জল! এতখানি জল পেরিয়ে যেতে পারবে কী আমাদের ট্রাক!

কিন্তু জলের মুখোমুখি হয়ে গাড়ির গতি কমে না। জল যেন ড্রাইভারের গোচরে আসে নি। ঐ অতখানি জল যেন সে দেখতে পায়নি!

পরক্ষণে মনে হ'ল, ট্রাকের গতির সঙ্গে তাল রেখে জল যেন সরে যাচ্ছে। ট্রাক যত এগোয়, জল তত পিছিয়ে যায়। বুঝতে পারলাম যে আমাদের চোখের সামনে জল নয়, মরীচিকার ভ্রম। বালির নিষ্করুণ শুষ্কতাই এখানে একটানা প্রসারিত হয়ে যেন দিগন্তকে ছুঁয়েছে। ঐ বিপুলপ্রসারী জলের বিস্তার রূপালী মোহিনী মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

সামনের দিকে চোখ তুলে তাকালে মিথ্যা জলের বিভ্রম দেখতে হবে, কাজেই দৃষ্টি অবনত ক'রে রাখি। শুকনো বালির ওপরে লবণের আবরণ পড়েছে। শুভ্রপটে শুভ্রতর শিল্পকর্ম যেন। জলের মধ্যে মিশে ছিল, জল উবে যেতে বালিকে আশ্রয় করেছে। সমস্ত হ্রদজোড়া বালি লবণাক্ত হয়ে আছে।



বাঁধ দিয়ে বাঁধা জলের আধার (হ্রদ)



সাঙ্গু হ্রদ, সিকিম (হ্রদ)

আলোকচিত্র—নীহার মুখোপাধ্যায়

বালি থেকে বিযুক্ত ক'রে লবণ আহরণ করা হয়। হ্রদের ধারে সম্বর শহরে চলছে এই আহরণপর্ব।

নির্জলা সম্বর হ্রদ দেখে আজমীরের কাছে পুষ্কর হ্রদ দেখতে গেলাম।

পাহাড়ে ঘেরা স্বল্প আয়তনের হ্রদ। জলে ভরে আছে। শুষ্ক মরুর মাঝখানে জলে-ভরা পুষ্কর যেন রিক্ততার মাঝখানে বিত্তের সঞ্চয়। চারপাশে দগ্ধ মরুর দিগন্তলীন পিপাসা—মাঝখানে জলের উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার। কেমন ক'রে তা' সম্ভব হ'ল, ভাবি।

চারপাশে পাহাড়ের আবেষ্টনের মধ্যে নুয়ে পড়া জমিতে জল ধ'রে রাখার আয়োজন আছে। কিন্তু ছোট ছোট কয়েকটি নালার ক্ষীণধারা বেয়ে এত জল আসে না যে, এত বড় একটা হ্রদকে জলে পরিপুষ্ট করতে পারে। এ অঞ্চলে বর্ষার ভরসাও কম। বৃষ্টি যেটুকু জল ঢালে, শুষ্ক মরুর পিপাসা মেটাতেই তা' নিঃশেষ হয়। উদ্বৃত্ত থাকে না প্রায় কিছুই।

অতএব ধ'রে নিতে হয় যে, মাটির ভেতরকার প্রচ্ছন্ন জলের ভাণ্ডারের সঙ্গে এই হ্রদের যোগাযোগ আছে।

মাটির শোষণে যে জলকে লুপ্ত হতে দেখি, আসলে তা মাটির নীচে পাথরের স্তরে জলের ধারা সৃষ্টি করে। বৃষ্টির জলের কিছুটা নদীনালা বেয়ে বয়ে যায়—কিছুটা উবে যায় সূর্যের তাপে। কিন্তু বেশির ভাগ পাথরের আধারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে বাহিত হয়। মরু-অঞ্চলের বাইরে জল জমতে পায় না, মাটির নীচের এই সংরক্ষিত জলই ভরসা।

মাটির ভেতরকার জলের গোপন উৎস থেকে পুষ্কর হয়েছে পরিপুষ্ট। তাই চারপাশের বিরস বিবর্ণ দগ্ধ মরুর ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা ক'রে এখানে সফল হয়েছে প্রকৃতির রসের আয়োজন।

নির্জলা মরু-অঞ্চলের দুর্লভ জল বলেই বোধহয় পুষ্করের জল পেয়েছে তীর্থবারির স্বীকৃতি। পুষ্করের জলকে ঘিরে গ'ড়ে উঠেছে বাঁধানো স্নানের ঘাট ও মন্দির। পাণ্ডারা আমাদের বোঝালে যে, দুষ্কর তীর্থ পুষ্কর। ডিসেম্বরের সুতীব্র শীতকেও উপেক্ষা ক'রে স্নান-তর্পণ করতে দেখলাম পুণ্যার্থীদের।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে জলকে বেঁধে ফেলে হ্রদ রচনা করা চলে। পাহাড়ী

পরিবেশের মধ্যে নদী বা নালার ধারার মুখে বাঁধের বাধা খাড়া করলে সীমাবদ্ধ আধারের মধ্যে আবদ্ধ হয় জল।

নাগপুর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে রামটেক অঞ্চলে দুটি কৃত্রিম হ্রদ আছে। তাদের নাম হল খিন্দ্‌সি ও আম্বালা।

খিন্দ্‌সি আয়তনে বিশাল। তিনদিকে পাহাড়, একদিকে বাঁধ—মাঝখানে জল জমে আছে। এত জল যে নীলাভ দেখায়।

সেচনের জন্যই জলের এই সঞ্চয়। কয়েকটি খাল কেটে এই হ্রদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

খিন্দ্‌সি হ্রদের কিনারায় একটি সরকারী বিশ্রামগৃহ আছে। বিশ্রামগৃহের প্রাঙ্গণ থেকে হ্রদটির সম্পূর্ণ বিস্তার দেখা যায়।

আম্বালা হ্রদ পাহাড়ে ঘেরা। তার পশ্চিমদিকে রামটেক পাহাড়। রামটেক পাহাড়ে আছে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। এই মন্দিরের সান্নিধ্য হ্রদটিকে তীর্থের মর্যাদা দিয়েছে। হ্রদটিকে ঘিরে গ'ড়ে উঠেছে স্নানের ঘাট ও কয়েকটি শিবের মন্দির।

হ্রদের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ তীর ঘেঁষে একটানা শিবমন্দিরের সারি। পূর্বদিকে শিবমন্দিরের সারির পিছনে জগন্নাথ মন্দির। উত্তরদিকে সেন্দ্রাগির পাহাড়। সেদিকে কোন মন্দির নেই। পাহাড় থেকে নেমে এসেছে নালা।

পাহাড়ের নীচে শান্ত জল। জলের পটে পাহাড়ের ছায়া। মৃদু বাতাসে জলে ভাঁজ পড়েছে।

বাঁধ দিয়ে বাঁধা হ্রদটি কৃত্রিম হ'লেও, তার জলের মধ্যে অকৃত্রিম সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

সাগরিকা

প্রায় বছর পনরো আগে কলকাতার আউট্রাম ঘাটে একটি সমুদ্র-সমীক্ষায় নিযুক্ত জাহাজ দেখতে গিয়েছিলাম। ব্রিটেনের একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থার সামুদ্রিক গবেষণার জন্য জাহাজটি বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক সমুদ্র-মন্থনের কাজে তা' দীর্ঘকাল ধ'রে নিযুক্ত। সাউদাম্পটন থেকে বেরিয়ে জাহাজটি আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের রহস্য ভেদ করেছে—তারপর বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে কলকাতায় তার আগমন-সংবাদ প্রচারিত হতেই তাকে দেখতে গিয়েছিলাম আমি।

জাহাজের ভেতরকার ল্যাবরেটরি-তে ঘোরাঘুরি করতে করতে ডক্টর ডি-র সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। নবীন বয়সী বিজ্ঞানী। কিন্তু সামুদ্রিক গবেষণার অভিজ্ঞতায় রীতিমত প্রবীণ। আমাকে তাঁর খাস কামরায় ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, ল্যাবোরেটরি-তে লক্ষ্যহীনের মত ঘোরাঘুরি ক'রে তো লাভ হবে না, কী জানতে চাও জানাও আমাকে—যথাসম্ভব তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

ডক্টর ডি-র মুখের পানে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমি বললাম, প্রথমে জানতে ইচ্ছে করে, কী ক'রে আপনি এই ভাসমান গবেষণাগারে এলেন।

মৃদু হেসে ডক্টর ডি বললেন, প্রশ্নটা ব্যক্তিগত। কিন্তু নিজের প্রসঙ্গে বলতে কার না ভালো লাগে বল। প্রশ্ন ক'রে আমার নিজের কথা বলার সুযোগ যখন করেই দিলে, তার সদ্ব্যবহার অবশ্যই করব। দেখ ভাই, সমুদ্রের রহস্যের সন্ধানে এমনিধারা ভাসমান গবেষণাগারে ভেসে বেড়াব, এ আমি কখনো কল্পনাও করি নি। পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তির প্রাচুর্যের মধ্যে আমার কোন পেশারই প্রয়োজন ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে আসার পর থেকে প্রায় নিষ্কর্মার মতো দিন কাটছিল আমার। যথাসময়ে চিরাচরিত পারিবারিক পদ্ধতি মতো জনৈকা ধনশালিনী রূপবতীর পাণিগ্রহণ ক'রে আর পাঁচজন ধনীসন্তানের মতো ছক-বাঁধা জীবনযাপন করছিলাম। প্রাচুর্যের মধ্যে অভাব ছিল না, অভাববোধও ছিল না। অভাববোধের অভাবে মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ কি না নিজের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার কোনও তাগিদ কখনো অনুভব করি নি। জান তো, আমাদের দেশটা ছোট একটা দ্বীপ মাত্র। ছোট গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা আমার দেশবাসীদের জীবনবোধকে ক'রে তোলে সঙ্কুচিত। এই খর্বতা সাধারণতঃ কারুর মনে পীড়ার উদ্রেক করে না; প্রথম প্রথম আমার মনেও করেনি। কিন্তু একটানা

অনেকদিন নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকার পর ছোট গণ্ডীর মধ্যে ছোট হয়ে থাকার অবমাননায় জর্জরিত বোধ করলাম। এই আত্মাবমাননার তাড়নায় শেষ পর্যন্ত সামুদ্রিক গবেষণার চাকরিটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমন কি আমার স্ত্রী—সকলে মিলে আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের অভিজাত পরিবারে কেউ কখনো চাকরি করে নি, সামান্য একটা গবেষকের চাকরি নিয়ে আমি আমার পারিবারিক মর্যাদাকে ধুলোয় লুটাব, এটা কেউ বরদাস্ত করতে পারে নি। সে যাই হোক, আমার সঙ্কল্পে আমি অটল রইলুম এবং একদিন সমুদ্রে পাড়ি দিলুম এই জাহাজটিতে ক'রে। সমুদ্র বলতে পাঁচ-পাঁচটি মহাসাগরের কথা বলি আমরা। কিন্তু আসলে তারা পাঁচে মিলে এক—সমস্ত পৃথিবীজোড়া একটানা এবং অবিচ্ছিন্ন জলের রাশি। কাজেই সমুদ্রে ভাসতেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর বিচ্ছিন্নতা থেকে সমস্ত পৃথিবীজোড়া অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের মধ্যে উত্তীর্ণ হলাম।

আমি বললাম, সমুদ্রে কী ক'রে এলেন তা' জানলাম, এবারে সমুদ্রে কী পেলেন তা' বলুন।

ডক্টর ডি বললেন, বলছি শোন। তোমার আমার কারুর হাতেই সময় বেশি নেই, কাজেই সংক্ষেপেই বলি।

গবেষক হিসেবে ডক্টর ডি প্রসিদ্ধ, তাঁর কথা শুনে মনে হ'ল, বাক্যেও তিনি সিদ্ধ। বলার এমন মনোজ্ঞ ভঙ্গি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বিরল। সেদিন সমুদ্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে, যা বলেছিলেন তিনি, তার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিতে প্রয়োজন নেই, সংক্ষিপ্তসারে আমাদের চলবে।

ডক্টর ডি বলেছিলেন যে, সমুদ্র পৃথিবীর শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ জুড়ে আছে। স্থল মানে পৃথিবীর উত্তুঙ্গ অংশ, সমুদ্র যাকে ডোবাতে পারে নি। সমুদ্র হ'ল একটানা অতলস্পর্শী গহ্বর যা জলে প্রচ্ছন্ন। পৃথিবীর মোট আয়তন হ'ল প্রায় কুড়ি কোটি বর্গমাইল। তার মধ্যে প্রায় চৌদ্দ কোটি বর্গমাইল রয়েছে সমুদ্রের শাসনে। সমুদ্রের এলাকা মানে অবনত ভূমি বা গহ্বর। প্রায় চৌদ্দ কোটি বর্গমাইল জোড়া বিপুল প্রসর একটানা গহ্বর কী ক'রে সম্ভব হ'ল, সে রহস্যের সন্তোষজনক সমাধান ভূবিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত ক'রে উঠতে পারেন নি।

সূর্য থেকে পৃথিবীর উৎপত্তির পর পৃথিবী যখন তরল অবস্থা থেকে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে হতে জড় স্তূপে জমাট বাঁধছিল, তখন কুঁচকে যাওয়া শুকনো ফলের



বঙ্গোপসাগর সৈকত (সাগরিকা)

আলোকচিত্র—এস্. সেনগুপ্ত

মতো তার মধ্যে ক্রমান্বয়ে উত্তুঙ্গতা ও অবনতি দেখা যাওয়া স্বাভাবিক। ভূপৃষ্ঠের অবনত অংশগুলিতে জল জমে সমুদ্রের সৃষ্টি সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু সমুদ্রের উৎপত্তিকে এমনি সহজ কার্য-কারণের আওতার মধ্যে এনে ফেলার প্রধান বাধা রয়েছে ভূপৃষ্ঠ ও সমুদ্রতলের গঠনের বৈষম্যের মধ্যে।

ভূপৃষ্ঠ গ্র্যানিট্ ও অন্যান্য হালকা জাতের পাথর দিয়ে গড়া, কিন্তু সমুদ্রতলে রয়েছে ব্যাসল্ট ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারী পাথর। ভূপৃষ্ঠের হালকা শিলাস্তরের আবরণের নিচে এই ভারী পাথরের স্তর বিন্যস্ত হয়ে আছে। ভূপৃষ্ঠে ভাঁজ পড়ে সমুদ্রের গহ্বর সৃষ্টি হয়ে থাকলে, স্থলভাগের হালকা পাথরের আবরণ সমুদ্রের তলাতেও পেতাম। কিন্তু বস্তুতঃ সমুদ্রের গহ্বর থেকে এই আবরণটি অপসৃত। সমুদ্রের গহ্বর এই আবরণের অভাবজনিত শূন্যতা দিয়ে গড়া। সমুদ্রের সুনীল জলধি থেকে উঠে থাকা স্থলভাগের উপকরণ এই হালকা পাথরের আবরণ।

সমুদ্রের উৎস নিরূপণে পদার্থবিজ্ঞানের 'সঙ্কোচন-নীতি' প্রয়োগে সঙ্কুচিত বোধ করার আর একটি কারণ সমুদ্র ও ডাঙ্গার পরিমাণগত বৈষম্য। ঠাণ্ডা হয়ে-আসা বস্তুর সঙ্কোচন কখনো অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে না—তা সমানভাবে সর্বত্র সক্রিয়। কিন্তু মহাদেশগুলির অধিকাংশের একত্র সন্নিবেশ ও সমুদ্রের একটানা প্রসার অসম সঙ্কোচনের সাক্ষী।

কাজেই ঠাণ্ডা হয়ে-আসা পৃথিবীর সঙ্কোচন নয়, সমুদ্র ও ডাঙ্গার বিলিব্যবস্থায় অন্য কোনও কারণ সমুদ্রের সৃষ্টিকার্যে সক্রিয় হয়েছিল ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু সঠিক কারণটিকে ধ'রে নিতে ভূবিজ্ঞানীরা এখনো পারেন নি। হালকা পাথরের আবরণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সামুদ্রিক গহ্বরের সৃষ্টি—এ বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও এই বিচ্ছেদ কী ক'রে ঘটল এবং বিচ্ছিন্ন অংশ কোথায় গেল তা' জানা নেই।

কেউ কেউ অবশ্য অনুমান করেন, বিচ্ছিন্ন অংশটি হ'ল পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ। কিন্তু পৃথিবীর গলিত অবস্থা ছাড়া অন্য কোনও অবস্থাতে পৃথিবী থেকে পৃথিবীর কোনও অংশ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কাজেই চাঁদের সৃষ্টি পৃথিবীর গলিত তরলিত অবস্থাতে ঘটেছিল ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তরলিত অবস্থাতে কোনও পদার্থের মধ্যে জড় পদার্থের বিন্যাস ঘটে না। তরল পদার্থের নিজস্ব নিয়মে কোথাও কোন শূন্যতা থাকতে পারে না—বিচ্ছেদ-জনিত শূন্য স্থানকে তরল পদার্থ নিজেই পূর্ণ করে।

বিজ্ঞানীরা অবশেষে ভূগর্ভের তপ্ত গলিত পদার্থের প্রক্রিয়ার কথা ভেবেছেন। পৃথিবীর বাইরের শক্ত আবরণের নীচে তার কেন্দ্রের মধ্যে তপ্ত গলিত গোলকের অস্তিত্ব প্রমাণিত। এই গোলকের তপ্ত তরল পদার্থ তাপের প্রভাবে ওঠা-নামা করে। এই ওঠা-নামার আবর্ত তার চারপাশের জড় পদার্থকেও প্রভাবান্বিত করে। এই আবর্ত ভূপৃষ্ঠের হালকা পাথরের স্তরের আবরণকে অপসৃত ক'রে সুপ্রসর গহ্বর সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু এ-ও একটি অনুমান—সমুদ্রের উৎপত্তি ব্যাপারে অন্যতর বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনামাত্র; সমুদ্রের সৃষ্টিরহস্য এখনো রহস্যে লীন।

সমুদ্রের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে ডক্টর ডি-র উক্তির সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকলেন ল্যাবোরেটারি-র এ্যাপ্রন-এর শুভ্রতায় মণ্ডিত একজন মহিলা। অনিন্দ্য কান্তি—রূপে অপরূপা, বয়স বোধ হয় পঁচিশের বেশি নয়। ডক্টর ডি—বললেন, ইনি আমার স্ত্রী এ্যালিস্।

আপনার স্ত্রী!—সবিস্ময়ে বলে উঠি আমি।

স্ত্রীর মুখের পানে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডক্টর ডি—বললেন, বোধ হয় অবাক হচ্ছ। আমার সমুদ্র-অভিযানে প্রাণপণ বাধা দিয়ে শেষ পর্যন্ত আমারি সঙ্গে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ইনি আমাকেও কম অবাক করেন নি। আমার সমুদ্রে ভেসে বেড়াবার পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনার সুস্পষ্ট বিরোধ ছিল। অভিজাত সমাজের ছক-বাঁধা জীবনযাত্রার মধ্যে তিনি আমাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি যখন শেখল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলাম, তখন তিনিও পেরিয়ে এলেন তাঁর গণ্ডী। কী করে এলেন তা' বরং উহ্যই থাক। তাকে প্রকাশ্য ক'রে তুললে আমার আত্মশ্লাঘার পরিতৃপ্তি ঘটলেও তাঁর অহঙ্কারে আঘাত হানবে।

মৃদু হেসে শ্রীমতী ডি—বললেন, উহ্য রাখার দরকার কী! প্রকাশ্য ক'রে তুলতে তোমার আপত্তি থাকলে আমিই করছি। তুমি যে ভাবো যে তোমার টানেই আমি বেরিয়ে এসেছি, তা' তোমার কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। তোমার মতো আমাকেও যে সমুদ্র টেনেছে তা' স্বীকার করতে বোধ হয় তোমার অহঙ্কারে বাধছে। শুনুন মিস্টার রায়, আমার স্বামীর মতো আমিও এই সমুদ্রের সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত আছি। সমুদ্রের আকর্ষণে আমিও আমার অভ্যস্ত পরিবেশকে পেরিয়ে এসেছি।

অতল নীলে লীন

আমার বন্ধু ধ্রুব রাও আরব সাগরে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিল ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার জন্য। তার সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী।

লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ প্রবাল দিয়ে গড়া। প্রবাল এক ধরণের সামুদ্রিক কীট— সমুদ্রে শ্রেণীবদ্ধভাবে তাদের বাস। তাদের দেহের চূণাপাথরের আবরণ জমে জমে দ্বীপের আকার নেয়। কোচিন থেকে জাহাজে ক'রে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের দিকে এগিয়ে যেতে সাদা চূণাপাথরের দ্বীপগুলিকে নীল সমুদ্রের বুকে জমাট বাঁধা সাদা ফেনার মতো দেখায়। কোনও কোনও দ্বীপের সাদা রংকে চাপা দিয়েছে নারকেল গাছের ঘন সবুজ আবরণ।

প্রায় তিনটি প্রবাল দ্বীপ বলয়ের আকারে গ'ড়ে উঠেছে। বলয়ের বেষ্টনীর মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে আছে সমুদ্রের জল। সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন এই বৃত্তাকৃতি হ্রদকে বলে লেগুন।

ধ্রুব রাও তার ভূতাত্ত্বিক পরিক্রমাসূত্রে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের প্রায় প্রতিটি দ্বীপে গিয়েছিল। কাবারথী, কিলটান, চেটলাট, পক্ষীপিটি, কালপিট্টি, আগাথী প্রভৃতি অনেকগুলি দ্বীপে ঘোরাঘুরি করেছিল সে। দ্বীপগুলির চারপাশের সমুদ্রের জল খুবই অগভীর। এমন অগভীর জলে যন্ত্রচালিত জলযানমাত্রই অচল। ছোট ছোট ষ্টীমলঞ্চ বা মোটর বোটও চলতে পারে না। একমাত্র হালকা ধরণের নৌকাই পারে এই জলে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যেতে। যে ধরণের নৌকা ক'রে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে ধ্রুব রাও যাতায়াত করছিল, তা নারকেলের দড়ি দিয়ে গাঁথা কয়েকটি কাঠের তক্তার সমাবেশ মাত্র। তাকে নৌকা না ব'লে ভেলা বলাই ভালো।

এমনি একটি নৌকা ক'রে একদিন আগাথী দ্বীপের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছিল ধ্রুব রাও তার ভূতাত্ত্বিক কাজের সূত্রে। ঘোরাঘুরি করতে করতে হঠাৎ এক সময়ে নৌকাটি উল্টে গিয়েছিল এবং সঙ্গীদের নিয়ে জলের মধ্যে প'ড়ে গিয়াছিল ধ্রুব রাও।

ধ্রুব রাও সাঁতার জানত না। জলকে আয়ত্ত করা তার সাধ্য ছিল না, কাজেই জলই তাকে আয়ত্ত ক'রে নেয়। সমুদ্রের নিঃসীমতাকে এতদিন বাইরের থেকে উপভোগ করেছে, এবার ভেতরের খবর নেবার সুযোগ এল তার এই আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে। লবণাক্ত জলে হাবুডুবু খেতে খেতে সে যেন

সমস্ত পৃথিবীজোড়া সব সমুদ্রের নিবিড় স্পর্শ পায়। বাইরের নিবিড় নীলের মোহিনী মায়ার পরিবর্তে রুদ্ধশ্বাস অন্ধকার। অতল জলের দুর্বার আকর্ষণ যেন তাকে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তগুলি পলে পলে তাকে তার চারপাশের নিঃসীম আঁধারের একান্ত সান্নিধ্যে এনে দিতে উদ্যত হয়। এমন সময় পায়ের নিচে ডাঙ্গার স্পর্শ পেল সে।

পায়ের নিচে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন পাওয়ামাত্র তার অসহায় ভাবটা কেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারে যে, তীরের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে গেলে ডুব জলের আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। তার চোখের সামনের অন্ধকার পর্দাটি তৎক্ষণাৎ অপসৃত হ'ল। জলের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে-আসা আলোয় জলের তলায় ভূগোলের আভাস পায় সে। বুঝতে পারে যে এতক্ষণ যে আঁধার দেখছিল, তার উৎস তার মনের আতঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়।

এদিনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ধ্রুব রাও আমাকে বলেছিল, এতদিন বাইরে থেকে সমুদ্রকে দেখেছি—তার সৌন্দর্য উপভোগ করেছি। সমুদ্রের ভেতরের রহস্যের মুখোমুখি হলাম এই প্রথম। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র জলের নীচে থেকে সেদিন সামান্যই দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু গোটা সমুদ্রতলের ভূগোলটা মোটামুটি এক নজরে সেদিন বুঝে নিয়েছিলাম।

সমুদ্রের তলার ভূগোলের খানিকটা আসে ডাঙ্গার আওতায়। জলে প্রচ্ছন্ন ডাঙ্গার অংশটি তীরের এলাকার মধ্যেই পড়ে অবশ্য। জলের সীমারেখা থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত তার বিস্তার। তার ঢাল প্রথমে ডাঙ্গার ঢালকে অনুসরণ করে, পরে নিম্নগামী হয়ে নামে। নামে পাহাড়ের খাড়া উৎরাইয়ের মতো হাজার হাজার ফুট। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম তীর জায়গায় জায়গায় খাড়াভাবে প্রায় বেয়াল্লিশ হাজার ফুট নেমে গিয়ে সমুদ্রের তলকে ছুঁয়েছে।

ডাঙ্গার এলাকার বাইরে সমুদ্র এত গভীর যে, কোনও ডবুরী বা ডুবোজাহাজ তলার নাগাল পায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের অন্তর্দৃষ্টি সমুদ্রের অতল তলের খবর নিয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে শব্দের তরঙ্গ চালনা ক'রে সমুদ্রের তলার ভূগোল তারা বুঝে নিয়েছেন।

সমুদ্রের তলা জুড়ে আছে আর এক মহাদেশ। সব সমুদ্রের তলাকে একত্র করলে পাঁচটি মহাদেশের মোট আয়তনের তিনগুণ পরিমাণ জমি পাওয়া যাবে।

জমি মানে ব্যাসল্ট (Basalt) জাতের ভারী পাথর ও তার ওপরে জায়গায় জায়গায় জমে থাকা বালি ও মাটির স্তর। বালি ও মাটি ডাঙ্গা থেকে নদীর ধারায় বাহিত হয়ে সমুদ্রে সঞ্চিত হয়েছে। ডাঙ্গার ভূগোলের মতই সমুদ্রতলের ভূগোলেও সমতলের সঙ্গে বন্ধুরতার সহাবস্থান ঘটেছে। বন্ধুরতা মানে পৃথিবীর বড় বড় পর্বতমালার মত উত্তুঙ্গতা ও তার পাশাপাশি গভীর গহ্বর। প্রশান্ত মহাসাগরে এ ধরনের গহ্বরের গভীরতা প্রায় চৌত্রিশ হাজার ফুট।

সমুদ্রের ভেতরের মহলের খবরটা আমাদের কাছ থেকে চেপে রেখেছে সমুদ্রের জল। অবশ্য সমুদ্রের জল শুধু জল নয়, অনেক মূল্যবান খনিজেরও উৎস। সমুদ্রের জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় অবস্থান করছে অনেক মূল্যবান খনিজ, ওজনে যারা সমুদ্রের প্রায় শতকরা সাড়ে তিন ভাগ। সমুদ্রের জলে প্রচ্ছন্ন খনিজগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল য়ুরেনিয়াম, সোনা, রূপা, সীসা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি। খনিজ ছাড়া জলের মধ্যে মিশে আছে সোডিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদান যাদের সংস্পর্শে এসে সমুদ্রের জল লোনা হয়েছে।

ধ্রুব রাও ব'লে চলে, সমুদ্রের ভেতরের মহলও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এ্যালুমিনিয়ামযুক্ত কাদা, ফস্‌ফেট্ (Phosphate) ইত্যাদি সমুদ্রের তলাতে স্তরে স্তরে জমে আছে। এই প্রসঙ্গে সমুদ্রের আওতায় আসা ডাঙ্গার খনিজ সম্পদেরও উল্লেখের প্রয়োজন। তাদের ওপরে ডাঙ্গার দাবি যতই প্রবল হোক না কেন, তাদের সামুদ্রিক খনিজ বলেই ধরা হয়। যেমন খনিজ তেল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ তেলের মোট ভাণ্ডারের শতকরা বিশ ভাগ সমুদ্রের এলাকার মধ্যে অবস্থিত।

আমি বললাম, লাক্ষা দ্বীপে খনিজের সন্ধান করতে গিয়ে সমুদ্রের ভেতরের দিকেও নিশ্চয়ই দৃষ্টিপাত করেছ।

ধ্রুব রাও জবাব দিল, করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাতে বাধা পেলাম আমার স্ত্রী কাছ থেকে। সেদিন আমাদের নৌকা জলের মধ্যে উলটে যাওয়াতে জল সম্বন্ধে আমার মনে যত না আতঙ্কের উদ্রেক হ'ল, তার চেয়ে অনেক বেশি জলাতঙ্ক আমার স্ত্রীকে পেয়ে বসে। তিনি বললেন যে, জলে যদি আমাকে নামতেই হয় তিনিও আমার সঙ্গে নামবেন, নৌকায় ক'রে আমার দৈনন্দিন বিচরণপর্বে আমার সহগামিনী হবেন—জলে যদি ডুবে মরতে হয় দু'জনে একসঙ্গে মরাই ভাল। তাঁকে অনেক বোঝালাম যে তিনি আমার সহধর্মিণী হ'লেও

সহকর্মিণী নন, তা' ছাড়া সহমরণের প্রথাও উঠে গেছে। আমার কথায় তিনি কানও দিলেন না। অগত্যা যথাসম্ভব আমাকে নৌকায় ক'রে ঘোরাঘুরি বর্জন করতে হয়। জলে না নেমে ডাঙ্গার ওপর থেকে জলের ভেতরকার তথ্য আহরণ করার চেষ্টা করি।

আমি প্রশ্ন করলাম, তথ্য কিছু পেয়েছিলে কি ?

ধ্রুব রাও বললে, পেয়েছিলাম স্থানীয় কয়েকজন ডুবুরীর সাহায্যে। তারা জলের মধ্যে ডুব দিয়ে প্রচুর পাথরের নমুনা তুলে এনেছিল। সেই সব নমুনা পরীক্ষা ক'রে জলের ভেতরে প্রচ্ছন্ন ভূতত্ত্বকে খানিকটা আয়ত্ত করেছি। তবে জলে না নামলে যে জলের কোন খবর প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না, এমন নয়। তীরে দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে, জলের তলার ভূতত্ত্ব বা ভূগোলের নাগাল না পেলেও জলচরদের চলাচল দেখা যায়। আগাথী দ্বীপে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে অনেক রকম জলচর জীব চোখে পড়েছিল। তাদের গড়ন-ধরন স্থলচরদের চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিশেষ ক'রে তাদের রং-এর জলুস চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এত রকম রং-এর সমাবেশ স্থলচরদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। সমুদ্রের নীলিমার পটে-আঁকা নানা রং-এর বর্ণালি যেন! এক ধরনের হাঙ্গর দেখেছিলাম, যার আশ্চর্য সবুজ রং প্রায় পান্নার মত। দেখতে অমন চোখ-জুড়ানো, অথচ শুনলাম অমন প্রখর হিংস্রতা ডাঙ্গার হিংস্রতম প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায় না। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে রীতিমত রোমাঞ্চিত বোধ করছিলাম।

আমি বললাম, লাক্ষা দ্বীপে সফরটা তোমার রীতিমত রোমাঞ্চকর হয়েছিল মনে হচ্ছে। পেশার সূত্রে গেলেও রীতিমত ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ ক'রে এসেছ দেখছি।

ধ্রুব রাও বললে, তা করেছি। কিন্তু এই আনন্দের কিছুটা ছন্দপতন ঘটেছিল সফরের শেষ দিকটাতে।

—ছন্দপতন কেন ? আবার তোমাদের নৌকা জলের মধ্যে উল্‌টে গিয়েছিল নাকি ?

—না, তা নয়। নৌকা আর উলটায়নি, কিন্তু আমার স্ত্রীর মেজাজটা গিয়েছিল উল্‌টে। তাঁকে এমন বিগড়ে যেতে বিয়ের পর আর কখনো দেখি নি। অবশ্য দোষ আমারি, যা-কিছু তিনি দেখছিলেন, সরল মনে সহজভাবে সব দিব্যি উপভোগ করছিলেন—তার মধ্যে আমার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কপচানোর

কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পেশা আমার বিজ্ঞান, আমার মত বিজ্ঞানীর সঙ্গ পেয়েও তিনি অজ্ঞানের অন্ধকারে থেকে যাবেন, এ আমার সইল না। আমার সফরের শেষদিকে একদিন আগাথী দ্বীপে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের জলের মধ্যে নানা রঙের মাছের আনাগোনা দেখতে দেখতে আমার স্ত্রীকে আমি বুঝিয়েছিলুম যে, এইসব সামুদ্রিক প্রাণীই হ'ল মানুষের শেষ ভরসা। প্রায় বাইশটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত কোটি কোটি মাছ, ঝিনুক, শামুক প্রভৃতি প্রাণী সমুদ্রময় ছড়িয়ে আছে। তাদের মোটসংখ্যা হয়ত পৃথিবীসুদ্ধ সব প্রাণীদের মোট সংখ্যার চেয়েও বেশী। পৃথিবীর মাটির উর্বরতা শক্তি ক্রমশঃ কমতে কমতে মাটি হয়তো একদিন রিক্ত হয়ে নিষ্ফলা হয়ে উঠবে। তারপর নিরামিষ জাতীয় আহার হয়তো আর জুটবে না। নিরামিষের অভাবে বাধ্য হয়ে তখন নিরামিষাশীদের আমিষের দিকে ঝুঁকতে হবে। ডাঙ্গার যে-সব প্রাণী মানুষের খাদ্য, পৃথিবীসুদ্ধ সব মানুষের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে তারাও হয়তো একদিন নিশ্চিহ্ন হবে। তখন সমুদ্রই হবে মানুষের খাদ্যের উৎস। সমুদ্রের মাছ, ঝিনুক, শামুক, গুগলি—এই সব খেয়েই মানুষকে বাঁচতে হবে।

ধ্রুব রাও বলে চলে, জানোই তো আমরা নিরামিষাশী—আমিষ সম্পর্কে আমাদের ঘোরতর বিতৃষ্ণা। আমি নিজে যদিও আমিষ সম্পর্কে তেমন স্পর্শ-কাতর নই, কিন্তু আমার স্ত্রীর আমিষের নাম শুনলেই গা গুলিয়ে ওঠে। কাজেই আমার কথা শোনামাত্র তিনি আঁৎকে উঠলেন ও তাঁর মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল। তিনি আমাকে বললেন যে, সত্যিই যদি এমনি অবস্থা আসে এ পৃথিবীতে, তিনি সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবেন। আমি তখন রীতিমত ভয় খেয়ে গিয়ে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, এমনি অবস্থা আসতে হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যাবে, আমাদের জীবদ্দশাতে এমন হাল হবে না। কিন্তু আমার কথায় তিনি আদৌ আশ্বস্ত হলেন না। তিনি বললেন যে, লক্ষ বছর পরে হোক, কোটি বছর পরে হোক, তখনকার মানুষদের মধ্যে আমাদের বংশধররাও তো থাকবে। তাদের সমুদ্রের মাছ, শামুক-গুগলি খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আমাদের নির্বংশ হওয়াই ভাল।

তোমার স্ত্রী সত্যিই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন নি তো ?—ভয়ে ভয়ে আমি প্রশ্ন করি।

ধ্রুব রাও বললে, পড়তেন হয়তো—পড়লে আমি পারতুম না ঠেকাতে,

কিন্তু সে-যাত্রায় আমার ডুবুরীদের সাহায্যে এই সম্ভাব্য অঘটন থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছিলুম।

—তোমার ডুবুরীদের সাহায্যে মানে। তোমার স্ত্রী সত্যিই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন নাকি?

—না, না, তা নয়। আমার ডুবুরীরা সমুদ্রের জলের তলা থেকে আমার কাজের জন্য পাথরের নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে শ্যাওলা তুলে এনেছিল। একদিন হঠাৎ শ্যাওলাগুলি আমার স্ত্রীর নজরে এল। তিনি তাদের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে প্রশ্ন করলেন, ওগুলোও তো সমুদ্রের তলাতেই হয়—সমুদ্রের মাছ, ঝিনুক, শামুক-গুগলি না খেয়ে ওগুলো খাওয়া যায় না? শ্যাওলাগুলো দেখা মাত্র উৎফুল্ল হয়ে মনে মনে আমি 'ইউরেকা' ব'লে উঠলুম। জবাবে স্ত্রীকে বললুম যে, নিশ্চয়ই খাওয়া যাবে—যদি সত্যিই কখনো একমাত্র সমুদ্র থেকেই আমাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, আমরা নিরামিষাশীরা সমুদ্রের এই শ্যাওলা খেয়ে বাঁচব, এই শ্যাওলা দিয়ে অনায়াসে শাক-তরকারী তৈরী করা যাবে। আমার কথায় এবারে আশ্বস্ত না হয়ে পারেন না আমার স্ত্রী। কারণ শ্যাওলাগুলি যে সমুদ্রের তলা থেকে তোলা হয়েছে, তা' আমার স্ত্রী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন ও আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

গুহায় নিহিত

বোম্বাই আরব সাগরের মধ্যে একটি দ্বীপ। তার তিনদিকে সমুদ্র ও একদিকে খাড়ি। খাড়ি মাটি দিয়ে ভরাট ক'রে দ্বীপের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই কৃত্রিম সংযোজন দ্বীপকে ক'রে তুলেছে উপদ্বীপ। রেলপথ ও জাতীয় সড়ক এই যোগসূত্র ধ'রে বোম্বাইয়ের ভেতরে প্রবেশ করেছে। দ্বীপের পশ্চিমদিকে আরব সাগরের বিস্তার, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে দ্বীপ ও মূল ভূখণ্ডের মাঝখানে অপ্রশস্ত বোম্বাই উপসাগর। বোম্বাই উপসাগরের জল গভীর, স্থলের বেষ্টনে সুরক্ষিত ব'লে শান্ত; কাজেই বোম্বাইয়ের বন্দরটিকে উপসাগরের দিকে গ'ড়ে তোলা হয়েছে।

বোম্বাইয়ের দক্ষিণে প্রায় ছয় মাইল দূরে বোম্বাই উপসাগরের মাঝখানে ছোট একটি পাহাড়ী দ্বীপ—নাম তার এলিফাণ্টা। ব্যাসণ্ট-এর দুটি লম্বা মতো পাহাড় নিয়ে দ্বীপটি গ'ড়ে উঠেছে। পাহাড় দুটির মাঝখানে অপ্রশস্ত উপত্যকা। সমুদ্র ফুঁড়ে উঠেছে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত কালো ব্যাসণ্ট পাথর—ধাপে ধাপে হয়েছে ঊর্ধ্বমুখী। ওপরের দিকে পাথরের খাঁজে খাঁজে রয়েছে কয়েকটি গুহা। তাদের একটিতে উৎকীর্ণ রয়েছে বিচিত্র সব ভাস্কর্য।

সমুদ্রের ধারে দ্বীপের কালো পাথরের স্তূপে বড় একটি হাতির মূর্তি খোদাই করা ছিল। মূর্তিটি এখন বোম্বাই শহরের ভিক্টোরিয়া সংরক্ষিত উদ্যানে রয়েছে। হাতির মূর্তিটির জন্য দ্বীপের নামকরণ হয়েছিল 'এলিফাণ্টা'।

এলিফাণ্টা দেখব ব'লে একদিন ভোরে বোম্বাইয়ের সমুদ্রের ধারে গেট্‌ওয়ে অব ইণ্ডিয়াতে গিয়ে হাজির হলাম স্ত্রীকে নিয়ে। সরকারী টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টের ব্যবস্থামতো রোজ সকালে এখান থেকে একটি মোটর লঞ্চ টুরিস্টদের নিয়ে এলিফাণ্টায় যায়। টুরিস্টদের সঙ্গে যান একজন সরকারী প্রদর্শক। যাত্রীদের নির্ভুল দর্শনে যাতে ত্রুটি না ঘটে, তার জন্য প্রদর্শকের চোখ দিয়ে দর্শনের ব্যবস্থা। নিয়ন্ত্রিত দেখাশুনায় অন্ততঃপক্ষে এই সান্ত্বনা থাকে যে দর্শনীয় কোন কিছুই বাদ পড়ে যায়নি।

মোটর লঞ্চে উঠে দেখি যে আমরা দু'জন ছাড়া ভারতীয় বলতে রয়েছেন একজন পার্শী তরুণী। বাদবাকি সকলে বিদেশী। তাঁদের কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল যে, সকলেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছেন।

দলের মধ্যে দুটি তরুণ-তরুণী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তরুণীটি তার বাবার সঙ্গে এসেছে। তাদের কথোপকথনে প্রকাশ পেল যে, তরুণীটি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্রী—ভারতের ইতিহাস নিয়ে সে গবেষণা করছে। তরুণটি একজন শিল্পী। প্রাচ্য শিল্পকলায় তার বিশেষ ঝোঁক। দু'জনে সদ্য দেখে-আসা অজন্তা-ইলোরা সম্বন্ধে আলাপ করছিল। তরুণীটি বলছিল, সত্যি মেলভিল, আশ্চর্য সব গুহার ভাস্কর্য!

যুবকটি বললে, গুহায় নিহিত রয়েছে আশ্চর্য এক সভ্যতা। পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি দেখিনি জুলি।

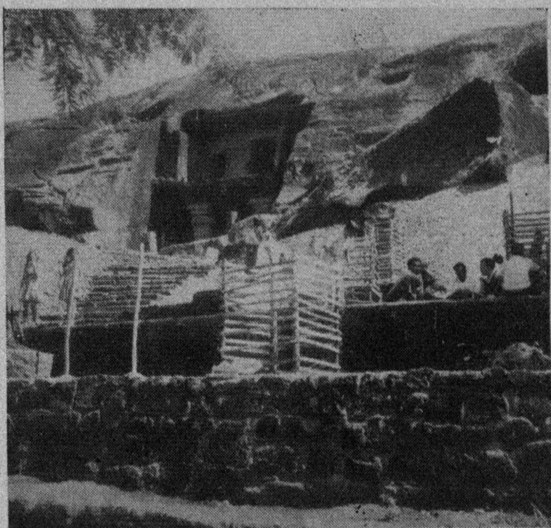
পৃথিবীর সব সভ্যতার আদি পর্বই তো গুহায় নিহিত। আদিম মানুষ তো গুহার মানুষ। গুহাই মানুষের প্রথম আশ্রয়। —জুলি বললে।

গাইড হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন। মানুষের সভ্যতার প্রথম প্রহর গুহায় লালিত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে গুহার আশ্রয় ছেড়ে চলে এলেও গুহাকে মানুষ ভোলেনি। তাই গুহার গহ্বরে পাথরের বুকে উৎকীর্ণ করেছে সে অপরূপ সব শিল্পকলা। গুহার আঁধারে আঁধারে পাথরের পটে ফুটিয়ে তুলেছে আশ্চর্য ভাস্কর্য। অশোকের আমল, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত বারশ' বছরের প্রায় বারশ' গুহা-ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখতে পাই আমরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাদের বেশির ভাগ অবশ্য রয়েছে পশ্চিম ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতের ব্যাসল্ট পাথরের খাঁজে খাঁজে।

গুহার ভাস্কর্যকে বোঝার আগে গুহাকে বোঝা চাই। —গাইড বলে চলেন।—এই সব ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পাথরকে শুধু পট হিসেবে ব্যবহার করা হলেও শিল্পতত্ত্বের আগে প্রস্তরতত্ত্ব বোঝা দরকার।

গাইড-এর কথাগুলিতে কেউ পুরোপুরি মন না দিলেও তার বাক্যপ্রবাহ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যায় বাঁধা খাত দিয়ে। এমনি রোজই যায়।

তাঁর ভাষণ যেন মোটর লঞ্চের এগিয়ে চলার সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধা—বিশেষ মনোনিবেশের দাবি করে না। মন দেবার অবকাশও ছিল না কারুর। মোটর লঞ্চটি গেট্‌ওয়ে অব ইণ্ডিয়ার ঘাট ছাড়তেই অনেকে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন ছবি তুলতে। বোম্বাই বন্দর ও দূরে অপসৃয়মাণ অট্টালিকার সারি তাঁদের ক্যামেরায় চিত্ররেখার ডোরে বেঁধে ফেলছিলেন তাঁরা চটপট। কেউ কেউ পড়ছিলেন খবরের কাগজ। জুলি ও মেলভিল মশগুল ছিল গল্পগুজবে। পার্শী তরুণীটি পেরি



কান্‌হেরি গুহা, বোম্বাই (গুহায় নিহিত)

ম্যাসনের একটি বই পড়ার ছল ক'রে জুলি ও মেলভিলকে লক্ষ্য করছিল কালো চশমার আড়াল থেকে।

গাইড তখন গুহাতত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রে যাচ্ছেন। তিনি বোঝাচ্ছিলেন যে, আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভা জমাট বেঁধে ব্যাসল্ট-এর সৃষ্টি। লাভা হ'ল ভূগর্ভ থেকে নির্গত আগুন-গলা পদার্থ। ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধার সময়ে তার বাইরে শক্ত আবরণ পড়ে। তখন বাইরের জড়তার সঙ্গে বিরোধ বাধে ভেতরকার তরলতার। তরল পদার্থের মধ্যে মিশে থাকে বায়বীয় উপাদান। বাইরের জড়তার চাপে তা' বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে। বায়বীয় উপাদানের বেগের আবেগ তরল পদার্থগুলিকে চঞ্চল ক'রে তোলে। ফলে তারা বেরিয়ে আসে জমাট-বাঁধা জড়তার মাঝখানে শূন্যতার সঞ্চার ক'রে। এলিফাণ্টার গুহাগুলির উৎপত্তি এমনি ক'রেই হয়েছিল। কবে হয়েছিল তার হিসেব চিহ্নিত আছে ব্যাসল্ট-এর স্তরে স্তরে। ভূ-বৈজ্ঞানিকরা তার পাঠোদ্ধার ক'রে বলেন যে, প্রায় দশ থেকে সাত কোটি বছর আগে।

ব্যাসল্ট-এর স্তরগুলির সহজ প্রবণতা আছে গুহার গহ্বর সৃষ্টির। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে-সব পাথর গ'লে যায়, তাদের জমাট-বাঁধা জড়তা সহজেই বিশ্লিষ্ট হয়। যেমন চুনাপাথর। জল ঈষৎ অম্ল হলেই জলের ক্রিয়ায় চূণাপাথর গলতে শুরু করে। চূণাপাথরের অবক্ষয় সংশ্লিষ্ট শিলাস্তরগুলির মাঝখানে শূন্যতার সঞ্চার করে।

নদীর স্রোতের বেগে খুব শক্ত পাথরও বিশ্লিষ্ট হয়। নদীর গতিপথে তাই গুহা দেখা যায়। সমুদ্রের তীর যদি পাথুরে হয়, সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাত তাকে বিদীর্ণ করে। তার ফলেও গুহার সৃষ্টি হয়। এলিফাণ্টার গুহাগুলিতেও সমুদ্রের আঘাতের চিহ্ন আছে। ব্যাসল্ট তরল অবস্থা থেকে পাথরে জমাট বাঁধার সময় তার মধ্যে যে শূন্যতার সঞ্চার হয়েছিল, সমুদ্রের ঢেউ তাকে প্রসারিত করেছে।

এলিফাণ্টার গুহাকে অবশ্য প্রশস্ততর করা হয়েছে শিল্পসৃষ্টির তাগিদে। মূল গুহা মানুষের রচিত সুড়ঙ্গের সঙ্গে একাকার হয়েছে।

গুহার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে গাইড-এর ভাষণ শেষ হতেই মোটর লঞ্চ এলিফাণ্টায় পৌঁছাল। এলিফাণ্টার উল্‌টো দিকে ট্রম্বে দ্বীপ। সেখানে রয়েছে খনিজ তেলের শোধনাগার ও 'অপ্সরা' নামের পারমাণবিক চুল্লী।

এলিফাণ্টার ঘাটে নেমে প্রায় দুশ' ফুট উঠতে হ'ল ব্যাসল্ট-এর পাহাড় বেয়ে।

পাথর কেটে সিঁড়ি করা হয়েছে। সিঁড়িগুলি বেয়ে উঠে এক সারি গুহার মুখোমুখি হলাম আমরা।

মূল গুহাটির নাম 'গণেশ গুফা'। রকমারি ভাস্কর্যমণ্ডিত গুহার আধারে মহেশের মন্দির ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের হিন্দুদের কীর্তি। প্রবেশ-পথের দু'ধারে রয়েছে পাথরে উৎকীর্ণ হাতির মূর্তি। ঢুকতেই প্রশস্ত অলিন্দ। তার দেয়ালে উৎকীর্ণ দ্বারপাল। ভেতরের দিকে মূল গুহাটি একশ' ত্রিশ ফুট লম্বা ও একশ' ফুট চওড়া। মাঝখানে খোদাই করা রয়েছে বিশাল ত্রি-মূর্তি ও মহেশ-মূর্তি। সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ—তিনের সমন্বয় ত্রিমূর্তির তিন মুখে। ত্রিমূর্তিকে ঘিরে খোদাই করা হয়েছে অর্ধনারীশ্বর, শিব-পার্বতীর বিবাহ, শিব-পার্বতীর যুগল-মূর্তি ও গণেশ। কালো ব্যাসল্ট-এর জড় স্তূপকে যেন জীবন্ত ক'রে তুলেছে ভাস্করদের ছেনি।

অষ্টম শতকের গুহা-মন্দিরটি ইতিহাসের কোন এক বিলুপ্ত অধ্যায়ের মধ্যে মুখ গুঁজেছে। কিন্তু কালোত্তীর্ণ হয়ে আছে অজ্ঞাত ভাস্করদের শিল্পকর্ম—প্রস্তরপট তাকে ধ'রে রেখেছে।

গুহার মধ্যে আলোর অভাব। কিন্তু পাথরে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যগুলো এত স্পষ্ট যে, অপ্রচুর আলোতেও তাদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। ভাস্কর্যগুলোর নিহিতার্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আমাদের গাইড। তাঁর দেখিয়ে দেওয়াকে অনুসরণ ক'রে দেখবার চেষ্টা করছিলেন অনেকেই। জুলি তার নোটবই বের ক'রে নোট নিচ্ছিল রীতিমত। কিন্তু মেলভিলের বোধ হয় ভালো লাগছিল না গাইড-এর বাক্-বিস্তার। গাইড-এর নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার না ক'রে স্বাধীনভাবে দেখছিল সে ঘুরে-ঘুরে। তার সঙ্গ নিয়েছিল পার্শী তরুণীটি। বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির দিকে মেলভিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল সে।

দেখা-শোনা শেষ ক'রে আমরা বেরিয়ে এলাম মূল গুহার বাইরে। গুহার পাশে আরও কয়েকটি গুহা আছে। কিন্তু গাইড বললেন যে, এই গুহাগুলির মধ্যে দর্শনযোগ্য কিছু নেই। গুহাগুলি বোধ হয় পূজারী ও মন্দির-রক্ষকদের বসবাস ও তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল—তাই আসে নি শিল্পকর্মের আওতায়।

বিশেষভাবে দেখার মতো আর কিছু অবশিষ্ট নেই জেনে সবাই যেন রুটিনের বাঁধন থেকে মুক্তি পেল। এর পর চলে ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়ানো, গুহার

সামনে চায়ের দোকানে চা-পান, কিউরিও-র দোকান থেকে চড়া দামে তুচ্ছ স্মারকচিহ্ন কেনা।

*   *   *

চায়ের বা কিউরিও-র দোকানের ভিড়ের মধ্যে ভিড়তে ইচ্ছে হ'ল না, কাজেই আমার স্ত্রী ও আমি গুহাগুলির সামনে ঘুরতে থাকি। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কানে এল, জুলির বাবা তাঁর কন্যাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলছেন, মেলভিল কোথায় গেল জুলি? ও কি চা খাবে না?

জুলি জবাব দিল, জানিনে তো বাবা। অনেকক্ষণ ধ'রেই তো দেখছি নে ওকে। এমন সময় একটি গুহা থেকে বেরিয়ে এল মেলভিল। তার সঙ্গে পার্শী মেয়েটি।

জুলির বাবা ব'লে উঠলেন, ঐ তো মেলভিল। কিন্তু ঐ গুহার মধ্যে কী দেখতে গিয়েছিল? ওখানে তো পাথর ছাড়া কিছু নেই। ওর যে প্রস্তরতত্ত্বে ঝোঁক আছে তা' তো জানতাম না।

জুলি কোন জবাব দিল না। তার মুখখানা পাথরের মতোই কঠিন হয়ে উঠল। তার মুখের ভাবে বোধ হচ্ছিল যেন ঐ দ্রষ্টব্যের আওতায়-না-আসা গুহার মধ্যে নিহিত কোনও রহস্যের মুখোমুখি হয়েছে সে।

বরফ

ছুটির দিন। গ্রীষ্মের দুপুর। নাগপুরের গ্রীষ্ম। খুবই দুঃসহ। অনেকের মতে দুঃসহতম। তাঁরা মনে করেন যে, এমন গ্রীষ্ম ভারতের আর কোথাও নেই। তাঁদের অতিশয়োক্তিকে সমর্থন না করলেও গরমে কাতর হচ্ছিলাম। বৈদ্যুতিক পাখা-সঞ্চালনেও এই গ্রীষ্মকাতরতার কোন উপশম নেই। হাওয়া চললেই মনে হয় যেন আগুনের কুণ্ডে আবর্তের সঞ্চার হয়েছে। আগুনের সঙ্গে সহাবস্থান তবু সম্ভব। কিন্তু বাতাসের প্রেরণায় উত্তেজিত আগুনের স্রোত যেন শত্রুপক্ষের সাঁড়াশি-অভিযান—আক্রান্তকে পিষে মারে অব্যর্থভাবে।

কালো মাটির সব রস ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা রূপালী স্রোত উঠছে বিবর্ণ আকাশের পানে। আকাশটা যেন আগুনে তেতে-ওঠা সীসার পাত। মাটির উদ্দেশ্যে মৃত্যুদণ্ড সোচ্চার হয়ে উঠেছে যেন সমস্ত আকাশ জুড়ে—রুষ্ট মহাদেবের তৃতীয় নয়ন আকাশময় যেন উন্মীলিত। মনে হচ্ছিল, যে-কোনও মুহূর্তে মাটি যেন আগুনে হবে রূপান্তরিত।

অগ্নি-অভিষেকে নিরুপায় আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছুই করার নেই। গ্রীষ্মের দাহকে প্রতিরোধ করি এমন শক্তি নেই। যান্ত্রিক কৌশলে আতপ-নিয়ন্ত্রণের বিলাস আমার সাধ্যের অতীত। অতএব নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়।

বিকেলে রোদ পড়তেই গেলাম রামদাসপেঠে বন্ধুর বাড়িতে তার ফ্রিজি-ডেয়ার-এর ঠাণ্ডা সরবৎ বা জমানো বরফ ও আইসক্রিমের সুশীতল আতিথ্যের প্রার্থী হয়ে। সারাদিনের দহনের জ্বালার কিঞ্চিৎ উপশমের আশা ছিল।

কিন্তু অতিথি-সৎকারের কোন উৎসাহ প্রকাশ পেল না বন্ধুর হাবভাবে। জমানো বরফ চাইতেই বন্ধুর মুখখানা যেন বরফে জমাট বাঁধল। এমন নির্বাক বরফ-শীতল অভ্যর্থনা আর কখনো পাই নি তার কাছ থেকে।

মনে মনে আহত বোধ করলাম। বন্ধুর ব্যবহারের শৈত্যে সুশীতল বোধ করি না আদৌ।

এমন সময় বন্ধুপত্নী এসে বললেন, ফ্রিজ-টা অচল হয়েছে। গরম বাড়তেই বিগড়েছে। দোকানে পাঠানো হয়েছে মেরামতের জন্য। কবে ফেরত পাওয়া যাবে কে জানে—বোধ হয় গরমটা কমে গেলে। আপনাকে বরং কুঁজোর জল দিয়ে ঘোলের সরবৎ ক'রে এনে দিই। তার সঙ্গে তরমুজ।

বন্ধু জমাট-বাঁধা গলায় বললে, দুধের সাধ ঘোলেই মেটাও হে। ফ্রিজিডেয়ার-টা

থেকেও নেই। দোকানে গিয়ে রোজ ওটার তত্ত্বতালাশ ক'রে মেজাজ শুধু গরমই হয়। বাইরে গরম, ভিতরে গরম, ঠাণ্ডা হওয়ার কোন উপায় নেই।

আমি বললাম, আছে হে, আছে। চল না, আখের রস খেয়ে আসি। 'পঞ্চশীল' সিনেমার সামনে 'রসকুঞ্জে' ঠাণ্ডা আখের রসের প্রচুর আয়োজন রয়েছে দেখলাম। আখের রসেই গরমে কাতর নাগপুরের লোকেদের প্রাণ ঠাণ্ডা হচ্ছে।

বন্ধু মুখ বেজার ক'রে বললে, তা' না হয় হচ্ছে—কিন্তু আমার হবে না। আমার ফ্রিজিডেয়ার মেরামত না হওয়া পর্যন্ত আমি ঠাণ্ডা হ'তে পারব না।

বন্ধুপত্নী বললেন, তা' কেন—তুমি তো ঠাণ্ডা হয়েই আছ। ফ্রিজ-টা অচল হতেই তো তুমি ফ্রোজন হয়ে গেছ।

বন্ধু ঈষৎ তপ্ত স্বরে বললে, দেখ, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না। আমার ফ্রিজিডেয়ার কেনার খবরটা গ্যাংটকের গ—সাহেবের কানে কী ক'রে জানি না, পৌঁছে গেছে। এখন তিনি এখানে আসছেন—আমার এখানেই উঠছেন। সার্কিট হাউস বা মাউন্ট বা তজ্জাতীয় হোটেলে না উঠে তিনি আমার এখানে উঠছেন—তা' থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আমার বাড়িতে ফ্রিজিডেয়ার আছে জেনেই তিনি এখানে ওঠা সাব্যস্ত করেছেন। এখন বলতে পার, আমার বাড়িতে এসে তিনি যদি দেখেন যে ফ্রিজ-টা অচল হয়ে দোকানে প'ড়ে আছে, আমার মান-ইজ্জৎ বজায় থাকে কী ক'রে? সকাল থেকে শুরু ক'রে রাতদুপুর পর্যন্ত বরফ না হ'লে ওঁর তো চলবে না।

বন্ধুপত্নী বললেন, বাজার থেকে বরফ কিনে আনলেই চলবে। বাজারের বরফও বরফ, তোমার ফ্রিজ-এর বরফও বরফ—কোন তফাত তো নেই। না হয় রোজ এক বস্তা ক'রে বরফ আনিয়ে রাখব।

বন্ধু বিরক্তিতিক্ত স্বরে বললে, যা বোঝ না, তা' নিয়ে কথা বলতে এস না। গ—সাহেবকে পুরোপুরি চেন নি তুমি। তিনি যদি এসে দেখেন যে, আমার ফ্রিজিডেয়ার-টা বাড়িতে নেই, মেরামতের জন্য যে ওটাকে দোকানে দিয়েছি, এ কথা বিশ্বাসই করবেন না তিনি। চতুর্দিকে ব'লে বেড়াবেন যে ফ্রিজিডেয়ার কিনেছি ব'লে আমি সকলের কাছে চাল মেরে বেড়াচ্ছি। তার ফলটা কী রকম ড্যামেজিং হবে ভেবে দেখ। অফিস থেকে লোন নিয়ে ওটা কিনেছি। যদিও ক্যাশমেমো ইত্যাদি পেশ করেছি, সকলেই জানে যে কিঞ্চিৎ দক্ষিণার বিনিময়ে ভুয়ো রসিদ যোগাড় করা এমন কিছু শক্ত নয়।

আমি বললাম, তুমি না হয় গ—সাহেবকে দোকানে নিয়ে গিয়ে তোমার

ফ্রিজিডেয়ার-টা দেখিয়ে দিও। চাক্ষুষ দেখে নিশ্চয়ই বিশ্বাস হবে তাঁর যে তুমি ফ্রিজিডেয়ার-টা কিনেছিলে। কিন্তু ভাই, তোমাদের গ—সাহেব এত বরফ দিয়ে কী করবেন?

বেজার মুখে বন্ধুপত্নী বললেন, কী আবার করবেন, তাঁর শেরী-শ্যাম্পেন ঠাণ্ডা করবেন। বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা না করলে ড্রিংকস ছুঁতে পারেন না তিনি। আর আশ্চর্য ব্যাপার কী জানেন, শীতকালে গ্যাংটকের প্রচণ্ড বরফ-ঠাণ্ডা শীতের মধ্যেও বরফ না হ'লে তাঁর চলত না।

আমি প্রশ্ন করলাম, ভদ্রলোক কোন্ দেশীয়?

—কোন্ দেশীয় আবার, খাঁটি এ দেশীয়।

অতএব আশ্চর্য হতেই হয়। কারণ বরফে আমাদের আসক্তি বিদেশ থেকে প্রাপ্ত। বরফ-সম্পর্কে এদেশের কোন ঐতিহ্য নেই। ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে বরফের স্থান নেই। বরফ হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় শোভা পেলেও হিমগিরি ছেড়ে নীচে নেমে আসে নি আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের মধ্যে। ইংরেজরা এ দেশে আসার পর বিলেত থেকে বরফের আমদানি হতে শুরু করে। দেশটা গ্রীষ্মপ্রধান হ'লেও বরফের প্রয়োজন বোধ করে নি কেউ এখানে। অথচ শীতের দেশ য়ুরোপে রোমানদের আমল থেকে বরফের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ঠাণ্ডায় ও-দেশের লোকেরা বোধ হয় পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয় না, এমনি ওদের রক্ত গরম। কাজেই বরফের দরকার হত ওদের। বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা-করা সরবৎ রোমান সম্রাটদের বিশেষ প্রিয় পানীয় ছিল। বরফ ব্যবহার করতে করতে বরফ দিয়ে দুধ-জমানোর কৌশল শিখে গেল রোমানরা।

বন্ধুপত্নী বললেন, কিন্তু আমি যে শুনেছি মার্কো পোলো সুদূর প্রাচ্যের কোনও দেশ থেকে আইসক্রীম বানানোর প্রণালীটা শিখে এসেছিলেন।

আমি বললাম, তা' হতে পারে। কিন্তু সে-দেশ আমাদের ভারতবর্ষ নয়।

—ইংরেজরা এ দেশে না এলে বরফ বা আইসক্রীমের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতুম, কী বলেন!

—বঞ্চিত হয়তো থাকতুম না। ইংরেজরা না এলেও বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতুম না নিশ্চয়ই। ক্রমে ক্রমে নিশ্চয়ই আর সব বস্তুর সঙ্গে বরফ ও আইসক্রীমও এসে পৌঁছাত আমাদের কাছে।

—বিদেশী বা বিজাতীয় হ'লেও বরফ বা আইসক্রীম সম্পর্কে আমাদের

আসক্তির কিন্তু কমতি নেই। এই দেখুন না, বরফের আশায় দারুণ গ্রীষ্ম মাথায় ক'রেও আপনি এতখানি পথ চলে এসেছেন।

বন্ধুপত্নীর কথায় তখনকার মত সায় দিলেও পরে ভেবে দেখেছি যে আসক্তিটা বাইরের জিনিস। কোন আসক্তিকে আমরা মনে মনে সমর্থন করতে পারি না। বরফ-সম্পর্কে আমাদের আসক্তিটা অনেকটা যেন গোঁড়া হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস সম্পর্কিত গোপন আকর্ষণের মতো।

আমাদের লৌকিক আচারে বা ক্রিয়াকলাপে বরফের ঠাঁই নেই। হিমালয়ের তুষার শুভ্রতাকে আমরা দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু তাকে আমাদের পানীয় শীতল করতে নামিয়ে আনতে আমাদের বাধে।

আমাদের কবিরা বরফের শুভ্র-সৌন্দর্যের স্তুতি করেছেন—হিমালয়ের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বরফের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বরফকে নিছক বরফ হিসেবে দেখতে তাঁদের রুচিতে বেধেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসে কদাচিৎ বরফের উল্লেখ করেছেন। তাঁর তাবৎ রচনা ঘেঁটে মাত্র গোটা কুড়ি জায়গায় বরফের উল্লেখ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা' উপমা হিসেবেই ব্যবহৃত। যেমন 'উৎসর্গে'—'নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জন'; 'শিশু-তীর্থে'—'তুষার শুভ্র নীরবতা'; 'জন্মদিনে'—'শুভ্র হিম রেখাঙ্কিত মহানিরুদ্দেশ': 'নটরাজে'—'শুভ্র শীত'; ইত্যাদি। হিমালয়ে বা য়ুরোপের দেশে দেশে বরফ দেখলেও বরফ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উদাসীন। 'জীবনস্মৃতি'-র 'হিমালয় যাত্রাতে' হিমালয়ের বর্ণনাতেও নেই বরফের স্থান।

বন্ধু বললে, আমাদের কালচার-এ বা লোকাচারে বরফ ছাড়পত্র না পাক, আপাতত বরফের অভাবে আমরা সকলেই কাতর। চল, 'রসকুঞ্জে'ই যাই। বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা-করা আখের রসে হয়তো কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়া যেতে পারে।

পথে বেরিয়ে বন্ধু বললে, সত্যিই অদ্ভুত লোক গ্যাংটকের গ—সাহেব। মদ খাবেন নির্জলা, অথচ বরফ মিশিয়ে ঠাণ্ডা করা চাই-ই। বলেন, ঠাণ্ডা না করলে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নেশাটা উপভোগ করা যায় না। সে-বার সিকিমে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে আমাদের ক্যাম্প-এ এসেই তিনি দাবি করলেন যে তাঁর বরফ চাই। আমরা সিকিমের ভূতত্ত্বের তত্ত্বতালাশ করছিলুম। গ—সাহেব গ্যাংটকের প্রভাবশালী ব্যক্তি। কর্মসূত্রে ওঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ। নানা ব্যাপারে ওঁর সাহায্য নিতে হয়েছিল। অতএব ওঁকেও যথাসম্ভব আদর-আপ্যায়নের বাধ্য বাধকতা ছিল। তাঁর বরফের দাবি না মেনে উপায় ছিল না, যদিও তখন পাহাড়ের

গায়ে ছাড়া অন্য কোথাও যে বরফ থাকতে পারে তা' প্রায় ভুলতে বসেছিলুম। বরফে ঢাকা পাহাড় সাদা রঙের জলুস ছড়িয়ে আমাদের মন থেকে পানের দোকানের পাটাতনের নীচে কাঠের গুঁড়োর পুরু আবরণে ঢাকা বরফের অস্তিত্বকে নিঃশেষে মুছে ফেলেছিল।

বন্ধুপত্নী বললেন, তখন যদি কেউ ফ্রিজিডেয়ার নামে যন্ত্রটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই ভাবতুম যে এ রকম অতি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের পিছনে অর্থব্যয় করাটা নিতান্তই অপব্যয়। সিকিম ও তিব্বতের সীমান্তের সাঙ্গু লেকের ধারে পাহাড়ের গায়ে বরফ দেখে এসেছি আমরা তখন। অনেক দূরে কুয়াশার ঢাকনা সরে যেতে দেখেছি বরফ-ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। দেখে অবাক হয়েছি। ভেবে পাই নি কেন এত বরফ—কিসের সার্থকতা আছে এই সমস্ত হিমালয়জোড়া বরফের রাজত্বের।

আমি বললাম, সার্থকতা আছে বই কি। হিমালয়ের বরফের রাজত্ব থেকেই অনেকগুলো বড় বড় নদীর উৎপত্তি। এই নদীগুলোই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

বন্ধুপত্নী বললেন, কিন্তু বরফের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব তো নেই তেমন। বরফ যেখানে মেজরিটি, মানুষ তো সেখানে মাইনরিটি।

আমি বললাম, বরফের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে নি ব'লেই মানুষ মানুষ হয়েছে। বরফের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে মানুষ হয়েছে সংগ্রামশীল, কর্মঠ। দেখুন না, কী অসাধারণ জীবনীশক্তি শীতপ্রধান দেশের লোকদের।

বরফ-সম্পর্কে বিতর্ক শেষ হবার আগেই আমরা আখের রসের দোকানে গিয়ে উপনীত হলাম। গ্রীষ্মকালে নাগপুরের পাড়ায় পাড়ায় হোগলার বেড়া দিয়ে ঘেরা অস্থায়ী দোকানে ঠাণ্ডা আখের রস পরিবেশনের আয়োজন করা হয়। ইক্ষুরসের সিঞ্চনে নাগপুরবাসীদের গ্রীষ্মের দাহের উপশম হয়। সন্ধ্যা হতেই এই সব দোকানে ভিড় লাগে। দেখে মনে হয় শহরসুদ্ধ সকলেই যেন আখের রসের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে। বর্ষার সূচনা পর্যন্ত চলে এই আখের রসের বেসাতি। বর্ষা শুরু হতেই দোকানগুলো হোগলার বেড়াসমেত হয় অন্তর্হিত।

আমরা যে-দোকানে গেলাম তার নাম 'রসকুঞ্জ'। হোগলার বেষ্টনীতে প্রবেশ করার পথের উপরে সবুজ সাইন বোর্ড-এর গায়ে সাদা হরফে নামটি লেখা। ভিতরে ঢুকে এক এক গ্লাস বরফ-দেওয়া আখের রস নিয়ে বসি আমরা একটি নীচু টেবিলকে ঘিরে।

ঈষৎ হলদে রঙের পানীয়। তা'তে অনেকখানি ক'রে বরফ ভাসে। বরফের টুকরোগুলো নড়েচড়ে তরল হয়ে মিশে যায় রসের মধ্যে। বরফের ঠাণ্ডা বিকীর্ণ হয় রসের মধ্যে। ঠাণ্ডা রস আমাদের গ্রীষ্মদগ্ধ দেহে ঠাণ্ডা আরামের সঞ্চার করে। সুশীতল মাধুর্য দেহের কোষে কোষে নিষিক্ত হয়। গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবানে মৃতপ্রায় সত্তা যেন অমৃতসিঞ্চনে পুনরুজ্জীবিত হয়।

আখের রস খেতে খেতে ভাসমান বরফের কুচিগুলোর দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাই। যান্ত্রিক কৌশলে জল বরফে জমাট বেঁধেছে। যন্ত্রের প্রভাবে হিমগিরির হিম নেমে এসেছে গ্রীষ্মদগ্ধ ধরণীকে শীতল করতে। কিন্তু আবহাওয়ার আনুকূল্যে এ বরফ যেখানে সহজেই জল থেকে জাত, সেখানে এর প্রয়োজন নেই। শীত যেখানে প্রবল, তাপমান যন্ত্রের পারদের রূপালী রেখা যেখানে শূন্যের নীচেও নিম্নগামী সেখানে জলের গতি বরফের পুঞ্জে স্তম্ভিত। সেখানে আকাশের মেঘ তুষার হয়ে নেমে এসে ধূসর ও সবুজ মাটিকে শুভ্রতায় পরিবৃত করে।

পৃথিবীর কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখা দুটির মাঝখানকার অঞ্চলে সূর্যের প্রভাব প্রবল। সূর্যের কিরণ এখানে সোজাসুজি নেমে এসে তাপ বিকিরণ করে। এখানে এমন শীত হয় না যে তুষারের শাসন চলতে পারে। এখানকার তুষারক্ষেত্র খুব উঁচু পর্বতশৃঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকে। পনরো থেকে কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে এখানে তুষার সঞ্চিত হয়। তুষারক্ষেত্রের সীমা-রেখাকে বলা হয় হিমরেখা। হিমালয়ে হিমরেখা প্রায় আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছে। আল্পসের হিমরেখা প্রায় তেরো থেকে ষোল হাজার ফুট উঁচুতে তুষারের সীমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে উত্তরে, মকরক্রান্তি রেখা থেকে দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর দিকে যত এগিয়ে যাওয়া যায়, হিমরেখা হিমগিরি ছেড়ে তত নীচে নামে। আলাস্কা ও চিলিতে হিমরেখার উচ্চতা পাঁচ থেকে ন' হাজার ফুট এবং গ্রীনল্যাণ্ডে দু' হাজার ফুট। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে হিমরেখা নেমে এসেছে সমুদ্রের সমতলে। এ দুটি অঞ্চলের সমুদ্রে বরফের পাহাড় ভাসে।

সমুদ্র থেকে আহরিত জলীয় বাষ্প রচনা করে মেঘের স্তর। পর্বতশীর্ষে তুষারসীমার ওপরে মেঘ নেমে আসে তুষার হয়ে। তুষার জমতে জমতে বিপুল স্তূপ রচনা করে। পর্বতগাত্রে উপত্যকার খাঁজে খাঁজে চলে এই সঞ্চয়ের পালা। গ্রীষ্মকালে এই বরফের রাজত্বে সূর্যের কিরণ কিছুটা প্রবেশাধিকার পায়। তখন খানিকটা বরফ গলে। কিন্তু সঞ্চয়ই বেশী। সঞ্চয় হতে হতে পর্বত প্রমাণ হয়ে ওঠে বরফের স্তূপ। পর্বতের কোলে আর এক পর্বতের সূচনা হয়। অবশেষে

ভারের বেগে বরফের স্তূপে গতির সঞ্চার হয়। এই চলমান বরফের স্তূপকে বলে 'হিমবাহ'। গোড়ার দিকে যৎসামান্য এর গতি—সারাদিনে কয়েক ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট মাত্র। নামতে নামতে মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে অবশ্য ক্রমশ গতি বৃদ্ধি পায়।

পর্বতের চূড়ায় জমা বরফের পুঞ্জ নিশ্চল হয়ে বসে থাকলে কী ভয়াবহ পরিণাম ঘটতে পারত, তা' ভাবতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা শিউরে ওঠেন। সেই অচল বরফের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকত সচল মেঘের প্রবাহ। সমুদ্রের জল থেকে আহরণ-করা জলীয় বাষ্প সমুদ্রে ফেরত না এসে বরফের চির কারাগারে ধরা থাকত। সৃষ্টি হত না বড় বড় নদীগুলির। সমুদ্রের জল ক্রমশঃ শুকিয়ে আসত। সারা পৃথিবী হত মরুভূমির কবলিত। কিন্তু বরফ থাকে না সঞ্চয়ের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে। পর্বতশৃঙ্গ ছেড়ে সুদূর সমুদ্রের আকর্ষণে নেমে আসে হিমবাহ। অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। কিন্তু তার দুর্জয় শক্তিতে বিশ্লিষ্ট হয় পাথরের পুরু আবরণ, সৃষ্টি হয় গভীর গিরিখাতের। পর্বতের আবরণ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে তার দু'পাশে জমে। এমনি ক'রে পর্বতগাত্রে গভীরভাবে চিহ্নিত হয় তার অবতরণ। অতীতের যে-সব হিমবাহ আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, পাহাড়ে ও পাথরে তাদের চিহ্ন চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

মাঝে মাঝে এক-একটি হিমবাহ চলতে চলতে অন্য একটি হিমবাহের সঙ্গে মিলিত হয়ে কলেবর বৃদ্ধি করে। তখন ব্যাপক হয় তার ক্রিয়াকলাপ।

তুষারের সীমারেখা অতিক্রম করতেই হিমবাহের বরফ গলতে শুরু করে। হিমবাহ গলে সৃষ্টি হয় নদীর। গঙ্গোত্রীর হিমাবাহ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি, যমুনোত্রী থেকে যমুনার।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু-অঞ্চলে তুষারের সীমা সমুদ্র-সমতলে নেমে এসেছে। সেখানে হিমবাহ সমতলভূমিতে প্রসারিত হয় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। গ্রীনল্যাণ্ডের প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে আছে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট পুরু বরফের স্তূপ। আণ্টার্কটিকা মহাদেশে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল হিমবাহে আচ্ছন্ন। বরফের স্তরগুলি এখানে প্রায় ন' হাজার ফুট পর্যন্ত পুরু।

মেরু-অঞ্চলের দেশগুলিতে হিমবাহ সমুদ্রের তীরকে গভীরভাবে চিরে ফেলে সমুদ্রে উপনীত হয়। সমুদ্রের তীর বিশ্লিষ্ট হয়ে যে গভীর খাত সৃষ্টি হয়, তাকে বলে ফিয়র্ড (Fjord)।

মেরু-অঞ্চলে হিমবাহ সমুদ্রে এসে এসে নীল জলে সাদা পাহাড়ের মতো

ভাসে। বরফের আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের চেয়ে কম ব'লে বরফ জলে ভাসে। অবশ্য হিমবাহের দশ ভাগের প্রায় নয় ভাগ সমুদ্রের জলের নিচে ডুবে থাকে। তার বিপুলতার অধিকাংশ থাকে জলের নিচে প্রচ্ছন্ন হয়ে। আয়তনের বিপুলতার দরুণ সেটা সমুদ্রের জলের মধ্যে মুখ গুঁজে ভারসাম্য বজায় রাখে।

পৃথিবীর প্রায় এক-দশমাংশ তুষারসীমার ওপরে হিমবাহ দিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বতের প্রায় পাঁচশ' মাইল জুড়ে আছে প্রায় কুড়িটি বড় বড় হিমবাহ। তাদের মধ্যে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ প্রভৃতিকে আমরা বিশেষভাবে চিনি।

তুষারের সীমারেখাকে ভৌগোলিকভাবে ভূপৃষ্ঠের ওপরে চিহ্নিত করা যায় না। প্রায়ই লঙ্ঘিত হয় এই সীমা। তুষারক্ষেত্র নেমে আসে হিমরেখা অতিক্রম ক'রে—অনধিকার প্রবেশ করে বরফের রাজত্বের বাইরের অঞ্চলে। প্রায় দশ লাখ বছর আগে এমনি অনধিকার প্রবেশের ফলে উত্তর আমেরিকা, য়ুরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশকে আচ্ছন্ন করেছিল উত্তর মেরু-অঞ্চলের তুষারক্ষেত্র।

তখন জীবজগতের বিবর্তনক্রমে পৃথিবীতে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে। তুষারমণ্ডিত পৃথিবীর হিমশীতল অভ্যর্থনায় মানুষ পেয়েছে জীবন-সংগ্রামের প্রথম প্রেরণা। জীবনটা যে সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়, মানুষ তার প্রথম দীক্ষা পেয়েছে বরফের প্রতিকূলতার কাছ থেকে।

সুদূর অতীতে কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বার বার এসেছে তুষারাচ্ছন্ন যুগ।

প্রাচীনকালের বরফ সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি পাথরে চিহ্নিত তুষারের স্বাক্ষর থেকে। অতি প্রাচীনকালের নিশ্চিহ্ন বরফ স্থায়ী চিহ্ন এঁকে রেখেছে পাথরের স্তরে স্তরে।

দশ লাখ বছর আগেকার বরফের যুগের পর পৃথিবী আর কোনও ব্যাপক তুষার আক্রমণের কবলিত হয় নি এখন পর্যন্ত। কিন্তু কখনো আর হবে না এমন কথাও বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন না।

আখের রসে ভাসমান বরফের দিকে তাকিয়ে বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখি। বরফের কুচিগুলোর মধ্যে বিপুল একটা হিমবাহের প্রবাহকে কল্পনা করার চেষ্টা করি।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরল বন্ধুপত্নীর কথায়। তিনি বলছিলেন, সাঙ্গু লেকের ধারে পাহাড়ের গায়ে বরফ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমরা সকলেই। কিন্তু গ—সাহেব

হন নি। তিনি বলছিলেন, ও-বরফ দিয়ে তো শ্যাম্পেন ঠাণ্ডা করা যায় না। গ—সাহেব আমাদের ক্যাম্প-এ এলে তাঁর জন্য কার্সিয়াঙ্ থেকে বরফ আনিয়ে দিতে হত। কাছাকাছি কোথাও তো বরফ পাবার জো ছিল না। সেবার প্রচণ্ড শীতের মধ্যে গ—সাহেব এসে যখনবরফের ফরমাশ দিলেন, তখন কার্সিয়াঙ্-এও বরফ পাওয়া গেল না। চাপরাসীকে দার্জিলিঙ্-এ পাঠিয়ে বরফ আনাতে হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বরফটা যথাস্থানে পৌছয় নি।

আমি বললাম, সে কী! অমন প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও বরফ গলে গেল!

—না, না, বরফ গলবে কেন! থার্মোমিটারের পারা তখন প্রায় ফ্রিজিং পয়েণ্ট-এর কাছাকাছি গিয়ে পৌছেছে। বরফ গলে তার সাধ্য কী! কিন্তু বরফ নিয়ে ক্যাম্প-এ এসে আমাদের চাপরাসী দেখল যে, ক্যাম্প-এর একজন ভুটিয়া কুলির প্রচণ্ড জ্বর।—প্রায় একশ' চার ডিগ্রী। দেখেই সে দার্জিলিঙ থেকে আনা বরফগুলি আইসব্যাগ-এ পুরে তার মাথায় দিল। গ—সাহেবের—শেরী-শ্যাম্পেন ঠাণ্ডা করার চেয়ে ভুটিয়া কুলিটির প্রয়োজনকে বেশী গুরুত্ব দিল সে। গ—সাহেব অবশ্য এতে খুশী হন নি আদৌ। আপন মনে গজর গজর করতে করতে বলেছিলেন যে, চাপরাসীটির দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা যদি তিনি হতেন, তদ্দণ্ডেই তার চাকরি খতম ক'রে দিতেন।

আমি বললাম, গ—সাহেবকে খুশি করার জন্য লোকটির চাকরি খতম ক'রে দেওয়া হয় নি নিশ্চয়ই।

বন্ধু হেসে বললেন, না তা' হয় নি। গ—সাহেবকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে চাপরাসীটি যা করছে, তাতে মামুলী হুকুম তামিল করার মধ্যে যে তার কর্তব্যবুদ্ধি সীমাবদ্ধ নয়, তা' প্রমাণিত হচ্ছে। সে যদি রুগ্ন ভুটিয়া কুলিটির প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে বরফটা আপনার কাছে পৌছে দিত, তা' হ'লে বুঝতাম যে লোকটা তার বৃহত্তর কর্তব্যকে উপেক্ষা করেছে—সে শুধু হুকুম তামিল করতেই জানে, জানে না নিজের কর্তব্যবুদ্ধিকে প্রসারিত করতে। আমার কথায় রীতিমত রেগে গিয়ে গ—সাহেব বলেছিলেন যে, আমাদের পয়সায় কেনা বরফ ভুটিয়া কুলির মাথায় চাপাবার কোন অধিকার নেই চাপরাসীটির। তা' ছাড়া যে লোক বড় সাহেবদের শেরী-শ্যাম্পেন ঠাণ্ডা করার জন্য কেনা বরফ সামান্য একজন ভুটিয়া কুলির জ্বর ঠাণ্ডা করার জন্য ব্যবহার করে, তার উপযুক্ত স্থান কোনও সেবা-প্রতিষ্ঠান, সেবাশ্রমে হতে পারে—কিন্তু সরকারী দপ্তরে নয়। এ ধরনের

লোকেরা যে-কোনও প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার শৃঙ্খল ভেঙ্গে চুরমার করতে পারে। এক কথায় এরা বিপজ্জনক। আমি অবশ্য গ—সাহেবের সঙ্গে একমত হ'তে পারি নি।

আমি বললাম, ফলে গ—সাহেব নিশ্চয়ই তদ্দণ্ডেই তোমার ক্যাম্প ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

বন্ধু বললেন, না তা যান নি। তবে তারপর যখনই এসেছেন আইস-বক্স-এ বরফ ভ'রে এনেছেন নিজের ব্যবহারের জন্য।

গল্প করতে করতে আখের রসের পাত্র নিঃশেষ হ'ল। বন্ধুপত্নী তখন বললেন, এবারে ঘরে ফেরা যাক।

বন্ধু বললেন, আখের রসে যে ঠাণ্ডাটুকু সংগ্রহ করলুম, ঘরে ফিরে তা' খোয়াতে আমি নারাজ। তার চেয়ে চল ধন্তোলি পার্কে বসে থাকা যাক।

তাই হ'ল। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা ধন্তোলি পার্কে বসে রইলাম। রাতের সঙ্গে প্রকৃতি আমাদের দেহমনে সঞ্চিত সারাদিনের অগ্নিদাহকে শুষে নিতে থাকে। আস্তে আস্তে আমরা ঠাণ্ডা হই।

দিন কয়েক বাদে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল সীতা বল্‌ডীর বাজারে।

আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, গ—সাহেব আসার আগেই তোমাদের ফ্রিজি-ডেয়ারটা মেরামত হয়েছিল তো?

বন্ধু বললেন, তা' হয়েছিল। কিন্তু তার দরকার ছিল না। কারণ গ—সাহেবের বরফের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। মদ খাওয়া ছেড়েছেন তিনি পুরোপুরি। মদ যখন স্পর্শ করেন না, তখন বরফ-সম্পর্কে তিনি স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছেন অতিমাত্রায়। বরফের মুখদর্শনও করেন না। জল বা নির্দোষ কোল্ড ড্রিঙ্ক-এও বরফ ছোঁয়ান না। বোধ হয় বরফ দেখলেই তাঁর প্রাক্তন নেশার কথা মনে প'ড়ে যায়।

—খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু কোন্ মন্ত্রবলে এমন অঘটন ঘটল?

—গ—সাহেব সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। বোধ হয় তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রীই এই অসাধ্য সাধন করেছেন। অসাধারণ ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্ব। যেমন ঠাণ্ডা, তেমন কঠিন। ভদ্রমহিলা যেন বরফে গড়া। আমার মনে হচ্ছিল, গ—সাহেবের শেরী-শ্যাম্পেন ঠাণ্ডা করত যে বরফ, তা' যেন তাঁর মদের গেলাস ছেড়ে এসে ভদ্রমহিলাকে ঘিরে ফেলেছে। গ—সাহেব অবশ্যই আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন এই বরফের আবরণকে গলিয়ে ফেলবার।

হিমগিরি ফেলে

হিমগিরি ফেলে নিচে-আসা শীতের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন,—

হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে কিসের জন্য।
কুন্দ মালতী করিছে মিনতি হও প্রসন্ন॥

হিমগিরি অতিক্রম ক'রে শীতের অবতরণ তীব্র না হ'লে প্রকৃতির প্রসন্নতাকেই বিকীর্ণ করে। অনতিতীব্র শীতকে কবোষ্ণ রোদে মিশিয়ে ভোগ করতে মানুষ ভালবাসে।

তেমনি হিমগিরির হিমের ক্ষেত্রে যে-বরফ জমে, হিমবাহরূপে তার ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসার মধ্যেও প্রকৃতির প্রসন্নতা প্রকাশ পায়। তুষারক্ষেত্রে বরফ গলে না, শুধু জমে। জমতে জমতে ক্রমশঃ তা পর্বতপ্রমাণ হয়ে ওঠে। আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণপ্রধান দেশগুলিতে পনরো থেকে বিশ হাজার ফুট উর্ধ্বে পার্বত্য উত্তুঙ্গতার তুঙ্গে তুষারক্ষেত্রের অবস্থান। শীতপ্রধান দেশগুলিতে তা' নিচের দিকে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে নেমে আসে সমুদ্রের সমতলে। তুষারক্ষেত্রে বরফ জমতে জমতে যখন বিপুল আকার নেয়, নিজের ভারে তা' নিচের দিকে নামতে শুরু করে। বরফের প্রবাহ হ'ল হিমবাহ। তাকে ইংরেজীতে বলে গ্লেসিয়ার। হিমবাহ খুব ধীরে ধীরে নামে—দিনে মাত্র কয়েক ইঞ্চি, কদাচিৎ কয়েক ফুট। তার বেশি কখনো নয়। ধীরে ধীরে নামতে নামতে ক্রমশঃ তা তুষারক্ষেত্রের সীমা বা হিমরেখা (snow line) অতিক্রম করে। হিমরেখা পেরিয়ে এলে পর বরফ তার জমার পালা শেষ ক'রে গলতে থাকে। বড় বড় নদীগুলির উৎপত্তি এইভাবেই ঘটেছে। এইসব নদীর ধারার সিঞ্চনে মাটি উর্বর হয়, পৃথিবী হয় শস্যশালিনী। হিমগিরি ফেলে নিচে আসার সংযত পদক্ষেপে হিমবাহের জমাট হিম জলের প্রবাহে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির প্রসন্নতাকে করে অপাবৃত।

কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা দেয় যখন হিমগিরি ফেলে নিচে নেমে আসাটা তার স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে তীব্র হয়ে ওঠে। শীত যদি হয় দুঃসহরকম তীব্র, মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে তা' প্রতিকূল হয়ে ওঠে। তেমনি হিমবাহ যদি স্বাভাবিক গতির সীমা পেরিয়ে ধসের মতো প্রবল বেগে নিচে নামতে থাকে, তার গতিপথে যা কিছু পড়ে, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে বরফে চাপা পড়ে। বিপুল আকারের বরফের ধসের বিধ্বংসী শক্তি প্রচণ্ড। একটি গোটা লোকালয়কে তা' নিঃশেষে

বিনাশ ক'রে ফেলতে পারে। বরফের ধসকে ইংরেজীতে বলে **Avalanche,** বাংলায় জলপ্রপাতের সঙ্গে তুলনা ক'রে হিমানী-সম্প্রপাতও বলা হয়। হিমানী-সম্প্রপাতের দুর্বার বেগ তার গতিপথে প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাসের সৃষ্টি করে। সেই ঝড়ের গতি এমন তীব্র হয় যে বড় বড় গাছপালাকেও সমূলে উপড়ে ফেলতে পারে।

পর্বতের যে-খাতের মধ্যে হিমবাহ থাকে, তার সঙ্গে হিমবাহের বরফের স্তূপের ভারসাম্যটি খুব সূক্ষ্ম। হিমবাহের মৃদু-মন্দ গজেন্দ্রগমন নির্ভর করে এই ভারসাম্য বজায় থাকার ওপর। ভারসাম্য ঘুচে গেলে হিমবাহ থেকে তুষার-ধস নামে।

সাধারণতঃ খাতের ঢাল বেড়ে গেলে ভারসাম্য ঘুচে যায়। তা' ছাড়া ফাটলে বিশ্লিষ্ট হয়েও হিমবাহের আসন টলে। প্রবল বৃষ্টিপাতেও তা টল-টলায়মান হতে পারে।

এইসব কারণ ছাড়া আরও কয়েকটি কারণ আছে। তাদের কথা আমাকে বলেছিলেন নানেকচাঁদ সেনানী। পেশায় তিনি রাসায়নিক হলেও পর্বতারোহণ তাঁর নেশা। হিমালয়ের বরফের রাজত্বে অনেক হিমবাহ তিনি দেখেছেন।

নানেকচাঁদ বলছিলেন, হিমবাহ অনেকটা যেন রাসায়নিক তুলাদণ্ডের মত। রাসায়নিক তুলাদণ্ড যেমন একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেললেই টলে পড়ে, তেমনি সামান্যতম প্ররোচনাতেই হিমবাহেরও পদস্খলন ঘটে। সুইস পর্বতারোহীরা বলেন যে, বাজ পড়ার আওয়াজের ধাক্কায় অনেক হিমবাহের গতি বেড়ে যায় এবং হিমবাহের মধ্যে ভাঙ্গন ধ'রে বরফের ধস নামে। আল্পস্ পর্বতের তুষার-অঞ্চলে কোথাও কোথাও নাকি একটু চেঁচিয়ে কথা বললে বা কাঁদলেই হিমবাহ ভেঙ্গে বরফের ধস নামে।

নানেকচাঁদের মুখের পানে সন্দিগ্ধ বৃষ্টিপাত করে আমি বললাম। তা'ও আবার হয় নাকি। চেঁচিয়ে কথা বললে হিমবাহ ভেঙ্গে ধস নামে—গলার স্বরের যে এমন প্রবল শক্তি তাতো জানতাম না।

নানেকচাঁদ গম্ভীর মুখে বললেন, জানতে না—এখন জেনে রাখ। বরফ-ঢাকা পার্বত্য অঞ্চলে নিঃশব্দে হাঁটার নিয়ম। কথা বলতে হ'লে গলার স্বর যথাসম্ভব নামিয়ে বলতে হয়।

আমি বললাম, মানুষ তার ইচ্ছেমত চুপ ক'রে থাকতে পারলেও মানুষের মর্জি মতো প্রকৃতি কী চুপ করে থাকবে। মানে, বরফের ওপরে নিঃশব্দে পা ফেলে আমরা না হয় হাঁটতে পারি, কিন্তু আকাশ থেকে বাজ তো আর নিঃশব্দে পড়বে না।

নানেকচাঁদ বললেন, সেই তো হয়েছে মুশকিল। প্রকৃতি তো মানুষের অনুকূল নয়। প্রকৃতির স্বভাব বুঝে নিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা মানুষ যতই করুক না কেন, সে তার নিজের নিয়মে মানুষের নিয়ন্ত্রণের সব প্রয়াসকে ব্যর্থ ক'রে দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রতিহত করার ক্ষমতা মানুষ এখনো অর্জন করে নি। বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাক না কেন, তা ভূমিকম্প থামাতে পারে না, থামাতে পারে না ঝড়-তুফানকে। বরফের রাজত্বে হিমবাহকে নির্দিষ্ট গতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে মানুষের যতই সাধ থাকুক না কেন, সাধ্য নেই তার স্থিতির ভারসাম্যের মধ্যে বরফের স্তূপকে আটকে রাখার। যে-কোনও মুহূর্তে পর্বতের ঢাল বেয়ে নেমে এসে তা' প্রলয় হানতে পারে। উদাহরণ হিসেবে সুইজারল্যাণ্ড-এর সান ফি-তে তুষার-ধস নামার অঘটনের কথা ধরা যাক। গত ত্রিশে আগস্ট তারিখে সেখানকার বিদ্যুৎপ্রকল্পে বিরাট একটি তুষার-ধস্ পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে এসেছিল। সেখানে যারা কাজ করছিল, তাদের মধ্যে প্রায় একশ' জন বরফে চাপা পড়ে মারা যায়। জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনাটির মধ্যে এ-হেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল না। ফলে ও-অঞ্চলের বিদ্যুৎ দিয়ে আলোক-প্রাপ্ত হওয়া খানিকটা পিছিয়ে গেল।

আমি বললাম, তোমার সুইজারল্যাণ্ড-এর উদাহরণটি শুনে আমাদের দেশের বরফ-ঢাকা অঞ্চলগুলির জন্য আশঙ্কা হচ্ছে। হিমালয়ের বরফ থেকেও তো এ হেন দুর্যোগ নেমে আসতে পারে।

নানেকচাঁদ বললেন, পারে শুধু নয়, নামছে হামেশাই। তবে সাধারণতঃ যে-সব জায়গায় জমে, সে-সব জায়গায় মানুষ থাকে না। হিমালয়ের তুষারক্ষেত্রের সীমা পনরো হাজার ফুটেরও ওপর রয়েছে কিনা!

আমি বললাম, কিন্তু হিমালয়ের তুষারক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে আমাদের দেশের উত্তর সীমা। সীমান্তের রক্ষণা-বেক্ষণে যাঁরা নিযুক্ত, হিমালয়ের বরফ তাঁদের বিপর্যস্ত করতে পারে। শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য তাঁরা সর্বদা প্রস্তুত—কিন্তু বরফও যে মাঝে মাঝে হানাদারের কাজ করতে পারে, সে কথা কি ভেবেছেন তাঁরা?

নানেকচাঁদ বললেন, ভাবছেন বই কি। হিমালয়ের হিমবাহগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে যথাসম্ভব তাঁরা সতর্ক থাকেন। এ নিয়ে আমরা পর্বতারোহীরাও ভাবিত। বরফের রাজত্বে চলাফেরা করতে হ'লে হিমবাহ সম্বন্ধে

সাবধান হতেই হয়—নচেৎ অঘটন অনিবার্য হয়ে পড়ে। দার্জিলিঙ্-এর মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট-এ ট্রেনিং নিতে গিয়ে আমিও ভেবেছি এ নিয়ে।

তুমিও ভেবেছ!—ঈষৎ অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম আমি—কোন কিছু নিয়ে তুমি যে ভাব, তা তো জানতাম না।

গম্ভীর মুখে নানেকচাঁদ বললেন, শুধু ভাবা নয়, বরফের ধস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে চেয়েছিলাম। ধস কী করে নামে দেখলে ধসের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারব ভেবেছিলাম। সিকিমে প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত রোটাং হিমবাহে সচল বরফের স্তূপের ওপরে কী করে চলাফেরা করতে হয়, তার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল আমাদের। আমি ভেবেছিলাম বিস্ফোরক প্রয়োগ ক'রে হিমবাহ থেকে খানিকটা বরফ ভেঙ্গে ফেলে ধসের মত করে নামিয়ে দেব। আমার দু'চার জন বন্ধুবান্ধবদের কাছে, আমার ভাবনাটা ব্যক্ত করতেই তারা হেসে উঠল। ব্যাপারটা এতই হাস্যকর ব'লে তাদের মনে হয়েছিল যে দেখতে দেখতে আমার অন্তরঙ্গ মহল থেকে ছড়িয়ে পড়ল তা' সকলের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে যে-সব শেরপা ছিল, তারাও শুনল। শুনে তাদের সর্দার এল আমার কাছে।

আমি বললাম, ব্যাপারটা তা' হলে শেরপাদের সর্দারের কাছে হাস্যকর ঠেকেনি?

—না। রীতিমত গুরুতর ব'লে মনে হয়েছিল তার কাছে। সে আমাকে এসে বললে যে, বরফে ছাওয়া পর্বতশিখরগুলি সবই দেবতার স্থান। বিস্ফোরক প্রয়োগ ক'রে বরফের রাশিতে ফাটল ধরানো মানে দেবস্থানকে অপবিত্র ক'রে ফেলা। এ তারা হতে দেবে না।

—তা হলে আর তোমার এক্সপেরিমেণ্ট করা হয়নি?

মুখ ব্যাজার ক'রে নানেকচাঁদ বললে, না, হ'ল না। শেরপা-সর্দারকে আমি অনেক বুঝিয়েছিলাম যে বরফ ভেঙ্গে বরফের ধসের পতনপ্রণালীটি শুধু পরখ করতে চাই। কিন্তু সে আমার কোনও যুক্তি মানতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত রাগ ক'রে আমি তাকে বললাম, বরফের ধস নেমে এলে তোমাদের এক একটা গ্রাম মাটিতে মিশে যেতে পারে তা' জানো? সর্দার জবাব দিল, সে' তো দেবতার মার—তাতে মরা তো রীতিমত পুণ্যের ব্যাপার—সে সৌভাগ্য কি আর আমাদের মত পাপী-তাপীদের হবে। এরপর আমার মুখে আর কোন কথা জোগাল না। বলা বাহুল্য, বরফের ধস নিয়ে আর আমার এক্সপেরিমেণ্ট করা হ'ল না।

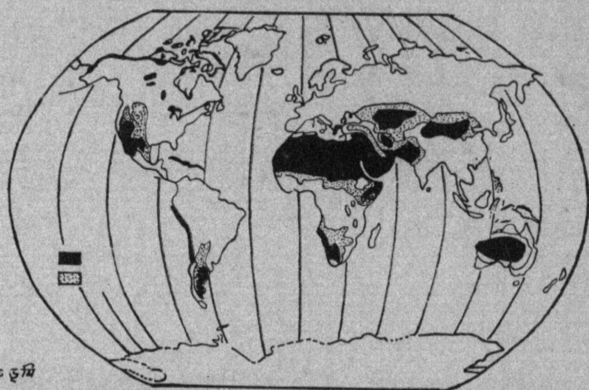
মরুপ্রাণ

প্রায় আঠারো বছর আগেকার কথা। আমরা তখন রাজস্থানের কিষেণগড়ে ভূতত্ত্বের পাঠ নিচ্ছি। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর একদিন আমরা সম্বর হ্রদ দেখব বলে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের বাহন ছিল একটি ট্রাক। সত্বর সম্বরে পৌঁছাবার জন্য খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে আমরা যাত্রা করলাম। কিন্তু আমাদের ত্বরা করার ঝোঁকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় গাড়ির যান্ত্রিক বৈকল্য। রূপনগরে এসে গাড়িটা নিশ্চল হয়ে পড়ে। গাড়ির যন্ত্রপাতি পরীক্ষা ক'রে ড্রাইভার বললে যে, মেরামত হতে অন্ততঃপক্ষে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে।

একটানা তিন ঘণ্টার জন্য রূপনগরে থাকতে হবে জেনে মেজাজ বিরূপ হ'ল আমাদের সকলেরই। নামে রূপনগর, কিন্তু এমন কুরূপনগর কদাচিৎ আমাদের নজরে এসেছে। চারপাশে শুধু বালি। স্থানীয় অসমতল ভূবিন্যাসকে তা' ঢাকা দিয়েছে। ঢাকা দিলেও অবশ্য চাপা দিতে পারেনি। জায়গায় জায়গায় বালি সরে গিয়ে ভেতরের পাথরের পাঁজা অনাবৃত হয়েছে। শক্ত পাথরের কঙ্কালের ওপরে শুকনো বালির শব-সাধনা চলছে যেন। এমনি নিষ্করুণ শুষ্কতার মধ্যে রসের স্থান নাই, রসে যার পুষ্টি তার নির্বাসন দণ্ড এখানে সোচ্চার। প্রকৃতির সবুজ সাজ এখানে বেখাপ্পা। কিন্তু তবু মরু-বিজয়ের কেতন উড়িয়েছে ছোট ছোট কাঁটাঝোপ ও ফণিমনসার ঝাড়।

রূপনগর ছোট একটি শহর। বিরস বিবর্ণ ভূপ্রকৃতির রিক্ততার মাঝখানে কী করে এই জনপদটি গড়ে উঠল, ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। রসশূন্য বেলেমাটিতে অল্পস্বল্প জোয়ার বা বজরা জাতীয় ফসল ছাড়া অন্য কোনও ফসল ফলে না। পানীয় জলও এখানে সহজ আয়ত্তের মধ্যে আছে বলে মনে হ'ল না। কিন্তু তথাপি এই শহরটি গড়ে উঠেছে। মানুষের প্রবল প্রাণশক্তির কাছে প্রকৃতি কীভাবে বশ মানল, তা' দেখার জন্য রূপনগরের রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরি করতে থাকি আমরা। ঘুরতে ঘুরতে এলাম শহরের বাইরের একটি বাগানবাড়িতে। বাগানে অজস্র গাছপালা ফুলফলের সমারোহ। চার পাশের রিক্ততার মাঝখানে এমন নিবিড় শ্যামল সরসতার অস্তিত্ব আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। রসহীন ঊষর মাটির মধ্যে মধ্যে এমন আশ্চর্য উর্বরতা কী ক'রে দেখা দিল ভেবে পেলাম না।

বাগানের সামনে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাড়ির ভেতর থেকে



(মরুগ্রাস)

একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। রোদ-পোড়া মুখে স্থানীয় দগ্ধ মরুর ছাপ. পরনে রাজস্থানী পোশাক, কিন্তু ভদ্রলোক কথা বললেন বাংলাতে। আমরা যে বাঙ্গালী তা' বোধ হয় দেখেই বুঝেছিলেন তিনি। আমাদের সকলকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বললেন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এস তোমরা। আমার বাগানটা দেখছ তো! সবাই দেখে, ও দেখে অবাক হয়। রাজস্থানের থর মরুভূমির মাঝখানে এমনি একটা বাগান সম্ভব হল কী ক'রে সকলেই প্রশ্ন করে।

আমি বললাম, বাগান শুধু নয়, যেন বাংলাদেশের এক টুকরো। মনে হচ্ছে ভগীরথের হিমালয় থেকে গঙ্গাকে নিয়ে আসার মত আপনিও যেন বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের এক টুকরোকে বয়ে নিয়ে এসেছেন। আপনাকে দেখে যদিও মনে হয় না, কথা শুনে আন্দাজ করছি যে আপনি বাংলাদেশ থেকেই এসেছেন।

—তা' এসেছি। কিন্তু এখন আমি এখানকারই লোক হয়ে গেছি। রূপনগরে চাকরি নিয়ে এসেছিলাম, এখন পুরোপুরি রূপনাগরিক হয়ে গেছি।

আমার সহপাঠী বন্ধু সুরজিৎ বললে, এই রূপনগরে আপনি চাকরি নিয়ে এসেছিলেন! এখানে আবার চাকরি হয় নাকি!

বৃদ্ধ বললেন, হবে না কেন। রীতিমত নেটিভ স্টেট ছিল রূপনগর। এই রূপনগরের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর কথা ইতিহাসে না হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসে নিশ্চয়ই পড়েছ তোমরা।

এটা সেই রূপনগর! —চোখ কপালে তুলে বলে সুরজিৎ।

বৃদ্ধ ঈষৎ হেসে বললেন, হ্যাঁ, সেই রূপনগর। একেবারে কুরূপনগর নয়, কী বল! কিন্তু আমাদের মহারাজা কুরূপনগরই ভাবতেন তাঁর রাজ্যটাকে। আমাকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন এখানকার রূপ ফেরাবার জন্য। তাঁর রাজ্যের ইরিগেশন এঞ্জিনীয়ার হিসেবে আমাকে নিযুক্ত করেছিলেন তিনি। মাটির নীচে লুকোনো জলের উৎস থেকে জল বের ক'রে নির্জলা রাজ্যটিকে সরস ক'রে তুলতে বলেছিলেন আমাকে। রাজস্থানের এই থর মরুভূমির কবল থেকে তাঁর রাজ্যটাকে আমি উদ্ধার করে আনব—এই ছিল তাঁর মনোগত অভিলাষ।

সুরজিৎ বললে, কিন্তু তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আপনার এই বাগানটিকে বাদ দিলে এখানকার সর্বত্র মরুভূমি ছাড়া অন্য কোনও ভূমিকে তো দেখতে পাচ্ছি নে।

বৃদ্ধ বললেন, মরুভূমি কাকে বলে তা' বোধ হয় ঠিক তোমাদের জানা নেই। ভেতরে এস তোমরা, তোমাদের মরুভূমির তত্ত্ব বুঝিয়ে দিই।

বৃদ্ধকে অনুসরণ করে আমরা তাঁর বাড়ির সামনে প্রশস্ত বারান্দায় এসে বসলাম। বৃদ্ধ বলতে শুরু করলেন—

পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ মরুভূমির আওতায় পড়ে। মরুভূমির কারণ হ'ল জলের অভাব। মরু-অঞ্চল প্রায় বৃষ্টিবিহীন। সেখানকার বাতাসে নেই জলীয় বাষ্প, আকাশ প্রায় সব সময়ই মেঘমুক্ত। রোদের তীব্র দাহে সেখানকার মাটি থেকে সব রস উবে যায়। মাটির নীচের জলের ধারাও সেখানে ক্ষীণ। বৃষ্টি থেকে পুষ্টি খুবই কম ব'লে তা' মাটির সমতল থেকে অনেক নীচে অর্থাৎ মানুষের সহজ নাগালের বাইরে নেমে যায়।

মরু-অঞ্চলের নির্জলা মাটি জুড়ে যেন প্রকৃতির শুষ্ক তাপের আসন পাতা। সূর্যের নিষ্করুণ দাহ তাকে দগ্ধ করে। মরু-অঞ্চলের দিনগুলি যেমন রৌদ্রদগ্ধ, রাতগুলি তেমনি হিমশীতল। দিনের রোদের দাহ রাত হতেই জুড়িয়ে যায়। দিনের অগ্নিস্নানের পর রাতের হিমে অবগাহন করে মরুভূমির মাটি। প্রচণ্ড গরমের সঙ্গে চরম ঠাণ্ডার কবলে পরে মাটি ফেটে ফুটিফাটা হয়। মরু-অঞ্চলের শুকানো নির্জলা বাতাসের আঘাতও মরুভূমির মাটিতে ক্ষয়ের সঞ্চার করে। বাতাসের ক্রিয়ায় ক্ষয়ে যাওয়া আলগা মাটি এলোমেলো হয়ে পড়ে, মাটির সূক্ষ্ম কণাগুলি অপসারিত হয়ে মরু-অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী নদী-উপত্যকাগুলিতে গিয়ে জমে। ফলে মরুভূমির রিক্ততার পাশাপাশি নদী-উপত্যকাগুলিতে উর্বরতার সহাবস্থান দেখা যায়। মরুভূমির মাটি থেকে তার সূক্ষ্ম উপাদানগুলি অপসারিত হ'লে মরুভূমিতে বালিরই প্রাধান্য ঘটে। বালিগুলি বাতাসের ক্রিয়ায় ইতস্ততঃ সরে গিয়ে এক এক জায়গায় জমতে জমতে বালিয়াড়ির সৃষ্টি করে। অনেক বালিয়াড়ি লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে অনড় হয়ে জমে থেকে বেলেপাথরে জমাট বেঁধেছে।

মরুভূমির বাতাসে জলীয় বাষ্পের অভাব; কাজেই মরুভূমির ভূমিতে রাসায়নিক অবক্ষয়ের মাত্রা খুবই কম। সাধারণতঃ বাতাস ও তাপ দু'য়ের প্রক্রিয়ায় মাটি ও পাথর শুধু ফেটে ফুটিফাটা হয়—ভূমির বাঁধন থেকে আলগা হয়ে পড়ে বাতাসে হয় স্থানান্তরিত। রাসায়নিক ক্ষয়ের ন্যূনতার দরুন মরু-অঞ্চলে অনেক প্রাচীন লুপ্ত সভ্যতার চিহ্নকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়।

পৃথিবীর বৃষ্টিবিহীন অঞ্চলগুলি মরুগ্রাসের কবলিত। বড় বড় উত্তুঙ্গ পর্বতমালা মেঘের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মেঘের উত্থান সমুদ্র থেকে

পর্বত-গাত্রে তার গতি ব্যাহত হয়ে বৃষ্টির ধারারূপে অনিবার্য পতন। পর্বত-মালার উত্তুঙ্গ বাধাকে অতিক্রম ক'রে তার ওপরে পৌঁছাবার জো-নেই তার। পর্বতমালার ওপারের বৃষ্টিবিহীন অঞ্চলগুলি তাই মরুগ্রাসের কবলিত হয়।

মেঘের গতিপথে পর্বতমালার বাধা না থাকলেও মহাদেশের সুদূর কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছাবার ক্ষমতা তার নেই। মেঘ তার জলীয় বাষ্পের ভার নিয়ে অনির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমে সক্ষম হয় না। কিছুদূর এগিয়ে যেতে তা বৃষ্টি হয়ে গলে পড়ে। মহাদেশের কেন্দ্র-অঞ্চলও তাই বৃষ্টির প্রসাদ-বর্জিত হয়ে মরুভূমির প্রকোপে পড়ে।

মরু-অঞ্চলে অল্পস্বল্প যেটুকু বৃষ্টি হয়, তার বার্ষিক পরিমাণ গড়পড়তা প্রায় দশ থেকে পনরো ইঞ্চি। তার কিছুটা বাতাসে উবে যায়, কিছুটা মাটির শোষণে ভূগর্ভের শিলাস্তরে জলের ধারা সৃষ্টি করে। বৃষ্টি-সরস অঞ্চলে মাটির নিচের জলের ধারা মৃত্তিকার স্তরের কাছাকাছি থাকে, কিন্তু মরুভূমিতে তা' ভূগর্ভের গভীরে উধাও হয়। তার নাগাল পাওয়া সহজ নয়। অবশ্য মরুভূমির নির্জলা বালির রাশির মধ্যেও জায়গায় জায়গায় ভূগর্ভ-নিহিত জলের ধারা ভূ-স্তরের চ্যুতি বা ফাটলের ফাঁক দিয়ে মাটির ওপরে উঠে আসে। এই সব জায়গা জলে সরস হয়ে মরূদ্যানের সৃষ্টি করে।

বৃদ্ধ ব'লে চলেন, মরুভূমিকে মরুগ্রাসের কবল থেকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় হ'ল তাকে জলের সেচনে সরস ক'রে তোলা। কিন্তু মরু-অঞ্চলে এত জল কোথা থেকে আসবে, সেই হ'ল সমস্যা। মরুভূমির ভূমির গর্ভে প্রচ্ছন্ন জলের ধারা এত নিচে রয়েছে যে তার নাগাল পেতে খুব গভীর নলকূপ খনন করতে হবে। কিন্তু নলকূপ জলের স্তরে গিয়ে পৌঁছলেও সেই জলকে বাইরে আনা মুশকিল। তার জন্য চাই খুব শক্তিশালী পাম্প। মাটির নিচে লুকোনো জলের ধারা থেকে মরুভূমির তৃষ্ণা আংশিকভাবে মিটতে পারে, কিন্তু তাকে পুরোপুরি তৃপ্ত ক'রে শ্যামল সরস করতে হ'লে বাইরের জলের উৎসের দিকে হাত বাড়াতে হবে। মরুভূমির বালির আবরণের মধ্যে জায়গায় জায়গায় গহ্বর দেখা যায়। এইসব গহ্বর বৃষ্টির জলে আংশিকভাবে ভ'রে উঠে ছোট ছোট হ্রদের সৃষ্টি করে। কিন্তু বর্ষা শেষ হ'লে পর হ্রদগুলি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। মরুভূমির রিক্ততার বুকে বর্ষাকালে যে-সব অস্থায়ী জলের ধারার স্বাক্ষর পড়ে, মরুভূমির শুকনো বালির শোষণে তারাও শুকিয়ে যায়। মরু-অঞ্চলের অধিকাংশ নদী মরুপথে তাদের ধারা হারিয়ে ফেলে। এই সব নদীর গতিপথে বাঁধ বেঁধে জলের ধারাকে ধ'রে রাখার চেষ্টা করলে হয়তো মরু-অঞ্চলে স্থায়ী জলের আধার সৃষ্টি করা যেতে

পারে। রাজস্থানের মরু-অঞ্চলের অনেক জায়গায় জলের প্রবাহকে বেঁধে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু আমাদের এই রূপনগর রাজ্যে এমন কোন নদী-নালা বা জলের ধারা নেই, বাঁধের শাসনে যাদের জলকে নির্দিষ্ট আধারের মধ্যে জমানো যেতে পারে। কাজেই ভূগর্ভের গর্ভে লুকানো জলের ভাণ্ডার থেকে জল আহরণ করার পরিকল্পনা করি আমি। রাজ্যের ইতস্ততঃ কয়েকটি গভীর নলকূপ খোঁড়ার প্রস্তাব পেশ করি। নলকূপ খোঁড়ার জন্য একটি ড্রিলিং মেশিন কেনারও প্রস্তাব করি। খুব ব্যয় সাপেক্ষ হ'লেও পরিকল্পনাটিকে মহারাজা সমর্থন করেছিলেন সর্বান্তঃকরণে। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, মরুভূমিতে জল সহজে বা সুলভে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তিনি সমর্থন করলেও প্রবল আপত্তি এল তাঁর মন্ত্রী ও ছেলের তরফ থেকে। তাঁরা মহারাজাকে বোঝালেন যে, আমার পরিকল্পনা রূপনগরকে ফতুর করবে। মরুনগর রূপনগরকে জলের অভাব চিরকালই রয়েছে। এখানকার জলের অভাবকে সকলে স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নিয়েছে, কাজেই জল সম্পর্কে তাদের মনে কোন অভাববোধ নেই। তাঁদের যুক্তি মহারাজাকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হ'ল ও তিনি আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নোটিশ পর্যন্ত দিলেন। এমন সময় তাঁর দিল্লী য়ুনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ে জেদ ধরলেন যে, আমার পরিকল্পনাকে মঞ্জুর করতেই হবে। রাজকোষে টাকা না থাকলে মহারাজার কাছ থেকে তার নিজের প্রাপ্য টাকা থেকে এই বাবদে টাকা দেওয়ার প্রস্তাবও করলেন তিনি। একমাত্র মেয়ে, তার ওপর শিক্ষিতা, কাজেই অগত্যা মেয়ের কথাকেই মেনে নেন মহারাজা ও আমার পরিকল্পনা মত আমি ড্রিলিং মেশিনের সাহায্যে নলকূপ খুঁড়তে শুরু করি।

সুরজিত প্রশ্ন করলে, মাটির কত নিচে জল পেয়েছিলেন?

বৃদ্ধ ম্লান হেসে বললেন, জল পাইনি। যত নিচে জল পাওয়া যেতে পারে, ড্রিলিং মেশিনটি দিয়ে ঠিক ততখানি গভীর নলকূপ খুঁড়তে পারিনি ব'লে হয়তো জলের নাগাল পাইনি। কিন্তু আমার পরিকল্পনাটি বাতিল হ'ল না। কারণ রাজকন্যার জেদ। তিনি বোধ হয় আমাকে ভগীরথ ঠাউরেছিলেন। তিনি বললেন যে, মাটির নিচে জল না পেলেও বড় বড় ট্যাঙ্ক তৈরী ক'রে বৃষ্টির জল ধ'রে রাখা যেতে পারে। তাঁর এই অসম্ভব প্রস্তাবটিকে কার্যকরী করার আগেই অবশ্য মহারাজা মারা গেলেন। মহারাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিকল্পনাটিকে বাতিল করে দেওয়া হল ও আমার চাকরি গেল।

তারপর ?—আমি প্রশ্ন করলাম।

বৃদ্ধ বললেন, তারপর আমার পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পারলাম না। এখানকার মরুভূমি আমার অজান্তে আমাকে গ্রাস করে ফেলেছিল—মরুভূমির মায়া কাটিয়ে এক চুলও পারলাম না নড়তে। স্থায়িভাবেই এখানে বসবাস করতে শুরু করে দিলাম।

সুরজিত বললে, আপনি বলছিলেন যে, আপনার খোঁড়া নলকূপগুলোর একটিতেও জল পাননি। কিন্তু আপনার বাড়িতে এমন চমৎকার বাগান হ'ল কী করে ? জল না থাকলে এমনটি তো সম্ভব নয়।

বৃদ্ধ বললেন, একমাত্র আমার বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যে জল পেয়েছিলাম। কিন্তু এখানে জল পাওয়ার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমার স্ত্রীর, আমার নয়। তিনি এখানে কূয়ো খুঁড়িয়ে জল পেয়েছিলেন। সেই জল দিয়েই মরুভূমির মধ্যে এক টুকরো মরূদ্যান রচনা করতে পেরেছি আমরা।

বৃদ্ধের কথা শেষ হতেই চায়ের পেয়ালা ও মিষ্টান্নের রেকাবি-বোঝাই ট্রে হাতে নিয়ে বাড়ির ভেতর মহল থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন একজন প্রৌঢ়া রাজস্থানী মহিলা। উত্তীর্ণ যৌবনা হ'লেও রূপে অপরূপা। মহিলাটির মুখের পানে তাকিয়ে বৃদ্ধ বললেন, এই যে আমার স্ত্রী। রাজকন্যা হ'লেও রাজরাণী হতে পারেন নি। যতদিন আমি রাজ্য সরকারে চাকরি করেছি, আমার চাকরিটির রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন—চাকরি যেতে সোজাসুজি এখন আমার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।

মহিলাটির মুখে আবীর রঙের ছোপ লাগে। মুখ নিচু করে তিনি বললেন, ছেলে-মানুষদের সামনে কী যে সব যা' তা' বলছ তার ঠিক নেই।

বৃদ্ধ বললেন, যা' তা' মানে। এতক্ষণ ওদের মরুভূমির কথা বোঝাচ্ছিলাম। মরুভূমির কথা বলতে গিয়েই তোমার কথা এসে গেল। শোন, তোমরা, এখানকার মরুভূমিকে মরুগ্রাসের কবল থেকে উদ্ধার করতে না পারলেও পুরোপুরি বঞ্চিত আমি হইনি। এখানকার সবাই একটানা শুকনো ও রিক্ত হ'লেও আমার নিজের জন্য এক টুকরো মরূদ্যানের সন্ধান আমি পেয়ে গিয়েছি।

চিহ্ন

সূত্র খুঁজছিলাম। বর্তমানের মধ্যে অতীতের সূত্র। বিহারের হাজারীবাগ জেলায় পত্রাতু নামে গাঁয়ে নদীর তীরে পাথরের স্তূপ। বেলেপাথরের ওপর কাদাপাথর, তার ওপর কয়লা। শুকনো পাথর। প্রাণ নেই, গতি নেই, পুঞ্জীভূত জড়তা শুধু। কিন্তু এই নিস্পন্দ জড়তা রক্ষণশীল—পাষাণ-বন্ধনের মধ্যে ধরে রাখে অতীতের স্বাক্ষর, সময় যাকে লোপ ক'রে ফেলতে পারে না।

বেলেপাথরের বালির কণাগুলি বহন করছে বেলেপাথরের সৃষ্টির ইতিহাস। বালি জমেছে স্তরে স্তরে, তারপর জড়ীভূত হয়ে বেলেপাথরে হয়েছে রূপান্তরিত। কী পরিবেশে বালি জমেছিল তার ইতিবৃত্ত পাথরে ধরা আছে। খুঁটিয়ে দেখলে তাকে দেখা যায়। পত্রাতুতে দামোদরের তীরে সাদাটে ধূসর রঙের বেলেপাথরের গায়ে দেখতে পেলাম জলের স্রোতের দাগ। নদীর স্রোত ভেজা বালিতে যে দাগ আঁকে, সেই দাগ পাথরে জমাট বেঁধেছে। সুদূর অতীতে নদীটি তার ধারা হারালেও তার গতির চিহ্নগুলি রয়ে গেছে নিশ্চল পাষাণস্তূপে।

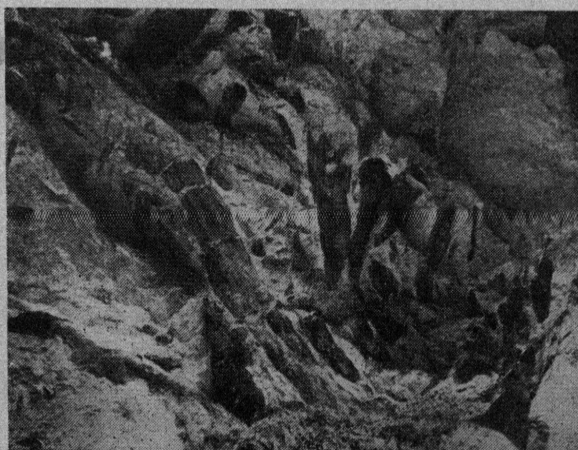
বেলেপাথরের ওপর কাদাপাথর। বালির সূক্ষ্মতম কণাগুলি সঞ্চিত হয়ে রচনা করে কাদার স্তর। তার জড়ীভূত রূপ দেখেছি আমরা কাদাপাথরের মধ্যে।

কাদাপাথরের ওপর কয়লার স্তর। জলে গাছপালায় অবশেষ জ'মে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত হয়। অক্সিজেন-এর সহযোগিতা থাকলে রাসায়নিক ক্রিয়া বিনাশকে করে ত্বরান্বিত। কিন্তু জলের মধ্যে অক্সিজেন তেমন সক্রিয় নয়। কাজেই জলে সঞ্চিত উদ্ভিদের রাসায়নিক পরিবর্তন অতি ধীরে, অতি সূক্ষ্মভাবে চলতে থাকে। গাছের পাতা, ডালপালা, মূল ও কাণ্ড সব একাকার হয়ে যায়। পাতা থেকে মুছে যায় তার সবুজ রঙ—মূল ও কাণ্ডের মূল উপাদানগুলির ভারসাম্য যায় হারিয়ে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি বায়বীয় উপাদানগুলি ক্রমশঃ উবে গিয়ে অঙ্গারকে দেয় মুক্তি। এমনি ক'রে সৃষ্টি হয় স্পঞ্জের মতো বাদামী রঙের 'পীট'-এর (peat) স্তর। কয়লা সৃষ্টির প্রথম ধাপ হ'ল 'পীট'। পীটের মধ্যে অঙ্গারের তেমন প্রাচুর্য নেই, আছে বায়বীয় ও জলীয় উপাদানের প্রাধান্য।

অঙ্গার স্থিতিশীল, বায়বীয় ও জলীয় উপাদান খোঁজে বস্তুর সীমা থেকে মুক্তি।



বেলেপাথরে প্রস্তরীভূত নদীর ঢেউয়ের চিহ্ন (চিহ্ন)
আলোকচিত্র—জয়ন্ত বসু



শিলাস্তরে কোটি কোটি বছর আগেকার গাছের
পাতার ছাপ (চিহ্ন)। আলোকচিত্র—সুনীল সেনশর্মা

পীট-এর মধ্যে অঙ্গারকে ঘিরে থাকা বায়বীয় উপাদানের আবরণ ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়। এই উন্মোচনকে প্রেরণা দেয় পীট-এর ওপর জমতে থাকা বালি বা কাদামাটির চাপ। চাপ থেকে তাপের সৃষ্টি হয়—ভূগর্ভের তাপের সঙ্গে তা' যুক্ত হয়ে বাষ্পীয় ও বায়বীয় উপাদানগুলিকে উবে যেতে সাহায্য করে।

এমনি ক'রে অঙ্গার ক্রমশঃ ব্যক্ত ও মুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে লিগ্‌নাইট জাতীয় কয়লা। লিগ্‌নাইট কয়লার অর্ধপরিণত রূপ। সাধারণ কয়লার তুলনায় এতে অঙ্গারের ভাগ কম। অঙ্গারে সমৃদ্ধ হয়ে লিগ্‌নাইট পরিণত হয় কয়লায়। সাধারণ কয়লাকে বলা হয় বিটুমিনাস কয়লা। কয়লার পূর্ণতম পরিণতি ঘটে 'অ্যান্‌থ্রাসাইট' (Anthracite) জাতীয় কয়লার মধ্যে।

গাছপালার শব নতুন জীবন পায় কয়লার স্তরের মধ্যে। কোটি কোটি বছর লেগে যায় বৃক্ষের এই শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশে যে কয়লা আছে, তার সৃষ্টি হতে ভূতাত্ত্বিক হিসেবে প্রায় কুড়ি পঁচিশ কোটি বছর লেগেছিল।

গাছ থেকে যে কয়লার সৃষ্টি, এক টুকরো কয়লা হাতে নিয়ে তা' বোঝার জো নেই। গাছের বৃক্ষত্ব বিলুপ্ত কয়লার কালিমায়। কিন্তু কয়লার স্তর বা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাদাপাথরের স্তরে মাঝে মাঝে গাছের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। অঙ্গারের মধ্যে গাছের সত্তা লোপ পেলেও তার বৃক্ষত্ব স্থায়ী চিহ্ন আঁকে কয়লা বা সংশ্লিষ্ট শিলাস্তরে। প্রায় বিশ পঁচিশ কোটি বছর আগে যে-সব গাছ কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে, তাদের পাতা বা ডালপালা, মূল বা কাণ্ডের ছাপ রয়ে গেছে পাথরের মধ্যে।

গাছপালাই শুধু নয়, প্রাচীনকালের বহু প্রাণীও তাদের অস্তিত্বকে চিহ্নিত ক'রে রেখেছে পাথরের স্তরে স্তরে। তাদের শরীরের বাইরের খোল বা ভেতরের হাড়গোড় মাটিতে চাপা পড়ে পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে, কিংবা মাটিতে চিহ্নিত তাদের ছাপ পাথরে জমাট বেঁধেছে।

অতীতকালের গাছপালা ও প্রাণীদের শরীরের অবশেষ যা' পাথরে উৎকীর্ণ, তাদের দেহের এবং গতিবিধির চিহ্নগুলিকে বলা হয় জীবাশ্ম (Fossil)। যে প্রাণসত্তা পৃথিবীর উদ্ভিদ্‌জগৎ বা প্রাণিজগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, পাথরের কঠিন আবরণে তার অস্তিত্বের চিহ্ন জড় পৃথিবীর সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে অবস্থান করছে। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শব পৃথিবীর জড় উপাদানগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য

খুঁজেছে। ফলে তা' পাথরের স্তরে স্তরে যে চিহ্ন এঁকেছে, তা' তার পরিমিত জীবিতকালের সীমাকে অতিক্রম করেছে।

পত্রাতু গ্রামে দামোদরের তীরে কয়লার ওপরে কাদাপাথরের স্তরে গাছের ছাপ দেখা যায়। কয়লার স্তর এই গাছের পরিণামকে বহন করছে। কয়লার মধ্যে গাছটি নিঃশেষে নিবেদিত, কিন্তু তার বৃক্ষসত্তা কাদাপাথরে চিহ্নিত। এই ছাপের মধ্যে গাছের এক কণাও নেই, কিন্তু আছে তার বিশেষ পরিচয়ের আত্মঘোষণা।

হাতুড়ি দিয়ে কাদাপাথরের স্তর বিশ্লিষ্ট ক'রে গাছের নানা অংশের ছাপ দেখতে পেলাম। এক জায়গায় গাছের গুঁড়ির খানিকটা অংশ চিহ্নিত হয়ে আছে। দেখে মনে হয় সদ্য যেন কাদামাটি দিয়ে ছাঁচ তোলা হয়েছে। প্রায় কুড়ি পঁচিশ কোটি বছর আগেকার কোনও এক গাছের চিহ্ন ব'লে বিশ্বাস করা সহজ নয়।

কাদাপাথরের আবরণে কুড়ি পঁচিশ কোটি বছর আগেকার একটা অরণ্যকে পুনরুদ্ধার করতে চাইলাম। নদীর তীরে পাথরে হাতুড়ির আঘাত হেনে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজি গাছের পাতা, গাছের গুঁড়ি, গাছের ডালপালার চিহ্ন। এখানে দামোদরের তীর বৃক্ষশূন্য। ঘাসের পাতলা আবরণ পুড়ে গিয়ে শুকনো বাদামী রঙের মাটিকে অনাবৃত ক'রে দিয়েছে। সবুজের ছোপমাত্রও নেই। অথচ পাথরের স্তরে স্তরে অতি প্রাচীনকালের সবুজের সমারোহ চিহ্নিত।

নদীর তীরে কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। গ্রীষ্মের দাহ মাথায় ক'রে বাইরে বেরোতে ভরসা পায়নি কেউ। শুধু আমি পাথর পরীক্ষার নেশায় রোদের তেজ উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

হঠাৎ দেখতে পেলাম যে আমি একা নই। অদূরে একটি পাথরের ঢিবির ওপর বসে আছেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছাতা মাথায় দিয়ে।

ওঁকে দেখে বিস্মিত হলাম।—আমার মত পাথর পরীক্ষার পাগলামিতে ঐ বৃদ্ধকেও পেয়ে বসল নাকি!

আমাকে দেখে বৃদ্ধের সাদা ভুরু দুটো কুঁচকে ওঠে। দু'চোখে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা। একটু ইতস্ততঃ ক'রে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, মশায়ের কোথা থেকে আসা হয়েছে?

আমি জবাব দিলাম, ভুরকুণ্ডার ক্যাম্প থেকে।

—ও, আপনি বুঝি জিয়োলজিস্ট। কিন্তু এখানে তো আপনাদের দল গত বছরই কাজ ক'রে গেছে। কাজ বুঝি শেষ হয়নি?

দলের কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু আমার কাজ বাকি আছে। এই পাথর থেকে গাছের ফসিল সংগ্রহ করছি।

—গাছের ফসিল!

—কোটি কোটি বছর আগেকার সব গাছের চিহ্ন। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, ফসিল। গাছগুলো নিশ্চিহ্ন হয়েছে, কিন্তু চিহ্ন রয়ে গেছে।

বৃদ্ধ ঈষৎ হেসে বললেন, খুব মজার ব্যাপার, তাই না? গাছ নেই, অথচ তার চিহ্ন রইল অমর হয়ে।

আমি বললাম, একে বিধাতার কৌতুকও বলতে পারেন।

—কী প্রয়োজন এমন নির্মম কৌতুকের বলতে পারেন! অস্তিত্বের স্থূল দিকটার জড় কিছু চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই যদি অবশিষ্ট না থাকে, জীবনের কী প্রয়োজন!

বৃদ্ধের প্রশ্ন ভূবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না—কাজই অগত্যা চুপ ক'রে থাকতে হয়।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে বৃদ্ধ বললেন, এই দেখুন না আমাকে। বয়স আশি হ'ল, আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, আপনার বলতেও কেউ নেই—একদা যাদের আপনার ব'লে জানতাম, তাদের দৈনন্দিনতার নগণ্য কিছু চিহ্ন সম্বল ক'রে শেষ মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করছি। বলতে পারেন কী অর্থ আমার এ জীবনের?

আমি বললাম, অর্থ নিশ্চয়ই আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই নিরর্থক নয়। ইভোলিউশন-এর দিক থেকে বিবেচনা করলে—

আমার কথায় কর্ণপাতমাত্র না করে বৃদ্ধ বললেন, সামনে ঐ পাথরটি দেখেছেন না—ঐ যে আর সব পাথরকে ছাপিয়ে উঁচু হয়ে আছে—ওতে ছুরি দিয়ে খোদাই করা কিছু ছেলেমানুষি রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে ওখানে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি বই কি। একটা বাঁদরের ছবি ব'লে মনে হচ্ছে। অবশ্য লেজ আঁকা না থাকলে মানুষ ব'লে চালিয়ে দেওয়া যেত।

বৃদ্ধ একটু হেসে বললেন, যে ওটা এঁকেছিল, সে আমাকে বলেছিল যে, আমার ছবি এঁকেছে।

আপনার ছবি!

হ্যাঁ। সে আমাকে ঐ ভাবেই দেখেছিল বোধ হয়। সে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগেকার কথা। কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে নিয়ে আমাদের বাড়ির একটা অংশে ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন। ভদ্রলোক বিপত্নীক। মেয়েটি

তাঁর একমাত্র সন্তান। প্রায় আমার বয়সী ছিল। সমবয়সী কোন মেয়ে না থাকায় মেয়েটির খেলার সাথী আমাকেই হতে হয়েছিল। ওর সঙ্গে রোজ এই নদীর ধারে বেড়াতে আসতাম। এখান থেকে আমাদের বাড়ি কাছেই। নদীর বালিতে খেলা করতে মেয়েটির ভাল লাগত। তা' ছাড়া ছিল ওর পাথর কুড়াবার শখ। রোজ একগাদা পাথর কুড়িয়ে জড়ো করত। সেগুলো বয়ে নিয়ে যেতে হত আমাকেই। একদিন ওর কী খেয়াল হ'ল, আমার পকেট থেকে আমার পেন্সিল কাটার ছুরিটা বের ক'রে নিয়ে ও ঐ পাথরে খোদাই ক'রে একটা ছবি আঁকল। বললে যে, আমার ছবি। ছবির নীচে লিখল ও তার নিজের নাম। ঐ যে, দেখুন এখনো রয়েছে। এতটুকু অস্পষ্ট হয়নি।

দেখলাম গোটা গোটা অক্ষরে স্পষ্ট ক'রে লেখা আছে, 'শ্যামা'। মনে হয় যেন সদ্য লেখা হয়েছে।

বৃদ্ধ ব'লে চললেন, শ্যামা ও তার বাবা প্রায় ছ' মাস ছিলেন এখানে। তারপর কলকাতায় ফিরে গেলেন। আর কখনো দেখা হয়নি ওঁদের সঙ্গে। কলকাতায় গিয়ে ওঁদের খোঁজ ক'রেও খোঁজ পাইনি। যে ঠিকানা আমার জানা ছিল, সে ঠিকানায় গিয়ে শুনলাম যে ওঁরা বাসাবদল করেছেন। তাঁদের নতুন ঠিকানার সন্ধান পাইনি। আমার জীবনে শ্যামা নামে মেয়েটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সম্পূর্ণ। কিন্তু এই পাথরে তার ছেলেমানুষির চিহ্ন রয়ে গেল। পঁয়ষট্টি বছরেও তা এতটকু অস্পষ্ট হয়নি। আর আশ্চর্য ব্যাপার কী জানেন, আমার মনের মধ্যেও চিহ্নিত হয়ে রইল। সারা জীবন ধ'রে চেষ্টা করেও মুছতে পারিনি।

বলতে বলতে বৃদ্ধের গলার স্বর ধ'রে আসে।

আমার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ঈষৎ কাঁপা গলায় বৃদ্ধ বললেন, একে তো ফসিলই বলা চলে। নয় কী? ঐ পাথরে খোদাই করা আঁকি-বুকিগুলি আপনাদের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুযায়ী ফসিলের আওতাতেই পড়বে না কি! আমার মন চিরেও ঐ একই ফসিলের সন্ধান পাওয়া যাবে।

এমন সময় হঠাৎ বৃদ্ধের মুখের ভাব একেবারে বদলে গেল। আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি যে আমার মতো অপরিচিতকে এত কথা ব'লে ফেলেছেন, তার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও আমার ওপরে আন্তরিকভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন ব'লে মনে হ'ল। আর কোনও কথা না ব'লে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

আমি আবার পাথরের স্তরে স্তরে অতীতের অরণ্যের চিহ্নগুলির পাঠোদ্ধারে মন দিলাম।

পাহাড়

উত্তর-বর্মার মিনবু শহর থেকে দেখতাম উত্তর-পূর্বদিকে পোপা পাহাড়ের সুদূর ধূসরতা আকাশের নীলিমার সঙ্গে মেশানো। আশে-পাশে আর সব পাহাড়কে ছাপিয়ে উঠেছিল তার উচ্চতা। দেখে মনে হত বড় রহস্যময়—রূপকথার রঙে আঁকা ছবি যেন।

তখন আমার জীবনের প্রথম প্রহর। যা' কিছু দেখতাম, রঙিন কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতাম। সাদা আলোয় স্পষ্ট ক'রে দেখার পালা হয়নি তখনো শুরু।

অনেক দূরের পোপা পাহাড়ের সঙ্গে জানা-শোনাটা তাই রূপকথার রাজ্যে ছিল কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়ে। মনে হত যেন একটা বোবা রহস্য-কাহিনী পাহাড়ের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিনবু থেকে তার ভৌগোলিক দূরত্বটা জানতাম না—মনে মনে একটা অসম্ভব দূরত্ব কল্পনা ক'রে নিয়ে ভাবতাম ওখানে বুঝি কেউ কখনো পৌঁছতে পারে না।

বাবা একদিন আমাদের বেড়াতে নিয়ে গেলেন ওখানে। যে পথ ছিল রহস্য-কাহিনীর আলো-ছায়ায় ঢাকা, সে-পথটাকে পিচের কালো রেখায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। যাকে জানা যায় না ব'লে জানতাম, তাকে ধূসর নীলের অস্পষ্টতা থেকে উদ্ধার ক'রে এনে আবিষ্কার করলাম সেগুন-বনে ছাওয়া উত্তুঙ্গতার মধ্যে। রাস্তা এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের মাথায় উঠেছে। বৃহদাকৃতি ফোর্ড গাড়ীটা অনায়াসে এই চড়াইটা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আমাদের সারথি মউং চান যেখানে গাড়ীটা এনে থামাল, বাবা বললেন যে, সেখান থেকে সামান্য দূরেই পাহাড়ের চূড়া।

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ছোট গ্রাম, কালো পাথরের স্তূপ, কালো মাটির উষরতা বিশ্লিষ্ট ক'রে ফসল ফলাবার দুঃসাহসী প্রয়াস, প্রতিদিনের চেনা মহলের সীমার মধ্যে টেনে নিয়ে এল পোপা পাহাড়ের সুদূর রহস্যকে। যে পোপাকে দূর থেকে দেখেছি, এ যেন সে নয়। আমার কল্পনার পোপা পাহাড়ে পৌঁছানো হয়নি সেদিন।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পাহাড়কে বিশ্লেষণ ক'রে তার ভেতরকার উহ্য রহস্যকে উদ্ঘাটন করছি আজকাল। বাইরের ধূসর নীল এবং সবুজ স্বপ্ন ছবিকে চিরে ফেলে কঙ্কালটিকে টেনে বের করি।

কিন্তু তবু রহস্য থেকে যায়।

মির্জাপুরের দক্ষিণে প্রায় একশ' ত্রিশ মাইল দূরে সিংরৌলি পাহাড়। আমার এবং অন্যান্য ভূতাত্ত্বিকদের ওপর ভার পড়েছিল পাহাড়টির অন্তর্লীন খনিজ সম্পদের সন্ধানের।

পাহাড়টি পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বিস্তৃত। পূর্বদিকের অংশটি উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার মধ্যে পড়েছে। পশ্চিম দিকের অংশটি পড়েছে মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলায়। পাহাড়টা খাড়াভাবে দক্ষিণদিকে নেমে এসেছে। এদিকে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। তার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে রিহাণ্ড নদী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে। পাহাড়ের সঙ্গে সমান্তরাল নদীর গতি—দেখলে মনে হয় যেন নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করছে পাহাড়টি।

পূর্বদিকে মির্জাপুর জেলার পিপরি নামে একটি গ্রামে রিহাণ্ড নদীতে একটি বাঁধ বাঁধা হয়েছে। নদীর প্রবাহ এই বাঁধে বাধা পেয়ে সমতলভূমির বিপুল অংশ জলে ডুবিয়ে দিয়েছে। এই জলের বিস্তার অবাধ হত যদি না উত্তর দিকে উদ্যত হয়ে থাকত এই সিংরৌলি পাহাড়ের নিষেধ।

সিংরৌলি পাহাড়ের নিচে নওনগর গ্রামের উত্তর প্রান্তে শিবির পত্তন করি আমরা। গ্রামের লোকেরা রীতিমত অবাক হয়ে গেল যখন তারা শুনল যে বহু দূর থেকে বহু ক্রোশ ঘুরে আমরা এসেছি কেবলমাত্র পাহাড়টাকে চিনে নিতে। ওদের অস্তিত্বের সঙ্গে সহজভাবে খাপ-খেয়ে-যাওয়া পাহাড়টাতে বিশেষভাবে চিনবার মতো কিছু যে থাকতে পারে, তা' তাদের কল্পনারও অতীত।

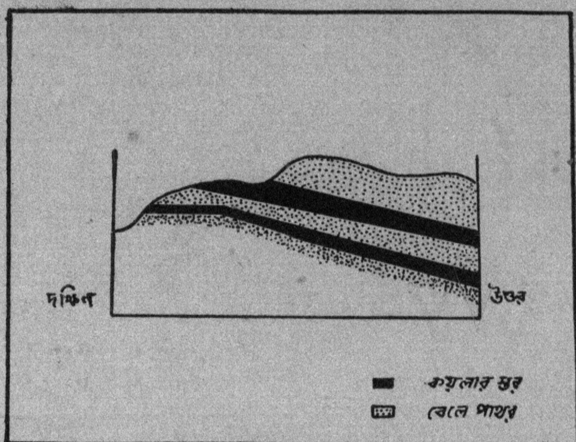
কেন এই পাহাড় প্রশ্নটা নওনগরের লোকেদের কাছে উত্থাপন করলে তারা নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিত। তাদের দৈনন্দিন জীবনের মোটা সমস্যা ও প্রশ্নগুলির সঙ্গে এ প্রশ্ন একেবারে সামঞ্জস্যহীন।

রিহাণ্ড বাঁধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেচ বিভাগের একজন এঞ্জিনীয়ার আমাদের বলেছিলেন যে, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সমতল জমির নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে হঠাৎ বিস্ময়ের মত মনে হয় পাহাড়টিকে।

আমার একজন সহকর্মী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনার জানতে ইচ্ছে করে না কেন এই পাহাড়?

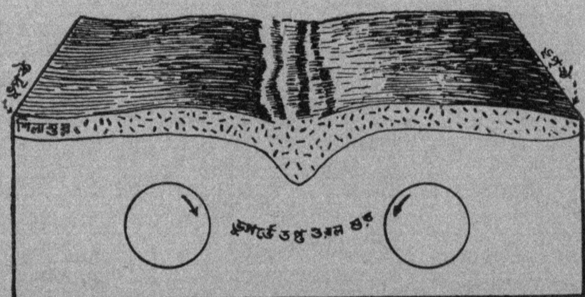
ইঞ্জিনীয়ার বললেন, এইটুকু জানি যে এই পাহাড় না থাকলে রিহাণ্ড নদীতে বাঁধ বাঁধা সম্ভব হত না—এর বেশি জেনে আর কি হবে?

—আপনি তা' হ'লে বলতে চান যে এই বাঁধ যাতে বাঁধা যায়, তার জন্যই এই পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছিল?



সিংরৌলি পাহাড়কে চিরে ফেললে যেমন দেখাবে

(পাহাড়)



ভূগর্ভে তপ্ত তরল স্তরের আবর্তন ও ভূপৃষ্ঠে তার প্রতিক্রিয়া

(পাহাড়)

—তা' এক রকম বলা চলে বই কি। প্রকৃতির এঞ্জিনীয়ারিং-এর দক্ষতার নিদর্শন এই পাহাড়। আমরা শত চেষ্টা করলেও এই পাহাড়ের চেয়ে মজবুত বাঁধ তৈরী করতে পারব না।

সিংরৌলি পাহাড় সেচ বিভাগের এঞ্জিনীয়ারদের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে—কিন্তু তাতে নেই আমাদের প্রশ্নের উত্তর। পাহাড়ের ভেতরকার কঙ্কালটিকে বের ক'রে না-আনা পর্যন্ত আমরা তৃপ্ত হব না।

কাজেই পাহাড়টিতে জরিপ করে যাই। পাহাড়কে চিরে-ফেলা নালাগুলোতে চুল-চেরা পর্যবেক্ষণ করি। বেলেপাথরের মূক আবরণের অন্তর্নিহিত স্বরূপটি কোথাও উদ্‌ভেদিত হয়েছে কিনা খুঁজে দেখি।

কাজটা শ্রমসাধ্য। দেড় মাসে পাহাড়টাতে যত ওঠা-নামা করেছি, তা' একত্র করলে দুটো মাউণ্ট এভারেস্টের উচ্চতাকেও বুঝি অতিক্রম ক'রে যাবে।

অবশেষে তুরা নালার মধ্যে পাওয়া গেল সিংরৌলি পাহাড়ের গুপ্ত রহস্যের চাবি। শ্যাওলা-ধরা বেলেপাথরের আড়ালে কয়লার স্তরের আভাস পাওয়া গেল। আমাদের সন্ধানী মনে শুভ্র প্রসন্নতার তুলি বুলিয়ে দিল এই ঈষৎস্ফুট কয়লার কালিমা।

তারপর তুরা নালার মধ্যে সীমাবদ্ধ পর্যবেক্ষণকে সমস্ত সিংরৌলি পাহাড জুড়ে প্রসারিত করবার আয়োজন চলল।

পাহাড়ের মাথায় ইতস্ততঃ কয়েকটা ড্রিলিং মেসিন এনে বসানো হ'ল। মাটির নিচে প্রচ্ছন্ন শিলাস্তরগুলিতে হাজার, দেড হাজার ফুট পর্যন্ত বিদীর্ণ করতে পারে এই মেসিনগুলো।

ড্রিলিং রড-গুলো ঘুরে ঘুরে বেলেপাথরের আবরণ ভেদ করে। সবচেয়ে নিচের রড-এ লাগানো থাকে ফাঁপা একটি পাইপ—তার মুখে হীরে বা টাংস্টেন কার্বাইড-এর দাঁত-বসানো আংটি শক্তভাবে থাকে আটকানো। যান্ত্রিক চাপে তা' ভেদ করে পাথরের জমাট বাঁধা জাড্যকে। পাইপ-এর দৈর্ঘ্য অনুযায়ী এক একবারে পাঁচ থেকে কুড়ি ফুট পর্যন্ত ড্রিলিং করা চলে। বৃত্তাকারে কাটা পাথর সংরক্ষিত হয় পাইপ-এর মধ্যে। বাইরে বের ক'রে এনে পাথরের টুকরোগুলোকে কাঠের বাক্সে সাজিয়ে পরীক্ষা করা হয় তাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম স্বরূপ।

এমনি ক'রে দেখা গেল সমস্ত সিংরৌলি পাহাড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে দুটো কয়লার স্তর। ওপরেরটি আশি থেকে একশ ফুট পুরু—নিচেরটি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট। দুয়ের মাঝখানে প্রায় দু'শো ফুট বেলেপাথরের ব্যবধান।

কয়লার স্তরগুলির ঢাল উত্তরদিকে। দক্ষিণদিকে পাহাড়ের গায়ে তাদের প্রসারের অবসান।

এইভাবে চিনে নিলাম আমরা সিংরৌলি পাহাড়ের অন্তর্নিহিত রহস্যকে। সাত-আটশো ফুট বেলেপাথরের সঙ্গে স্তরীভূত দুটো কয়লার স্তরের মধ্যে আবিষ্কার করা গেল সিংরৌলি পাহাড়ের কঙ্কালকে।

উন্মোচিত হ'ল সিংরৌলি পাহাড়ের রহস্যাবরণ। পাহাড়ের ভবিষ্যৎ লিপিবদ্ধ হ'ল কয়েকটি নতুন কয়লার খনির পরিকল্পনায়। যেখানে আছে পাহাড়, সেখানে প্রত্যক্ষ করলাম কয়েকটি গহ্বর ও ক্ষত। যেখানে আছে বন, সেখানে পত্তন হবে শহর। নতুন শহর, নতুন সভ্যতা।

দূর থেকে দেখা পাহাড়ের স্বপ্নছবি ক্রমশঃ যেন মুছে যেতে থাকে।

কিন্তু রহস্য তবু থেকে যায়। শাল, মহুয়া, আমলকী গাছে এবং পাহাড়ের স্তূপে ধূসর ও সবুজ রঙ মিলিয়ে যে রহস্যলোককে বিচিত্রিত ক'রে তোলে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দিয়ে তাকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করা শক্ত।

সিংরৌলি পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের বৈজ্ঞানিক পরিচয়-পর্ব সম্পর্কে আমার স্ত্রীর যোগ না থাকলেও সে জানতে চাইত পাহাড়ের মধ্যে কি পেলাম আমরা। আমাদের জানা-শোনার পালা শেষ হবার পর সে একদিন বললে, পাহাড়ের ভেতরকার কঙ্কালকে চিনলেই কি তাকে চেনা হয়? একটা মানুষের পরিচয় কি তার কঙ্কালের মধ্যে?

আমি বললাম, পাহাড়কে মানুষের মত সজীব পদার্থ ভাব নাকি?

গম্ভীর মুখে সে বললে, তার চেয়ে বেশি। শোননি পাহাড়ের কান্না?

হেসে উঠে বললাম, সে তো রাত-জাগা পাখির ডাক।

—না, পাখি নয়। অনেক রাতে সমস্ত পাহাড়টা জুড়ে একটা কান্নার স্রোত বয়ে যায়। মনে হয় পাহাড়ের আত্মা যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছে তোমাদের বিরুদ্ধে…

আমি আর কিছু বললাম না। বুঝলাম, আমাদের অস্থি-মজ্জায় অবস্থান করছে সরল বিশ্বাস। তর্কের অতীত রহস্যলোকে বিচরণ করতে সে ভালবাসে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে যাচাই করার প্রয়াসকে সহজ স্বীকৃতি দিতে সে কুণ্ঠিত।

আগ্নেয়গিরি

নাগপুর শহরের বাইরে অমরাবতীর পথে একটি বড় গ্রাম। গ্রামের নাম তেলেংকারি। গ্রামটিকে ঘিরে আছে কালো মাটি। এই মাটিতে তুলার চাষ হয়। গ্রামের পশ্চিম দিকে বিস্তীর্ণ তুলার খেত দিগন্তকে ছুঁয়েছে। কালো মাটি ছাড়া অন্য কোন মাটিতে কার্পাস তুলা হয় না।

তুলার খেতের মধ্যে জায়গায় জায়গায় কালো ব্যাসল্ট পাথরের স্তূপ রয়েছে। এই পাথর থেকে কালো মাটির সৃষ্টি। কালো পাথরের ক্ষয়ের অবশেষ কালো মাটি।

ব্যাসল্ট আগ্নেয় শিলা। আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত আগুনগলা পদার্থগুলি ব্যাসল্ট-এ জমাট বেঁধেছে। ব্যাসল্ট-এর দানাগুলির মধ্যে আছে এই অগ্নিস্বাক্ষর।

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মহীশূরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ব্যাসল্ট ও ব্যাসল্ট থেকে উৎপন্ন কালো মাটির বিস্তার। এই বিস্তীর্ণ কালিমা সাক্ষ্য দিচ্ছে একটা বিপুল ভূভাগজোড়া ভূগর্ভ থেকে নির্গত অগ্নিপ্রবাহের। কোটি কোটি বছর আগে মাটি ও পাথরের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল আগুনে গলানো শিলার স্রোত, ইংরেজীতে যাকে বলে লাভা (Lava)। লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে চলেছিল এই অগ্নিস্নান। তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাসল্ট-এর প্রায় আড়াই হাজার ফুট পুরু স্তর।

ভূবৈজ্ঞানিক হিসেবে প্রায় দশ থেকে বার কোটি বছর আগে দক্ষিণ ভারতে এই অগ্নি উদ্গীরণের পালা চলেছিল হাজার হাজার ফাটল দিয়ে। তারপর আগুন নিভেছে—নিঃশেষ হয়েছে লাভার ভাণ্ডার। ফাটলগুলো চাপা প'ড়ে গেছে পুরু ব্যাসল্ট-এর স্তরের নিচে। এখন সেই প্রাক্তন অগ্নিদাহকে চিনে নিতে হয় কালো পাথরে, বা উর্বর কালো মাটিতে কার্পাস তুলোর খেতে।

তেলেংকারি গাঁয়ের আশেপাশে সেই অতি প্রাচীন অগ্নিলীলাকে চিনবার চেষ্টা করছিলাম। ব্যাসল্ট-এর স্তূপে বিলুপ্ত আগুনের স্রোতের চিহ্নগুলির পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করছিলাম।

জায়গাটা নির্জন। কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। নিজের মনে কাজ ক'রে যেতে কোনও অসুবিধে ছিল না। এমন সময় হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, আমি একা নই। অদূরে জনৈক চাষী শ্রেণীর লোক পাথরে হেলান দিয়ে

দাঁড়িয়ে আমার অলক্ষ্যে আমাকে লক্ষ্য করছিল। আমার কার্যকলাপ সম্ভবতঃ বিশেষ কৌতুক বা কৌতূহল সঞ্চার করেছিল তার মনে।

লোকটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই সে হাসল। আমার সঙ্গে সে আলাপ করতে চায়—সম্ভবতঃ তারই ভূমিকা এই হাসি।

এগিয়ে এসে লোকটি বললে, আমার নাম পাণ্ডুরং ওয়ানখেড়ে। এই সব জমিজমা আমার। পুরো স্বত্ব আমার, আর কারুর নয়। আপনি বোধ হয় জমি-জরিপের সরকারী ডিপার্টমেণ্ট থেকে এসেছেন। সিদ্ধনাথ আম্‌লে আমার সঙ্গে জমির সীমানা নিয়ে যে মামলা ঠুকেছে, বোধ হয় সেই সম্পর্কেই মাপ-জোক করছেন। প্রথমেই আপনাকে আমি জানিয়ে রাখি যে, এই আম্‌লেকে আপনি আমল দেবেন না।

গম্ভীরমুখে আমি বললাম, তার দরকারও নেই। কারণ আমি জমি মাপি না—শুধু পাথর পরখ করি। এই সব কালো পাথর পরীক্ষা করছি।

দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে পাণ্ডুরং বললে, পাথর পরখ ক'রে লাভ! সোনা-রুপো কিছু আছে নাকি এখানে?

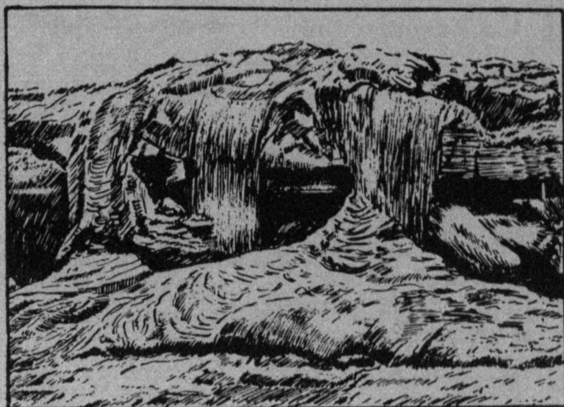
আমি বললাম, না, কিছুই নেই। আছে শুধু কালো পাথর, আর কালো পাথর ক্ষ'য়ে তৈরি হওয়া কালো মাটি, যাতে আপনারা কার্পাস ফলাচ্ছেন।

পাণ্ডুরং গদগদ স্বরে বললে, এই কালো মাটি আমাদের জীবন। কালো মাটি না থাকলে আমরা কি আর এখানে থাকতাম—গড়ে উঠত কি এই বসতি বা ঐ নাগপুর শহর!

আমি বললাম, আবার ঐ কালো পাথর না থাকলে সৃষ্টি হ'ত না কালো মাটি। কোটি কোটি বছর আগে মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল আগুনের স্রোত। তখন মানুষ না থাকলেও ছিল নানা রকমের প্রাণী। নিশ্চিহ্ন হয়েছিল তারা আগুনের স্রোতে। বন-জঙ্গল, গাছপালা যা-কিছু ছিল সব ধ্বংস হয়েছিল আগুনের স্রোতে। লুপ্ত হয়েছিল এখানকার নদী-নালা, জলাশয়। তারপর সেই আগুনের তেজ কমে এলে আগুনগলা পদার্থগুলি ধীরে ধীরে জমাট বাঁধল কালো পাথরে। এই সেই কালো পাথর।

পাণ্ডুরং বললে, ভগবানকে ধন্যবাদ যে, মাটির ভেতরকার আগুনকে তিনি বাইরে টেনে এনেছেন। নইলে কোথায় পেতাম এই সোনা-ফলানো কালো মাটি।

উত্তর বর্মায় ইয়েনান্‌জাং-এর তেলের খনি অঞ্চলের উত্তরদিকে পোপা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা বাবার সঙ্গে। বহু বছর আগেকার কথা। ঘন-



পাথরে জমাট বাঁধা লাভা (আগ্নেয়গিরি)



আগ্নেয় গিরির মুখ (আগ্নেয়গিরি)

সবুজ বনে ছাওয়া পাহাড়টি অপরূপ লেগেছিল আমার চোখে। বালক বয়স তখন আমার, সব কিছুই সহজে ভাল লাগে এমন একটা বয়স। কিন্তু আমার সেদিনের সেই ভাল-লাগা আজও অম্লান হয়ে রয়েছে আমার স্মৃতিতে।

বাবা আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে, এই পোপা পাহাড ছিল একটা আগ্নেয়-গিরি। কয়েক লাখ বছর আগে এখান থেকে নিয়মিত অগ্ন্যুদ্গার হত। ভূগর্ভ থেকে লাভা আগুনের স্রোতের মত বেরিয়ে আসত। লাভা জমে জমে গ'ড়ে উঠেছিল পোপা পাহাড়। সেই আগ্নেয়গিরি ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে মরে গেছে। লাভা জমাট বেঁধেছে কালো পাথরে। সেই পাথর ক্ষয় পেয়ে সৃষ্টি করেছে উর্বর মাটি। এখানকার জল-হাওয়া, পাহাড, ফসলে ভরা-খেত, চোখ-জুড়ানো শোভা, সব কিছু গ'ড়ে উঠেছে লাভার স্তরে স্তরে। যা ধ্বংস করেছিল, তা নিল স্রষ্টার ভূমিকা। আগ্নেয়গিরি ছিল ব'লেই এই অপরূপ সৌন্দর্য হয়েছে সম্ভব।

কবি বলেছেন যে, যার মোহন রূপ আমাদের ভোলায়, তার চরণমূলে মরণ নাচে। বর্জন করে অর্জন করতে হয়, সৃষ্টির বনিয়াদ রচিত হয় ধ্বংসের ওপর। ভাঙ্গনের পথে সুন্দরের আসন পাতা।

পোপা পাহাড়ে আগ্নেয়গিরিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার শ্যামল শোভন মোহন রূপ বিগত রুদ্র গিরিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

জীবন্ত আগ্নেয়গিরিগুলিও প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে বিরাজ করছে। আপাতদৃষ্টিতে তারা বনের সবুজ বা বরফের শুভ্রতায় ছাওয়া পাহাড় বা পর্বত, নদীনালা, শস্যক্ষেত প্রভৃতির সঙ্গে মিলে মিশে আছে সুসমঞ্জসভাবে। যেখানে তারা আছে, স্থানীয় ভূচিত্রের অংশরূপে বিরাজ করছে। কিন্তু হঠাৎ যখন তাদের ভেতরকার প্রচ্ছন্ন রুদ্র আত্মপ্রকাশ ক'রে ব্যাপক ধ্বংসের আয়োজন করে, তখন ছন্দপতন ঘটে। যাকে সুন্দর ব'লে জেনেছি, সে নেয় বিভীষিকার রূপ।

ভূগর্ভ যে তপ্ত তার আভাস মেলে খনির মধ্যে ঢুকে। কিন্তু পাথরের স্তরকে গলিয়ে লাভা সৃষ্টি করার মত তাপ কোথা থেকে আসে তা' এখনো বিজ্ঞানী-দের কাছে একটি ধাঁধা। এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই।

ভূগর্ভে পৃথিবীর কেন্দ্রে একটি তপ্ত গলিত গোলক আছে। হয়তো সেখান থেকে ভূস্তরের দিকে তাপ পরিবাহিত হয়ে পাথর গলাচ্ছে। কিংবা হয়তো পাথরের স্তরে স্তরে নিহিত তেজস্ক্রিয় খনিজ থেকে বিকীর্ণ তেজ তাপ সৃষ্টি ক'রে পাথরকে গলিত লাভায় পরিণত করছে।

অবশ্য তাপের উৎস যাই হোক না কেন, পৃথিবীর সর্বত্র তা' সক্রিয় নয়। ভূগর্ভে সব জায়গায় সমান পরিমাণে লাভার সৃষ্টি হয় না। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে ভূগর্ভের আগ্নেয়-লীলা। আল্‌প্‌স ও হিমালয় পর্বতমালা ও তাদের ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন ক'রে আমেরিকা, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি দিয়ে বিস্তৃত পর্বতমালায় পৃথিবীর মৃত ও জীবন্ত সব ক'টি আগ্নেয়গিরি অবস্থান করছে। এই দুটি অগ্নি-বলয়ের বাইরে কোন আগ্নেয়গিরি নেই।

অগ্নিবলয় দুটি পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা দিয়ে চিহ্নিত। পর্বতগুলি পৃথিবীর পৃষ্ঠ অতিক্রম ক'রে যেমন উর্ধ্বগামী, তেমনি তাদের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ভূগভ হয়েছে নিম্নগামী। ফলে তাদের ভেতরকার শিলাস্তরগুলি পৃথিবীর কেন্দ্রের তপ্ত তরল গোলকের সান্নিধ্যে এসেছে এবং সম্ভাবনা ঘটেছে তাদের গলে গিয়ে লাভায় পরিণত হওয়ার।

এমনি ক'রে আগ্নেয়গিরিগুলির বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে অবস্থানকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অবশ্য এ সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রমাণ এখনো সন্ধানসাপেক্ষ। ভূবিজ্ঞানীরা এ নিয়ে গবেষণা ক'রে চলেছেন।

পৃথিবীতে যত আগ্নেয়গিরি আছে তাদের অধিকাংশ মৃত। মোট প্রায় পাঁচশোটি আগ্নেয়গিরিকে জীবন্ত ব'লে ধরা চলে। তাদের মধ্যে পঞ্চাশটি রয়েছে সুমাত্রা, যবদ্বীপ, সুন্দা ও মলাক্কা দ্বীপে। আল্‌প্‌স-অঞ্চলে বিসুভিয়াস, লিপারি, এত্‌না প্রভৃতি কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে। বাদবাকি জীবন্ত আগ্নেয়গিরিগুলো প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন ক'রে বিরাজ করছে আলাস্কা, অ্যালুশিয়ান দ্বীপ, কাম্‌স্‌কাট্‌কা, কিয়ুরাইল, জাপান, ফিলিপাইন, নিউ হিব্রাইডিস, টোঙ্গা, নিউজিল্যাণ্ড, মেক্সিকো, গুযাতেমালা, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা, আন্টিলেস, আন্দেজ পর্বত প্রভৃতি অঞ্চলে।

ভূগর্ভে সঞ্চিত লাভা গ্যাসের চাপে বাইরে বেরিয়ে আসে। লাভা ও গ্যাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে জলীয় বাষ্প। তাদের নির্গমনের বেগে শিলাস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় দুর্দম বেগে। গ্যাস, জলীয় বাষ্প ও পাথরের কণা মিলে আকাশকে আচ্ছন্ন করে ঘন কালো ধোঁয়ার আবরণে। তার মধ্যে লাভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝলসে ওঠে ধূমল দৈত্যের অগ্নিচক্ষুর মতো। লাভা বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে। এই গলিত আগুন নিশ্চিহ্ন করে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর

শহর। তার প্রবাহপথে যা কিছু আসে, সব বিলুপ্ত হয় নিঃশেষে। তার স্পর্শে নিঃশেষ হয় জীবনের সব চিহ্ন। লাভায় আচ্ছন্ন হয় স্থানীয় ভূচিত্র। অগ্ন্যুদ্গার বন্ধ হ'লে পর লাভা ঠাণ্ডা হয়ে পাথরে জমাট বাঁধে।

প্রস্তরীভূত লাভার স্তরগুলি জমতে জমতে শঙ্কু-আকৃতির (cone-shaped) আগ্নেয়গিরির আকার নেয়। আগ্নেয়গিরিতে তার চূড়া থেকে ভূগর্ভে লাভা পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট একটি প্রবাহপথ থাকে। এই গহ্বর দিয়ে অগ্নিস্রাব হয়ে থাকে। এই গহ্বরকে বলে. ক্রেটার (Crater)। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির ক্রেটার-এর ধারে গিয়ে দাঁড়ালে ভূগর্ভে আগুনগলা লাভার আভাস পাওয়া যায়।

আধুনিককালের আগ্নেয়গিরিগুলি ঘন ঘন সক্রিয় হয় না। একবার জাগলে পর সুদীর্ঘকালের সুপ্তি তাদের আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। কিন্তু কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীর ভেতরটা যখন খুবই তপ্ত ছিল, তখন অগ্ন্যুদ্গারের বিরাম ছিল না। আল্প্স, হিমালয় ও প্রশান্ত মহাসাগরের অগ্নিবলয় দুটি থেকে সর্বদাই ব্যাপকভাবে অগ্নিস্রাব ঘটত। তার অন্যতম প্রমাণ ভারতের দাক্ষিণাত্যের ব্যাপক অগ্নিপ্রবাহ।

বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, ভূগর্ভের আগুন ক্রমশঃ নিভে আসছে ও স্তিমিত হয়ে পড়ছে আগ্নেয়গিরিগুলো। প্রাচীন কালের মত তাদের তেজ নেই, নেই ব্যাপকভাবে ধ্বংস করার ক্ষমতা।

তথাপি অনেক জায়গায় আগ্নেয়গিরির অগ্নিচক্ষুর সামনে মানুষ সন্ত্রস্ত।

ইটালীর বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরিতে গত ১৯০৬ খৃস্টাব্দে প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গার হয়েছে। ১৯০২ খৃস্টাব্দ থেকে চলছিল এই অগ্নি-অভিষেকের আয়োজন। তখন থেকে ছোটখাটো অনেকগুলো অগ্নিস্রাব ঘটেছে ১৯০৬ খৃস্টাব্দের চরম আগ্নেয় তাণ্ডবের ভূমিকাস্বরূপ। বিসুভিয়াস এখন শান্ত. কিন্তু ভেতরে ভেতরে চলছে ভবিষ্যৎ কোনও অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন। যে-কোনও মুহূর্তে আবার অগ্নিবর্ষণের পালা শুরু হতে পারে।

সাম্প্রতিক কালের মধ্যে প্রচণ্ডতম অগ্ন্যুদ্গার ঘটেছে জাভা ও সুমাত্রার মধ্যবর্তী প্রণালীতে অবস্থিত ক্রাকাতোয়ার আগ্নেয়গিরিতে। প্রায় দু'শো বছর যাবৎ সুপ্ত থেকে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে প্রবল অগ্নিস্রাবের মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম হ'ল আগ্নেয়গিরিটির। তার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ৩০০০ মাইল দূরে অস্ট্রেলিয়া থেকেও শোনা গিয়েছিল। আকাশ ধোঁয়া ও পাথরের কণায় আচ্ছন্ন হয়ে জাভা ও সুমাত্রার অধিকাংশকে আঁধারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। ক্রাকাতোয়ায় মানুষের

বসতি না থাকায় এই আগ্নেয় তাণ্ডব মানুষের জীবনের ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানতে পারেনি। কিন্তু পরোক্ষভাবে ব্যাপকভাবে তা' মানুষের প্রাণসংহার করেছে। ক্রাকাতোয়ার এই অগ্ন্যুদ্গারের ফলে সমুদ্রে প্রায় একশো কুড়ি ফুট উঁচু ঢেউয়ের সঞ্চার হয়েছিল, যার ফলে জাভা ও সুমাত্রার উপকূলবর্তী মানুষের বসতিগুলি হয়েছিল বিধ্বস্ত এবং প্রায় ছত্রিশ হাজার জন জলে ডুবে প্রাণ হারিয়েছিল।

১৯৬৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে বলী দ্বীপের এগাং আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুদ্গার হয়েছে। তার ফলে দ্বীপটির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লাভায় হয়েছে আচ্ছন্ন এবং পনরো শ' লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। মে মাসে আবার অগ্নিবর্ষণ হয়েছে আগ্নেয়গিরিটি থেকে। তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলটির আরও ক্ষতি হয়েছে এবং আরও অনেক লোক তাদের প্রাণ হারিয়েছে।

হাওয়াই দ্বীপের কিলওয়া আগ্নেয়গিরিতে ভূগর্ভের আগুনগলা লাভা বিরাট একটি হ্রদ রচনা করেছে। এই তরল আগুনের হ্রদটির ব্যাস প্রায় তিন মাইল। মাটি ও পাথরের ঢাকনা খুলে এখানে পৃথিবীর ভেতরকার আগুন হয়েছে অনাবৃত। আশ্চর্য এই যে, প্রবল কোন অগ্নিস্রাব ঘটেনি এখানে। বাইরের আলো-বাতাসের সঙ্গে এই আগুন সুদীর্ঘকাল ধরে শান্তভাবে সহাবস্থান করছে। স্থানীয় অধিবাসীরা মেনে নিয়েছে এই আগুনের সান্নিধ্য।

অবশ্য সম্ভাবনা রয়ে গেছে এই আগুনের তাপ সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ার। যে-কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে এই অগ্নিতাণ্ডব।

হাওয়াই দ্বীপে এমন কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে যারা মোটামুটি নিরুপদ্রব। তারা শান্তভাবে লাভা ছড়ায়। লাভা খুব স্তিমিত গতিতে বেরিয়ে আসে তাদের মুখ থেকে। গতির তীব্রতার অভাবে বেশি দূর ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এমনি সংহারশক্তিহীন অথচ সক্রিয় আগ্নেয়গিরি পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও আছে।

অনেক আগ্নেয়গিরি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে মানুষের অগম্য পার্বত্য অঞ্চলে। তারা যে আছে তার খবর পেতে হয় ভূগোলের পাতা থেকে। তাদের অগ্নিচক্ষু মানুষের চোখে পড়ে না। কাজেই তাদের সম্পর্কে সকলে উদাসীন। কিন্তু মাঝে মাঝে তারাও এমনি প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবে মাতে যে তার প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী। গত ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে জাপানের আসামা ও আইসল্যাণ্ডের লাকি অঞ্চলের আগ্নেয়গিরি দুটি নিদারুণ অগ্নিবর্ষণ করেছিল। মানুষের চোখের

অগোচরে ছিল তা'। কিন্তু এত ধোঁয়া ও ধুলো আগ্নেয়গিরি দুটি থেকে আকাশে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, তা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, উত্তর আমেরিকা, য়ুরোপ ও উত্তর আফ্রিকার আকাশকে ছেয়ে ফেলেছিল। এসব অঞ্চলের লোকেরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আকাশভরা শুধু শুকনো কুয়াশা দেখেছে। এই কুয়াশায় সূর্য ঢাকা পড়েছিল। ধুলো ও ধোঁয়ার আবরণে সূর্য আড়াল হওয়ার দরুণ সে-বছর তীব্রতম শীতে জর্জরিত হয়েছিল উত্তর আমেরিকা ও য়ুরোপের লোকেরা।

আগ্নেয়গিরি যেন মৃত্যুর পরোয়ানা। যে-কোনও মুহূর্তে তা' হানতে পারে মৃত্যুবাণ। কিন্তু তবু আগ্নেয়গিরির আশেপাশে জনপদ গ'ড়ে ওঠে। মৃত্যুর ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে দুঃসাহসী মানুষ।

৭৯ খৃস্টাব্দে বিসুভিয়াসের অগ্নিবর্ষণের ফলে সমস্ত পম্পেই নগর বিধ্বস্ত হ'ল। এর পর স্বাভাবিকভাবেই আশা করা গিয়েছিল যে, বিসুভিয়াসের ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না কেউ। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এক শতাব্দীও পেরোলো না, ইটালীর লোকেরা ভুলে গেল পম্পেইয়ের কথা—বিসুভিয়াস যে একটি আগ্নেয়গিরি তা'ও তারা বিস্মৃত হ'ল। অচিরে আবার অনেক জনপদ গ'ড়ে উঠল বিসুভিয়াসের চারপাশে।

আমরা যারা আগ্নেয়গিরির আওতার বাইরে থাকি, আগ্নেয়গিরি-অঞ্চলের নর-নারীদের দুঃসাহসে চমৎকৃত না হয়ে পারি না। আমরা ভাবি, বুঝি তাদের প্রাণের মায়া বলতে কিছু নেই।

আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের লোকেরা অবশ্য বলবে যে, প্রাণের মায়া আছে বলেই তারা আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি থাকছে।

আমরা অবাক হয়ে হয়তো ব'লে উঠব, সে আবার কী!

তারা বলবে, আগ্নেয়গিরির আশেপাশে জমিগুলো খুব উর্বর। আগ্নেয়গিরির লাভা ক্ষয় পেয়ে খুব সারবান এই মাটি তৈরী করে।

কিন্তু আগ্নেয়গিরি যখন আগুন ছিটিয়ে সব ধ্বংস করে ফেলবে?

—তখন তরল লাভা মাটিতে মিশে তাকে নতুন জীবন দেবে। এমন কত জমি লাভার স্পর্শে সারবান হয়ে উঠেছে।

—কিন্তু লাভার স্রোত গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে, হাজার হাজার লোকের প্রাণ নেয়—

—তার বিনিময়ে মাটিকে প্রাণ দেয়। তাতেই যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হয়। বিনা মূল্যে কি কিছু পাওয়া যায়? আমাদের প্রাণের দামের চেয়ে মাটির দাম নিশ্চয়ই

অনেক বেশি। আমাদের আয়ু আর কতটুকু! এই স্বল্প আয়ুর বিনিময়ে মাটিকে যদি অমর ক'রে তুলতে পারি, আমাদের তুচ্ছ জীবন কি সার্থক হয়ে উঠবে না!

—কিন্তু কখন অগ্নিকাণ্ড ঘটবে তার জন্য সব সময়ই তো ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়।

—বড় বড় শহরে কখন গাড়ি চাপা পড়ি, তার জন্যও তো সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। হিসেব ক'রে দেখুন না, গাড়ি চাপা পড়ে যত লোক মারা পড়ে, তার তুলনায় আগ্নেয়গিরির দরুণ ক'টা লোকই বা মরে!' যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, হানাহানির কথা না হয় বাদই দিলাম।

এর ওপর হয়তো আমাদের আর কিছুই থাকে না বলবার।

আমাদের চুপ ক'রে থাকতে দেখে আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের লোকেরা হয়তো বলবে, আগ্নেয়গিরি যেমন ধ্বংস করে, তেমনি সৃষ্টি করে। প্রাগৈতিহাসিক কালের লোকেরাও আগ্নেয়গিরির ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপকে স'য়ে নিয়েছিল তার দরুণ মানুষের যে উপকার হয় তার কথা ভেবে। আজ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে যাচাই ক'রে আগ্নেয়গিরিকে আমাদের অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী কী ক'রে ভাবি বলুন!

কাদার পাহাড়

আমার বাল্যস্মৃতিতে কোন্ জিনিসটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে, এ প্রশ্ন যদি কেউ করেন, মুহূর্তমাত্রও চিন্তা না ক'রেই জবাব দেব, কাদার পাহাড়। আমার জবাবে হয়তো প্রশ্নকর্তার মনে বিস্ময়ের ভাব জাগতে পারে। কারুর শৈশবের স্মৃতি কর্দমাক্ত হয়ে থাকাটা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নয়। জীবনের প্রথম প্রহরের স্মৃতিতে গেঁথে-থাকা কাদার স্তূপের মধ্যে যাতে কেউ ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের প্রেরণা না পান, তার জন্য কাদার পাহাড়টি কী বস্তু, তা বুঝিয়ে বলা দরকার।

আমার শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল উত্তর বর্মার মিনবুতে। মিনবু ও তাঁর আশে-পাশে মাটির নিচে খনিজ তেলের ভাণ্ডার আছে। শহরের চারপাশে কয়েকটি খনি গ'ড়ে উঠেছিল মাটির আড়ালে প্রচ্ছন্ন তেল আহরণ করার জন্য। খনিজ তেলের খনি মানে বেলেমাটি ও বেলেপাথরের আবরণ বিদীর্ণ ক'রে ভূগর্ভে তেলের স্তর পর্যন্ত প্রসারিত গভীর নলকূপ। ড্রিলিং মেসিন দিয়ে মাটি ও পাথরের স্তর কুপিয়ে কূপগুলিকে তৈরী করা হয়। কূপের মধ্যে নল ঢুকিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে তেল শোষণ ক'রে বের করতে হয়। এক-একটি খনিতে অনেকগুলো ক'রে কূপ থাকে। মিনবু অঞ্চলের খনিগুলির মধ্যে একটিতে পরিচালক ও ভূতাত্ত্বিক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন আমার বাবা। খনিটি ছিল শহরের কাছেই। অসমতল জমির ওপরে অসংখ্য কূপ—তাদের কাঠের কাঠামো মাটিকে যেন কঠোরভাবে চেপে ধরেছে। তেলের কূপ, বয়লার, ইঞ্জিন-ঘর, তেল ধরে রাখার ট্যাঙ্ক ও ইঞ্জিন-ঘর থেকে কূপগুলির দিকে প্রসারিত তারের জটিল জাল—সব মিলিয়ে মাটিকে শোষণ করার বিপুল আয়োজন। ছোট একটি পাহাড়ের মাথায় ছিল আমাদের আবাসস্থল। খনির কর্মকাণ্ড থেকে আমরা একটু তফাতে থাকলেও খনির কার্যকলাপের সব কিছুই আমাদের চোখে পড়ত। দূর থেকে দেখে অবশ্য তৃপ্তি হত না। কাছে গিয়ে দেখতাম। দেখতাম, মৃত্তিকার স্তরের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসছে গাঢ় বাদামী রঙের তরল পদার্থের প্রবাহ—আলো ঠিকরে তার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নানা রঙের বর্ণালী। মাটি ও পাথরের স্তরের কাঠিন্যের আড়ালে এই তরলতা কী করে সম্ভব হ'ল, ভেবে অবাক হতাম।

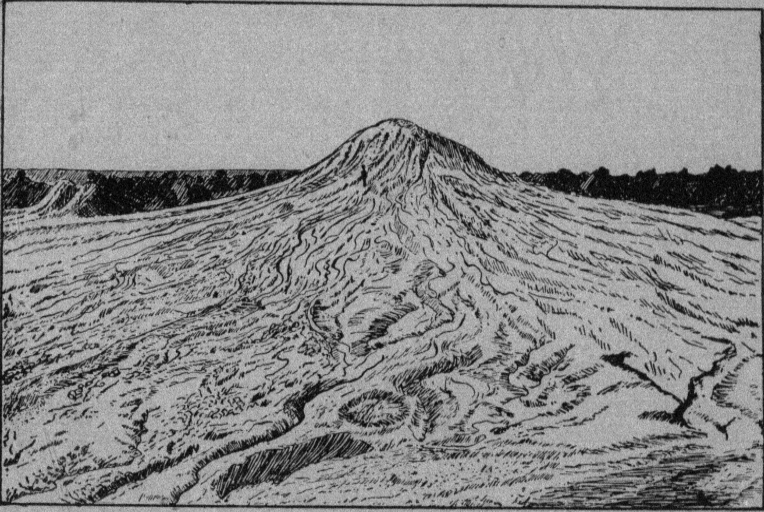
শুধু তরল পদার্থ নয়, তরল পদার্থের সঙ্গে গ্যাসও মিশে থাকে। আর থাকে জল। তা অবশ্য পৃথিবীর সর্বত্র মাটি বা পাথরের স্তরকে সম্পৃক্ত ক'রে আছে—

সম্পূর্ণ, এক করেছে পৃথিবীব্যাপী ভূসংস্থানকে। তেলে না মিশলেও তেলের সঙ্গে সহাবস্থান করছে। তেলের সঙ্গে মিশে-থাকা গ্যাসের স্বভাব হ'ল নিজেকে প্রসারিত করা। তার সম্প্রসারণশীল স্বভাবের জন্য সে তেলের সীমা পেরিয়ে এসে মাঝে মাঝে জলের সঙ্গে কোলাকুলি করে—মাটির নিচে প্রচ্ছন্ন জলকে স্থাণুর মত স্থির থাকতে না দিয়ে স্থানচ্যুত করতে চায়। তার ফলে জল তার নির্দিষ্ট স্তর থেকে বেরিয়ে ওপরতলার পাথর ও মাটির স্তরের ফাটলের ফাঁক দিয়ে বেগে বেরিয়ে আসে। জলকে অনুসরণ ক'রে গ্যাসও আসে। জলের মধ্যে বুদ্বুদের আবর্ত সঞ্চার করে তার আত্মপ্রকাশ।

গ্যাসের ধাক্কায় বেরিয়ে আসতে গিয়ে জল তার গতিপথে যাকে পায়, তাকে টেনে আনতে চায়। গ্যাসের বলে বলীয়ান জল বলপ্রয়োগ করে পাথর ও মাটির স্তরের ওপরে। শক্ত পাথরের ওপরে তার শক্তিপ্রয়োগ সফল না হ'লেও নরম পাথর ও মাটিকে তা' আল্‌গা ক'রে কাদা ক'রে দেয়। জলে মেশানো কাদা গ্যাসের ধাক্কায় বেরোতে থাকে মাটি ও পাথরের বিশ্লিষ্ট করা ফাটল বেয়ে। কাদার মধ্যে জলের পরিমাণ বেশি হ'লে তা ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে, কিন্তু জলের পরিমাণ কম হ'লে ফাটলকে ঘিরে কাদা স্তরে স্তরে জমতে থাকে এবং জমাট বেঁধে শুকিয়ে যায়। ক্রমশঃ এই স্তরে স্তরে সঞ্চিত কাদা গোল আকারের পাহাড়ের রূপ নেয়। কাদায় রচিত এই পাহাড়ই হ'ল কাদার পাহাড়।

আকারে পাহাড়, কিন্তু তাতে জমাট-বাঁধা কাদা ছাড়া কিছু নেই। বালি বা পাথরের এক কুঁচিও খুঁজে পাওয়া যাবে না তাতে। কাদা জমাট বেঁধে থাকলেও অবশ্য কাদাতে পুরোপুরি নিরেট হয়ে ওঠে না। যে ফাটলের ফাঁক দিয়ে কাদা বেরিয়েছে তাকে ঘিরে কাদা জমে—কাজেই পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত একটানা একটা গহ্বরের শূন্যতা বিরাজ করে। এই গহ্বর সর্বদা জলে ও কাদায় ভরে থাকে। গ্যাসের ধাক্কায় কাদাগোলা জলে বড় বড় বুদ্বুদের ঢেউ ওঠে এবং পাহাড়ের চূড়াকে ছাপিয়ে কাদা গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে। এই কাদা একটু তপ্ত হয়ে থাকে।

কাদার পাহাড় সাধারণতঃ পঞ্চাশ ফুটের বেশি উঁচু হয় না। কাদার স্তূপ উঁচু হয়ে আকাশকে খোঁচা দেবে তা বুঝি আকাশ সইতে পারে না, তাই বৃষ্টির আঘাত হেনে তার উঁচু হওয়ার উচ্চাশাকে দমন করে। তবে বৃষ্টিরিক্ত অঞ্চলে জমাট-বাঁধা কাদা কাদা হয়ে অপসৃত হয় না। পশ্চিম পাকিস্তানে বেলুচিস্তানের মেকরান মরু অঞ্চলে দু'শো থেকে আড়াইশো ফুট পর্যন্ত উঁচু কাদার পাহাড় দেখা যায়।



কাদার পাহাড়   (কাদার পাহাড়)

আকারে প্রকারে কাদার পাহাড়ের সঙ্গে আগ্নেয়গিরির মিল আছে। যেমন ভূগর্ভ-নির্গত তপ্ত গলিত শিলা স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে আগ্নেয়গিরি রচনা করে, তেমনি মাটির তলা থেকে উদ্‌গত কাদা জমতে জমতে কাদার পাহাড়ের আকারে জমাট বাঁধে। ইংরেজীতে কাদার পাহাড় তাই Mud Volcano নামে পরিচিত।

নামে Mud Volcano হ'লেও কাদার পাহাড়ের মুখ দিয়ে কাদা সাধারণতঃ স্তিমিতভাবেই নিঃসৃত হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গারের প্রবল বেগ তাতে দেখা যায় না। কিন্তু কদাপি কখনো কখনো কাদা প্রবল বেগে উদ্‌গীর্ণ হয়, যেমনটি বর্মার ছেদুবা দ্বীপে হয়েছিল। ১৯০৪ খৃস্টাব্দে ২১শে জানুয়ারী তারিখে ছেদুবা দ্বীপে কাদার পাহাড় থেকে একটানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধ'রে প্রবল বিস্ফোরণের সঙ্গে কাদা উদ্‌গীর্ণ হয়েছিল। কাদার সঙ্গে মিশে-থাকা গ্যাস দাহ্য। কাদা বেগে বেরোতে থাকার দরুণ ঘর্ষণজাত তাপের সঞ্চার হয়েছিল। সেই তাপের ফলে গ্যাসে আগুন লেগে গিয়েছিল। বহ্নিমান কাদা দেখে ছেদুবার কাদার পাহাড়কে আগ্নেয়গিরি বলে ভ্রম হয়েছিল।

পৃথিবীর অনেক জায়গায় তেলের খনি-অঞ্চলে কাদার পাহাড় দেখা যায়। বর্মা, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ত্রিনিদাদ, রুমেনিয়া, কলম্বিয়া, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের খনিজ তেলের ক্ষেত্রে কাদার পাহাড় আছে।

বর্মাদেশে অনেকগুলো কাদার পাহাড় রয়েছে—আরাকান পর্বতমালার দু'পাশে তারা শোভা পাচ্ছে। আরাকানের পূর্বদিকে মিনবু, প্রোম ও হেনজাদা এবং পশ্চিমদিকে আরাকানের উপকূলবর্তী রামরি, ছেদুবা ও অন্যান্য ছোট ছোট দ্বীপে কাদার পাহাড় দেখা যায়। এদের মধ্যে মিনবুর কাদার পাহাড়গুলি বিশেষভাবে দর্শনীয় হয়ে উঠেছে সহজ গম্যতার জন্য।

মিনবুর কাদার পাহাড়গুলি মিনবু শহরের অদূরে রয়েছে। পাহাড়গুলির ফাঁকে ফাঁকে আছে কাদা ও জলে মেশানো পুকুর। পাহাড়ের মাথার গহ্বরে ও পুকুরে কাদার মধ্যে সর্বদা গ্যাসের আবর্তের সঞ্চার হচ্ছে। কাদার পাহাড়, তার চারপাশের জমিকে আচ্ছন্ন করা কাদার প্রলেপ ও কাদার পুকুর—সব কিছুরই রঙ শ্লেট পাথরের মত নীলাভ ধূসর। এখানকার শুকিয়ে জমাট-বাঁধা কাদা সাধারণ শুকনো কাদার চেয়ে অনেক বেশী শক্ত। শুকিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে তার মধ্যে যে রুক্ষতার সঞ্চার করেছে, তা রীতিমত তীক্ষ্ণ। কাদার পাহাড় থেকে নির্গত কাদা জলের স্পর্শে সরস হলেও তার মধ্যে নেই প্রাণের পুষ্টির কোন

উপকরণ। হয়তো গ্যাসের রাসায়নিক প্রভাব তাকে বন্ধ্যা করেছে। বীজ অঙ্কুরের পথ পেয়ে উদ্ভিদের প্রাণসত্তা তার মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। চারপাশের উর্বর মাটি গাছপালায় সবুজ—মাঝখানে নীলাভ ধূসর রঙের উষরতা। কাদার পাহাড ও তার চারপাশে জমে-থাকা কাদা যেন মাটির ভেতরকার গরল। কাদার মধ্য দিয়ে উদ্‌গত গ্যাস যেন পাতালপুরীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস। নিঃশেষ হয়েছে তার স্পর্শে মাটির সবুজ রঙ।

কাদার পাহাড দেখতে আমরা প্রায়ই যেতাম। প্রথম প্রথম বাবা-মা বা আমাদের মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে গিয়েছি, পরে আমাদের বাড়িতে যাঁরা বেড়াতে আসতেন, তাঁদের সঙ্গে যেতাম। বিশেষভাবে কাদার পাহাড় দেখার উদ্দেশ্যে অনেকেই আসতেন আমাদের বাড়িতে। কাদার পাহাড় সম্পর্কে সকলের বিস্ময় মিশ্রিত কৌতূহল দেখে মনে হত কাদার পাহাড় যেন বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়ের সামগ্রী।

বর্মাদেশে যাঁরা বেডাতে আসতেন, মিনবুর কাদার পাহাড় না দেখে তাঁরা দেশে ফিরতেন না।

একদা একজন তরুণ ভূতত্ত্ববিদ্ এসেছিলেন মিনবুতে এবং আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলেন দিন কতক। বাবাকে তিনি কাকাবাবু ব'লে সম্বোধন করতেন, সেই সুবাদে আমরা ভাই-বোনেরা তাঁকে দাদা ব'লে ডাকতাম। আমরা ভেবেছিলাম বুঝি তিনিও কাদার পাহাড়ই দেখতে এসেছেন।

কিন্তু দিন কয়েক অতিবাহিত হওয়ার পরে দেখলাম যে কাদার পাহাড় দেখার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করছেন না তিনি। ব্যাপারটা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকাতে তাঁকে একদিন প্রশ্ন করলাম, কাদার পাহাড় দেখবেন না, দাদা?

দাদা গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, আমি টুরিস্ট নই, জিয়োলজিস্ট। এখানকার জিয়োলজিকে জানতে এসেছি। অবশ্য তেলের খনির জিয়োলজির মধ্যে কাদার পাহাড়ের নিজস্ব একটা স্থান আছে। কাজেই কাদার পাহাড দেখার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু শুধু দেখার জন্য দেখা, সে আমার নয়।

দাদা সরকারী বৃত্তিধারী—বর্মাদেশের তেলের ক্ষেত্রগুলিতে ভূতাত্ত্বিক গবেষণা চালাবার জন্য কলকাতা থেকে এসেছেন। উত্তর বর্মার ইয়েনানজাং ও চকের খনিজ তেলের ক্ষেত্রে কাজ ক'রে তিনি মিনবুতে এসেছেন। মিনবুর খনিজ তেলবাহী শিলাস্তরের রহস্য ভেদ করতে চান তিনি।

দিনকয়েক তিনি আমাদের কলোনীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করলেন—অনেক তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে অসংখ্য পাথরের নমুনা সংগ্রহ ক'রে তাঁর ঝুলি বোঝাই করলেন। কিন্তু কাদার পাহাড দেখতে যাওয়ার জন্য কোন উদ্যোগ তিনি করলেন না।

অবশেষে তাঁর বিদায় নেওয়ার দিন ঘনিয়ে এল। কাদার পাহাড় সম্পর্কে তাঁর নিরাসক্ত মনোভাবে আমরা ভাই-বোনেরা নিরাশ হলাম। তাঁর যাত্রার আগের দিন তাঁকে আমি বললাম, কালই তো চলে যাচ্ছেন দাদা। কাদার পাহাড় দেখা তো আপনার হ'ল না।

মাথা চুলকে দাদা বললেন, না ভাই, এ যাত্রায় আর হ'ল না। আবার যখন আসব তখন—

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললাম, চলুন না, এখনই গিয়ে দেখে আসি। আপনার তো আর কোন কাজ নেই—বাবাকে বললেই গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—না ভাই, সে হয় না। এবারে কাদার পাহাড় না হয় নাই দেখলাম।

কাদার পাহাড দেখতে চায় না এমন কাউকে এ পর্যন্ত দেখিনি। কাজেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাই। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে থেকে আমি প্রশ্ন করলাম, কেন দেখবেন না, দাদা? সবাই তো দেখতে যায়।

ঈষৎ আরক্ত হয়ে ওঠে দাদার মুখখানা। একটু ইতস্তত: করে তিনি বললেন, তোমাদের বৌদির খুব দেখার ইচ্ছে ছিল। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারিনি, কাজেই ভাবছি দু-চার মাস বাদে আবার যখন আসব, তখন তোমাদের বৌদিকে আমার সঙ্গে নিয়ে এসে দু'জনে মিলে একসঙ্গে দেখতে যাব।

দাদা সদ্য-বিবাহিত। নব-পরিণীতা স্ত্রীর প্রতি সদ্য-বিবাহিতের মনোভাব কী রকম হতে পারে, তা আমার মত এগারো বছরের কিশোরের বোধগম্য না হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই দাদাকে প্রশ্ন করে বসি, আপনি একা কাদার পাহাড় দেখতে গেলে বৌদি কী রাগ করবেন?

দাদা মুচকি হেসে বললেন, শুধু রাগ! সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হবে।

দাদা আর আসেননি মিনবুতে। থীসিস লেখার ব্যস্ততায় নাকি সময়

ক'রে উঠতে পারেননি। যথাসময়ে যথাস্থানে থীসিস পেশ করেছিলেন তিনি এবং উপাধিও পেয়েছিলেন। বাবার কাছে শুনেছিলাম যে, তাঁর থীসিসটি উত্তর বর্মার তেলের ক্ষেত্রের ভূতত্ত্বের ওপরে নতুন আলোকপাত করেছে। মিনবুর তেলের ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নাকি কাদার পাহাড়ের ওপরেও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

বুঝলাম যে, না-দেখেও কাদার পাহাড়কে যেমন দেখেছেন তিনি, অনেক দেখেও আমরা তেমন দেখিনি।

হিমালয়ের সৃষ্টিরহস্য

ভারতীয় অভিযাত্রী দল এভারেস্টের শিখরে আরোহণ করেছেন। ১৯৬৫ সালের ২০শে মে থেকে ২৯শে মে, দশ দিনের ব্যবধানে পর পর চারবার তাঁরা পৃথিবীর এই উচ্চতম পর্বত-শৃঙ্গটির শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইতিপূর্বে পৃথিবীর আর কোনও অভিযাত্রী দল পর পর চারবার এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণের ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেননি। সেদিক থেকে অনন্য ভারতীয় অভিযাত্রীদের কৃতিত্ব। মানুষের গতিবিধির সীমার অনেক উর্ধ্বে তুষারে আচ্ছন্ন দুর্গমতায় তাঁদের দুঃসাহসিক পদক্ষেপে দেশসুদ্ধ সকলেই রোমাঞ্চিত।

ভারতীয় অভিযাত্রীরা এভারেস্টের আকাশছোঁয়া যে উত্তুঙ্গতাকে জয় করেছেন, তা' আমাদের বিস্মিত করে।

কিন্তু কেন এই উত্তুঙ্গতা—এই প্রশ্নের জবাব পেতে হ'লে হিমালয়ের সৃষ্টি-রহস্যকে জানতে হবে। সুনীল জলধি থেকে পাহাড়-পর্বতের উত্থানের কথা লেখা আছে বেদ পুরাণে। এই তত্ত্বটি যে পৌরাণিক কল্পনামাত্র নয়, ভূ-বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ফলে তা প্রমাণিত হয়েছে। হিমালয়, আল্‌প্‌স্‌, রকি, আন্দিজ প্রভৃতি পৃথিবীর বিশিষ্ট পর্বতমালার মধ্যে নানারকম সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ বা জীবাশ্ম (fossil) পাওয়া যায়। যে পাললিক শিলাস্তরে তারা প্রোথিত, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সমুদ্রে পলিসঞ্চিত হয়ে প্রস্তরীভূত হয়ে তাদের উৎপত্তি ঘটেছিল। অর্থাৎ যেখানে আজ পর্বতমালা আকাশ ছুঁয়েছে, সেখানে সুদূর প্রাচীনকালে সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্রে পলি জমেছিল স্তরে স্তরে। পলির স্তরে চাপা পড়েছিল সামুদ্রিক প্রাণীর শব। পলির সঙ্গে প্রাণিদেহের অবশেষ ধীরে ধীরে হয়েছিল পাথরে রূপান্তরিত। তারপর পাথরের স্তরগুলি ধীরে ধীরে মাথা তুলেছিল সমুদ্রের গর্ভ থেকে— ভূপৃষ্ঠের সীমা ছাড়িয়ে ক্রমশঃ উত্তুঙ্গ হয়েছিল পর্বতের আকারে।

সমুদ্রের স্বাক্ষর আছে এভারেস্টের শৃঙ্গে ও হিমালয়ের অন্যান্য শিখরে। সমুদ্রে-সঞ্চিত পলি ও সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ সমস্ত হিমালয়জোড়া একটি বিলুপ্ত সমুদ্রের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা এই সমুদ্রের নামকরণ করেছিলেন 'টেথিস্‌' (Tethys)। 'টেথিস্‌' সমুদ্রের মধ্যে যে-সব পলি জমেছিল, তারা পাথরে জমাট বেঁধে মাথা তুলেছে সমুদ্রের বুক ফুঁড়ে—মাথা তুলে সৃষ্টি করেছে অভ্রভেদী পর্বতমালা।

কিন্তু কী ক'রে মাথা তুলেছে, সেই প্রশ্নে ভাবিত হন ভূ-বিজ্ঞানীরা। এভারেস্ট শিখরের অমন বিপুল আকাশ-ছোঁয়া উত্তুঙ্গতা সম্ভব হতে যে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন, তার উৎসের সন্ধান করেন তাঁরা।

হিমালয়ের শিলাস্তরগুলিতে প্রচণ্ড চাপে নিষ্পিষ্ট হওয়ার ছাপ আছে। শুকিয়ে কুঁকড়ে-যাওয়া চামড়ার মতো তাদের মধ্যে ভাঁজ পড়েছে। ভাঁজের বক্রতা যেখানে উগ্র, সেখানে শিলাস্তর স্বস্থান থেকে বিচ্যুত। শিলাস্তরে চিহ্নিত চাপ হিমালয়ের শিলাস্তরগুলির অভ্যুত্থানকে সম্ভব করেছে বলে অনুমান করা হয়।

হিমালয়ের বন্ধুরতা উত্তরদিকে তিব্বতের মালভূমির সঙ্গে মিশে গেছে। মালভূমির উত্তর প্রান্তে রয়েছে কুয়েনলুন পর্বত। হিমালয়ের মত কুয়েনলুন পর্বতের পাথুরে কাঠামোও যে চাপের নিষ্পেষণে বিশৃঙ্খল হয়েছে, তার ছাপ রয়েছে তার শিলাস্তরে। একই সঙ্গে হিমালয় ও কুয়েনলুনের শিলাস্তরগুলি চাপে বিপর্যস্ত হয়েছিল ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায়। হিমালয়. তিব্বতের মালভূমি ও কুয়েনলুন—তিন মিলে গড়পড়তা প্রায় পনরো থেকে আঠারো হাজার ফুট উঁচু একটানা পার্বত্যভূমি সৃষ্টি করেছে। তাদের মধ্যে ঐক্য ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত। একই ধরনের শিলাস্তরের প্রসারে আছে একটানা একই সমুদ্রের স্বাক্ষর। উত্তরে কুয়েনলুনের উত্তর-প্রান্ত ও দক্ষিণে হিমালয়ের দক্ষিণ-প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সমুদ্র। সমুদ্রের দু'পাশের ডাঙ্গা ক্ষয়ে গিয়ে এই সমুদ্রের পলি জমেছে স্তরে স্তরে। পরে এই পলির স্তর জমাট বেঁধেছে পাললিক শিলায়।

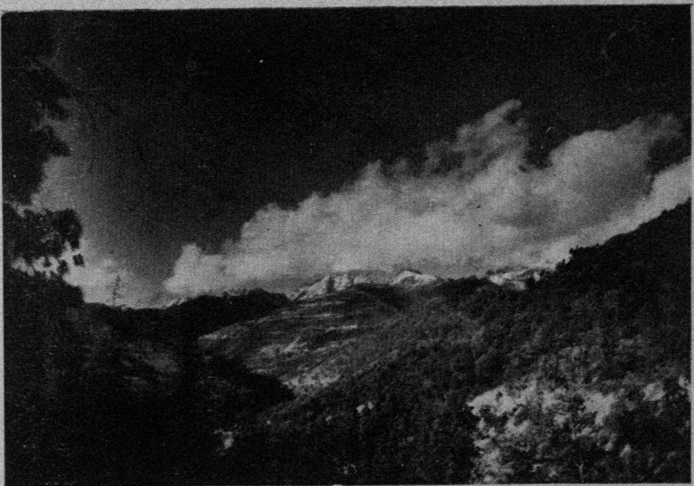
হিমালয়ের দক্ষিণে সিন্ধু-গঙ্গার জলে ধোয়া সমতলভূমি—তারও দক্ষিণে দক্ষিণ ও মধ্য-ভারত জুড়ে আছে শক্ত জমাট-বাঁধা পাথরের একটানা বিস্তার। কুয়েনলুন পর্বতের উত্তরে তারিমের সমতলভূমিও এমনি শক্ত পাথরে নিরেট। দু'পাশের কঠিন শিলার বজ্রমুষ্টিতে নিষ্পিষ্ট হয়েছিল সমুদ্রে জমা পাললিক শিলাস্তর। নরম পলির রূপান্তর ঘটেছিল হালকা পাথরের স্তরে। স্তরে স্তরে জমে বিপুল পরিমাণে স্ফীত হ'ল পাললিক শিলার রাশি। দু'পাশের নিরেট পাথরের ঠাসবুনানির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে তারা মাথা তুলতে চেষ্টা করেছিল মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে। পর্বত ও.সমতল ভূমির মধ্যে এমনি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ঝোঁককে ইংরেজীতে বলে 'Isostasy'। পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অবশ্যম্ভাবী এই উত্থান। দু'পাশ থেকে চাপ এসে উত্থানের বেগকে দেয় বাড়িয়ে। এই চাপ চিহ্নিত আছে পাথরের স্তরে।



হিমালয়ে বরফের আচ্ছাদন
আলোকচিত্র—সুনীল সেনশর্মা।



হিমালয়-কুমেরুর পর্বতমালাকে
চিরে ফেললে যেমন দেখাবে (হিমালয়ের
সৃষ্টিরহস্য)



তুষার-কিরীটী হিমালয় (হিমালয়ের সৃষ্টিরহস্য)
আলোকচিত্র—সুনীল সেনশর্মা

চাপ শুধু দু'পাশ থেকে নয়, নিচের দিক থেকেও মাথা চাড়া দেয়। ফলে শিলাস্তরগুলির উর্ধ্বগতি হয় তীব্রতর।

চাপে প'ড়ে শিলাস্তরগুলি ওপরের দিকে যেমন ওঠে, তেমনি নিচের দিকেও নেমে যায়। নিচে নেমে ভূগর্ভের পাথরের বেষ্টনীতে গাঁথা পড়ে। ভূগর্ভে প্রোথিত পর্বতের নিম্নাঙ্গ হ'ল তার মূল।

শিলাস্তরগুলির উত্থান কোটি কোটি বছর ধরে চলে। হিমালয়ের স্তরে চিহ্নিত আছে তার উত্থানের ইতিহাস। তা' থেকে মোটামুটি সময়ের হিসাবও মেলে। প্রায় সাত কোটি বছর আগে টেথিস্ সমুদ্রের গর্ভ থেকে শুরু হয়েছিল সমুদ্রে-সঞ্চিত শিলাস্তরগুলির উত্থানের পালা। একটানা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি বছর ধ'রে উঠতে উঠতে প্রায় দেড় কোটি বছর আগে মোটামুটি এখানকার উচ্চতায় তারা উপনীত হয়েছে। উর্ধ্বগতি অবশ্য থামেনি কখনো। এখনো চলছে। প্রতি বছরেই অল্পস্বল্প করে উঁচু হচ্ছে হিমালয় পর্বত। মাঝে মাঝে ভূমিকম্পের ধাক্কায় উত্থানের বেগ বেড়েও যায়।

যে-চাপে শিলাস্তর অবিন্যস্ত হয়ে পর্বত সৃষ্টি করে, তার উৎসেরও সন্ধান করেছেন ভূ-বিজ্ঞানীরা।

ভূগর্ভে পৃথিবীর কেন্দ্রে তাপ এত বেশি যে, সেখানে লোহা, নিকেল প্রভৃতি ধাতু একটি গলিত গোলক সৃষ্টি করেছে। এই তপ্ত বৃত্তের প্রভাবে তার আশে পাশের জড় পাষাণস্তূপ সর্বদা গরম হয়ে থাকে। তেজস্ক্রিয় খনিজ থেকে বিকীর্ণ তেজ এই গরম পাথরকে গলিয়ে দেয়। গলানো পাথরকে বলে 'ম্যাগমা' (Magma)। অগ্ন্যুদ্গারের সময় আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে যখন এই গলিত শিলারাশি বেরিয়ে আসে, তখন তাকে 'লাভা' (Lava) বলে জানি। তাপের প্রভাবে ম্যাগমার মধ্যে উর্ধ্বমুখী ও নিম্নগামী স্রোতের (Convectional current) আবর্তন চলে। ম্যাগমার আলোড়ন ওপরকার পাথরের স্তরগুলিতে আঘাত হানে। নিম্নগামী স্রোত শিলাস্তরকে নিচের দিকে টেনে আনতে চায়। এই স্রোতের বেগে চারপাশে পাথরের বেষ্টনী বিদীর্ণ হতে চায়। ফলে ওপরের শিলাস্তরগুলিতে চাপ পড়ে—তাদের বিন্যাস হয় বিশৃঙ্খল। ম্যাগমার আলোড়ন থেকে উদ্ভূত এই দুর্বার শক্তিই পর্বত সৃষ্টিতে সক্রিয়।

এই শক্তি যে কখনো নিষ্ক্রিয় নয়, তার প্রমাণ হ'ল ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্নিপ্রবাহ। এই শক্তির প্রভাবে হিমালয় অল্প অল্প ক'রে এখনো উঁচু হচ্ছে।

অবশ্য ঊর্ধ্বগতিরও সীমা আছে। সংশ্লিষ্ট ভূস্তরের সঙ্গে ভারসাম্য এসে গেলে হিমালয়ও শান্ত হবে—প্রায় সাত কোটি বছর ধ'রে যে ঊর্ধ্বগতির পালা চলছিল, তার অবসান হবে। তারপর থেকে চলবে শুধু ক্ষয়ের পালা—নদী, বরফ ও বাতাসের ক্রিয়ায়।

নদীর স্রোত, বরফের ধারা ও বাতাসের প্রবাহের প্রভাবে হিমালয়ের ক্ষয় অবশ্য একটানা চলেই আসছে উত্থানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। হিমালয়ের পাথরের কাঠামোটাকে চূর্ণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তারা। এই ক্ষয়ের অবশেষ হ'ল পলিমাটি। সিন্ধু-গঙ্গার সমতলভূমি জুড়ে জমছে তা'। সমতলভূমিতে জমেও অবশ্য উদ্বৃত্ত থাকছে। সেই উদ্বৃত্ত পলি সমুদ্রে গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে।

একদিকে হিমালয়ের অবক্ষয়, অন্যদিকে সমতলভূমি ও সমুদ্রের বুকে সঞ্চয়—এমনি ক'রে অতি সূক্ষ্ম গতিতে রচিত হচ্ছে আর এক হিমালয়ের ভূমিকা বর্তমান হিমালয়কে লয় ক'রে। কোটি কোটি বছর পরে অভ্রভেদী হিমালয় নেমে আসবে সমতল ভূমির কাছাকাছি—তার ক্ষয়ের অবশেষে পরিপুষ্ট বঙ্গোপসাগর, সাগর ও সমতল ভূমিতে শুরু হবে আর এক পর্বতের উত্থানের পালা। হিমালয়ের গুরুভারের স্থানান্তরে ভূস্তরের ভারসাম্য যাবে ঘুচে। সমুদ্র ও সমতলে অতি সঞ্চয় হালকা-হয়ে-আসা হিমালয়ের সঙ্গে নতুন সামঞ্জস্য খুঁজবে। তার ফলে সঞ্চিত পলির স্তরগুলি চাইবে মাথা তুলতে—তার উত্থানকে বেগ দেবে ভূগর্ভে আবর্তিত আলোড়ন।

কিন্তু সে সুদূরতম ভবিষ্যতের ব্যাপার, যা আমাদের কল্পনাতেও আসে না—সময়ের মাপকাঠিতে বহু কোটি বছর। ততদিনে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষের কী রূপান্তর ঘটবে, তা' বলা যায় না। আপাততঃ আমাদের চোখে হিমালয়ের অভ্রভেদী মহিমার ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই।

স্তর

আমার একজন ভূবিজ্ঞানী বন্ধুর বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছিলেন তার বাপ-মা। ছেলে ভাল চাকরি করে, পদমর্যাদায় বিশিষ্টতা আছে—কাজেই আশা করা গিয়েছিল যে অর্ধেক রাজত্বসুদ্ধু রাজকন্যা অনায়াসে তাঁদের করায়ত্ত হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, ছেলের বাপ-মা হিসেবে তাঁদের চাওয়ার মধ্যে যে দুর্নিবার চৌম্বক শক্তি থাকার কথা, তা' নেই।

অনেক কন্যার পিতা বললেন, আমার অমন আদরের মেয়ে—কোন্ প্রাণে তাকে একজন জিয়োলজিস্ট-এর সঙ্গে বিয়ে দেব, বলুন। মেয়ের আমার মাটিতে পা পড়ে না, বন-বাদাড়ে ক্যাম্প-এ কী ক'রে থাকতে পারবে!

আর একজন আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে এসে বললেন, তুমি কিসের বিশেষজ্ঞ, বাবা? মানে, বিশেষভাবে কী নিয়ে কাজ করছ?

বন্ধু জবাব দিল, আজ্ঞে, কয়লা।

ভদ্রলোক শিউরে উঠে বললেন, কয়লা! বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বতে অশেষ দুঃখকষ্ট সয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কয়লার মত নোংরা জিনিসের জন্য—যা আমাদের বাড়িতে ঝি-চাকর ছাড়া কেউ ছোঁয় না! আমি ভেবে পাইনে বাবা, তোমার মতো বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছেলে স্বেচ্ছায় সুস্থ মস্তিষ্কে কী করে এই ধরণের উৎকট পেশা বেছে নিলে।

এরপর যাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হ'ল, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত ভূতাত্ত্বিক। তিনি আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে এসে বললেন, দেখ, আমি নিজে জিয়োলজিস্ট ছিলাম। কাজেই এই পেশাটা সম্পর্কে আমার কোন মোহ নেই। ভূতাত্ত্বিকদের বৃত্তিটা বাইরের লোকেদের কাছে সে-রকম পরিচিত নয়। জীবিকা-অর্জনের ক্ষেত্রে তারা নানা রকম স্তরের লোকেদের দেখছে, কিন্তু এই ভূতাত্ত্বিকদের যে ঠিক কোন্ স্তরে ফেলবে, তা' তারা জানে না। কাজেই বুঝতেই পারছ—

ভদ্রলোকের অসমাপ্ত কথার অকথিত অংশটুকু অনুমান ক'রে নিয়ে আমার বন্ধু যত না আহত বোধ করল, ততোধিক আঘাত পেলাম আমরা। কারণ আমরা ভূতাত্ত্বিকরা খুব স্তর-সচেতন জীব।

লোকালয়ের বাইরে নির্জন বনে-পাহাড়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুচর পরিবৃত হয়ে থাকলেও নিজেদের বিশিষ্টতা কল্পনা করতে ভালবাসে ভূতাত্ত্বিকরা। জনতায়

হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই, কাজেই অধস্তনদের শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও ভয়—তাদের আর পাঁচজনের সমতলভূমি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বসায় অনেকখানি উঁচুতে। তাদের সঠিক স্থানটি কোথায় সে-সম্বন্ধে তাদের নিজেদের ধারণা কদাচ অস্পষ্ট নয়।

ভূতাত্ত্বিকরা নাগরিক কৃত্রিমতার বাইরে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে বিচরণ ক'রে বেড়ালেও তাদের বৃত্তিগত স্তর-সচেতনতার মধ্যে বিচিত্রভাবে জমাট বেঁধে থাকে তারা পাথরের পুঞ্জের মতো।

তা' ছাড়া ভূতাত্ত্বিকদের পেশাই হ'ল মাটি-পাথরের স্তরগুলির রহস্য উন্মোচন। প্রকাশ্য পৃথিবী ও প্রচ্ছন্ন ভূতল যে-সব পাথর দিয়ে গ'ড়ে উঠেছে, তাদের চিনে নেওয়াটাই যথেষ্ট নয়, তাদের স্তরগুলির বিন্যাসকে জানা চাই। শিলার স্তরে স্তরে বিরাজ করছে পৃথিবীর সংগঠনের ইতিহাস।

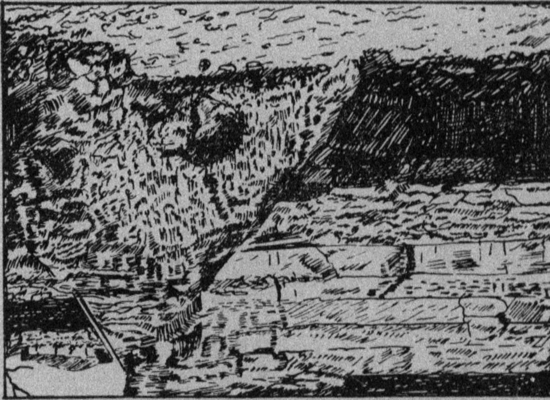
স্তরে স্তরে বিন্যস্ত শিলাকে বলে পাললিক শিলা। কিন্তু পাললিক শিলাকে চিনতে হ'লে চিনতে হবে আগ্নেয় এবং পরিবর্তিত শিলাকে।

পৃথিবীর সংগঠক পদার্থগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে প্রথমেই আগ্নেয় শিলার সাক্ষাৎ মেলে। পৃথিবীর ওপরকার সামান্য কয়েক মাইল পুরু ভূত্বকের নিচে আগ্নেয় শিলার একটানা রাজত্ব—সমুদ্রের তলেও তার প্রসার। পৃথিবীর সৃষ্টি যেভাবেই হোক না কেন, আদি পৃথিবী ছিল তপ্ত গলিত পদার্থের একটি পিণ্ড। এই গলিত মৌল পদার্থকে বলে 'ম্যাগমা' (Magma)। গলিত তরল অবস্থা থেকে পৃথিবী জড়ীভূত হয়ে গেলেও গলিত ম্যাগমা ভূগর্ভের অতলে এখনো প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের সময় এই ম্যাগমা-র বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাঝে মাঝে, যাকে বলা হয় 'লাভা' (Lava)। উৎপত্তির পর পৃথিবী যখন ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তখন ম্যাগমা জড়ীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছিল আগ্নেয়শিলা—প্রাথমিক শিলাও বলা চলে।

আদিম তরল অবস্থা থেকে জড়ত্বে উপনীত হওয়ার পর ক্রমশঃ সৃষ্টি হ'ল জল ও বায়ুর। প্রাথমিক জলবায়ু সম্ভবতঃ এখনকার তুলনায় অধিকতর রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন ছিল—যার ফলে তখনকার আগ্নেয় শিলাপুঞ্জ অবক্ষয়ের কবলিত হ'ল প্রবলভাবে—ভাঙনের ক্রিয়ায় হ'ল চূর্ণ-বিচূর্ণ, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হ'ল দ্রবীভূত। শিলাচূর্ণগুলি জলে বা বাতাসে পরিবাহিত হয়ে জমা হ'ল বিশেষ বিশেষ আধারে। রাসায়নিকভাবে গলে যাওয়া পদার্থগুলিও সঞ্চিত হ'ল সেখানে। কালক্রমে এই সব সঞ্চিত শিলাচূর্ণগুলি জড়ীভূত হয়েছে রকমারি শিলাস্তরে—যাদের বলা হয়েছে পাললিক শিলা।



স্তরীভূত শ্বেতপাথর, নর্মদা নদী, জব্বলপুর (স্তর)
আলোকচিত্র—এম. এস. আনন্দ



শিলাস্তরে চ্যুতি (স্তর)

আগ্নেয় বা পাললিক শিলা ভূগর্ভের আলোড়নের ফলে ভূত্বকের নিচে প্রোথিত হয়ে ভূগর্ভের চাপ ও তাপের কবলিত হয় এবং ফলে অংশতঃ বা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। মৌল বৈশিষ্ট্য বদলে গিয়ে সৃষ্টি হয় নূতনতর শিলার। তার নামকরণ করা হয়েছে পরিবর্তিত শিলা।

পাললিক শিলার বিশেষত্ব হ'ল তার স্তরবিন্যাস। কোটি কোটি বৎসর আগেকার উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর অবশেষ (জীবাশ্ম) তার স্তরে স্তরে সংরক্ষিত হয়। পৃথিবী ও জীব-জগতের বিবর্তন ও ক্রম-বিকাশের ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে তার বিভিন্ন স্তরে।

স্তরীভূত পাললিক শিলা আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাকে বৈজ্ঞানিক-ভাবে অনুবর্তনের প্রেরণা দিয়েছে। ক্রমই যে প্রকৃতির নিয়ম এবং সভ্যতা যে স্তরে স্তরে নির্মিত হতে থাকে, তার শিক্ষাও সম্ভবতঃ এই পাললিক শিলার স্তরবিন্যাস থেকে লাভ করেছি।

মধ্য-প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লার সন্ধানের কাজে ব্যাপৃত ছিলাম আমরা। কয়লাও পাললিক শিলার পর্যায়ে পড়ে। কোটি কোটি বছর আগেকার গাছপালার অবশেষ থেকে তার সৃষ্টি—বেলেপাথর বা কাদাপাথরের সঙ্গে স্তরীভূত হয়ে আছে।

শাডোল জেলার কোৎমা নামে ছোট শহরটির কাছে চারটি কয়লার স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। প্রত্যেকটি স্তরের বৈশিষ্ট্যকে চিনে নিয়ে তার বিস্তৃতিকে অনুসরণ করছিলাম আমরা। জায়গায় জায়গায় ড্রিলিং ক'রে এই বিস্তারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আহরণ করা হচ্ছিল।

কাজটা খুব সহজ নয়। প্রত্যেকটি স্তরের বিন্যাসের বৈচিত্র্য থেকে অন্য স্তরগুলি থেকে তাকে তফাত করতে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন।

পরস্পরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে প্রত্যেকটিকে আলাদা ক'রে চিনে নেওয়া ভূবিজ্ঞানীর অবশ্য কর্তব্য। কোন্ স্তরটা নিচের, কোন্‌টা উপরের, সঠিকভাবে জানা না হ'লে একটিকেও আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়।

কাজেই বিশেষভাবে স্তর-সচেতন না হয়ে উপায় ছিল না আমাদের।

পাললিক শিলার স্তরগুলির মতো জাতিভেদ, ধর্মভেদ, বর্ণভেদ, অর্থনৈতিক ভেদ ও পদমর্যাদা অনুযায়ী নানারকমের স্তরবিন্যাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত। পরস্পরের পার্থক্য মেনে নিয়ে সহজ আদান-প্রদানের জন্য মৌখিক আগ্রহ প্রকাশ করলেও যে যার নিজস্ব জায়গাটিতে অচলায়তনের মত বিরাজ ক'রেই

স্বস্তিবোধ করি আমরা। কদাচিৎ আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ মেলে সেই শুভবুদ্ধির, যা সকলকে এক করে। পাললিক শিলার স্তরগুলির মধ্যে উপরেরটির সঙ্গে যেমন নিচেরটির সমন্বয় বা অন্বয় সম্ভব নয়, তেমনি সমাজের উপরতলায় যার বাস, সে কখনো আন্তরিকভাবে মিলতে পারে না নিচের তলার লোকের সঙ্গে,—সমাজ-সংস্কারকরা যত চেষ্টা করুন না কেন।

কোৎমার কয়লা-ক্ষেত্রে কয়লার চারটি স্তরের মধ্যে উপরেরটির বিস্তার বেশী দূর পর্যন্ত প্রমাণ করা যায়নি। খুব সীমাবদ্ধ আয়তনের মধ্যেই তার অস্তিত্ব। অথচ নিম্নতন তিনটি স্তর অনেকখানি জায়গা অধিকার ক'রে আছে।

উপরের স্তরটির এই সীমাবদ্ধতা আমাদের শিবিরের উচ্চতম ধাপের ভদ্রলোকটির নৈঃসঙ্গবোধের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল। পদমর্যাদার নিরিখে তাঁর সমপর্যায়ের কেউ ছিল না ক্যাম্প-এ, কাজেই নিজের জাত-বাঁচাবার জন্য তাঁর একা থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

অবশেষে তাঁর সমস্তরের আর একজন এসে তাঁর নিঃসঙ্গতা ঘোচালেন। তাঁর একক অস্তিত্বের পরিধি কিছুটা বাড়ল, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেল তাঁর গতি-বিধির ভূগোল। তাঁর নিজস্ব গণ্ডী অতিক্রম ক'রে তাঁকে দেখা যেতে লাগল তাঁর সহকর্মীর সাহচর্যের মধ্যে।

স্পষ্ট দেখা গেল যে, কোৎমার উর্ধ্বতন কয়লার স্তরটির সঙ্গে তাঁর এই পার্থক্য রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছে করলে নিজেকে প্রসারিত করতে পারেন। মনে মনে আমরা ভরসা পেলাম যে, ভবিষ্যতে কখনো হয়তো তিনি তাঁর গণ্ডী অতিক্রম ক'রে তাঁর সঙ্কীর্ণ আপনের ঢাকনা খুলে আমাদের সকলের সাহচর্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন।

ঝোঁক

অধ্যাপকের বক্তৃতা পুরোপুরি টুকে নিতে পারে নি ব'লে আমার খাতা কপি ক'রে নিচ্ছিল চ—।

আমি বললাম, আগাগোড়া কার্বন কপির মত কপি ক'রে যাচ্ছো কেন? ভুল-টুলও তো থাকতে পারে।

চ— নির্বিকারভাবে বললে, তা' পারে। কিন্তু তা' ধরতে হ'লে মস্তিষ্ককে যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় ক'রে তুলতে হয়। অথচ আমার মতোই আমার মস্তিষ্কও আলস্যের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে সর্বদা। তার ঘুম ভাঙ্গাই, এমন সাধ্য নেই। তার চেয়ে, তুমিই বরং সংশোধন ক'রে দিও এক সময়- আমি তোমার শোধরানোটাকে টুকে নেব।

ব'লে সে আবার কপি করতে থাকে।

আমি বললাম, একটানা দিব্যি তো লিখে যাচ্ছ। কলমও জোর কদমে তর-তরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্লাসের লেকচার টুকে নেওয়ার সময় তোমার কলম খোঁড়া হয়ে পড়ে কেন?

চ— বললে, লেকচারে মন দিতে পারি না, তাই।

—মন যখন দিতে পারছ না, তখন জিওলজি ছেড়ে অন্য কোন বিষয় নিয়ে দেখ না, তা' তোমার মনোমত হয় কিনা।

—অসম্ভব। মন আমার গুটিয়ে বসে আছে। তাকে আর কোটর থেকে বের ক'রে নিয়ে কোনও 'লজি'-র দিকে ঝোঁকাতে পারব বলে মনে হয়নি।

—কোনও দিকে ঝোঁক যখন নেই, তখন হঠাৎ জিয়োলজির দিকে ঝুঁকলে কেন?

—পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়াটা বাবা বরদাস্ত করতে পারবেন না ব'লে।

—কিন্তু আর সব বিষয়কে বরখাস্ত ক'রে জিয়োলজি-কে বরদাস্ত করা কেন?

মাথার চুলগুলোকে বাঁ-হাতের আঙুল দিয়ে এলোমেলো করতে করতে চ— বললে, তা' ঠিক বলতে পারব না। প্রস্পেক্টাসের মধ্যে নানান বিষয়ের তালিকায় 'জিয়োলজি' শব্দটি আমার ভাল লেগেছিল। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জুওলজি, ফিজিওলজি, এ্যানথ্রপলজি ইত্যাদির তুলনায় জিয়োলজি শব্দটি রীতিমত শ্রুতিমধুর, কী বল?

আমি বললাম, কী জানি ভাই। শ্রুতিমাধুর্য বিবেচনা ক'রে তো আমি বিষয় নির্বাচন করিনি।

—বিশেষ কিছুতে যখন ঝোঁক নেই, যে-কোনও একটাতে ঝুঁকলেই হ'ল। জিয়োলজি আমার এই যে-কোনও একটা। এর বদলে ফিজিক্স্ বা ফিজিওলজি-ও হতে পারত। তাতেও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হত না। বাবা অবশ্য আমার এই বিষয়বিশেষে ঝোঁকের অভাবকে আমার মগজের ঘিলুর অভাব ব'লে ধ'রে নিয়েছেন। আমার হাল দেখে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। অতএব বে-হাল নৌকোর মত ভাসছি।

—তা' না হয় ভাসছ। কিন্তু স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে কোথায় যে উধাও হবে তা ভেবে দেখেছ ?

—উহু, সে ভয় নেই। মজা পুকুরের মধ্যে ভাসছি। ভেসে উধাও হবার ভয় নেই।

ক্লাসে সেদিন পাথরের গঠন সম্পর্কে আমাদের পঠন-পাঠন চলছিল। পাথর দিয়ে পৃথিবী গড়া। মাটির চাদর মুড়ি দিয়ে পাথরের পিণ্ডগুলো জমাট বেঁধে আছে। মাটির ওপর থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত যদি একটানা একটা সুড়ঙ্গ খোঁড়া যেত, তা' হলে পৃথিবীর ভেতরকার প্রচ্ছন্ন স্বরূপটি পর পর যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হত, তার কথা বলছিলেন আমাদের অধ্যাপক মশাই। ভূগর্ভের রহস্যভেদের জন্য এমনি সুড়ঙ্গ খোঁড়া অবশ্য সম্ভব নয়। ভূমিকম্পের কম্পনের তরঙ্গগুলি পৃথিবীর ভেতরে ঢুকে ভেতরকার খবর বের ক'রে নিয়ে আসে। পৃথিবীর অন্তর্নিহিত তথ্য আমাদের বুদ্ধিগম্য করার জন্য কাল্পনিক সুড়ঙ্গের আশ্রয় নিয়েছিলেন অধ্যাপক।

সুড়ঙ্গের অগ্রগতি প্রথমে মাটির আবরণকে ভেদ করে। পৃথিবীর ওপর থেকে ভেতরকার কেন্দ্রের বিপুল দূরত্বের তুলনায় খুবই নগণ্য এই মৃত্তিকার স্তর। খুব বেশি হ'লেও প্রায় দশ হাজার ফুট। মাটির প্রাধান্য বড় বড় নদীর অববাহিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। পাহাড়ী অঞ্চলে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুটের বেশি মাটি নেই। কিন্তু স্বল্প মাটি বিপুলপ্রসারী জীবনের আধার। গাছপালাই শুধু নয়, স্থলের প্রাণীমাত্রই মাটি থেকে জীবনীশক্তি আহরণ করে। মাটির নিচে আছে বেলেপাথর, কাদাপাথর, চুণাপাথর জাতীয় শিলা। এককালে তারা মাটির সগোত্র ছিল। পাথর ক্ষয় হয়ে যে শিলাচূর্ণের সৃষ্টি, তা' একদিকে যেমন মাটি সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমনি তা' পাথরে জমাট বাঁধে। পাথরের চূর্ণ জলে



স্তরীভূত শিলার ঝোঁক (ঝোঁক)



ঝুঁকে থাকা বেলে-পাথরের স্তর (ঝোঁক)

পরিবাহিত হয়, বাতাসেও। অনুকূল আধারে তা' জমে। ঘোলা জল বা বাতাস থেকে মাটি ও পাথরের কণা স্তরে স্তরে থিতিয়ে পড়ে। তাকে 'পলি' ব'লে জানি আমরা। 'পলি' প্রস্তরীভূত হ'লে তাকে বলে পাললিক শিলা। স্তরে স্তরে এর সৃষ্টি।

পাললিক শিলার নিচে আছে গ্র্যানাইট ও ব্যাসল্ট। সূর্য থেকে উৎপন্ন পৃথিবী ছিল গলিত আগুনের পিণ্ড। সেই অগ্নিপিণ্ড ঠাণ্ডা হয়েই গ্র্যানাইট, ব্যাসল্ট ইত্যাদি শিলার সৃষ্টি। এরা মূল বা প্রাথমিক শিলা। গলা আগুন থেকে তাদের সৃষ্টি ব'লে তাদের আগ্নেয়শিলা বলে। পৃথিবীর ভেতরে প্রায় আঠারোশো' মাইল পর্যন্ত আগ্নেয়শিলার ঠাসবুনানি। ভারী পাথর ও ধাতুতে মিলে কঠিন কাঠামো রচিত। তারও নিচে লোহা ও নিকেল-এ গড়া পৃথিবীর শাঁস। প্রায় চার হাজার মাইল তার ব্যাস। প্রচণ্ড চাপ ও তাপের প্রভাবে কেন্দ্রের এই জমাট-বাঁধা লোহা-নিকেল-এর গোলকটি গলিত। এই গলিত কেন্দ্রকে ঘিরে আছে কঠিন পাথরের চক্রগুলি।

পৃথিবীর ওপরের দিকে, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ মাইলের মধ্যে যে সব আগ্নেয় শিলা আছে, জল ও বাতাসে তারা ভাঙ্গে। তাদের ভগ্নাবশেষ দিয়ে গ'ড়ে ওঠে মাটির আবরণ ও পাললিক শিলার স্তর। এই ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যেই অবশ্য প্রকৃতির ক্রিয়া সীমাবদ্ধ নয়। যাকে ভাঙ্গছে বা গড়ছে, তার প্রসাধনেও প্রকৃতি তৎপর। প্রসাধনের ফলে মূল রূপ যায় বদলে, গ'ড়ে ওঠে নতুন ধরনের শিলা। তাকে পরিবর্তিত শিলা বলে। আমূল পরিবর্তন অবশ্য ঘটে না। মূল শিলার চিহ্নগুলি থেকে যায়।

অধ্যাপক আমাদের বোঝান যে, সব শিলার মধ্যে পাললিক শিলা বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। কারণ, স্তরে স্তরে গ'ড়ে উঠে পৃথিবীর সংগঠনের ইতিহাসের বিভিন্ন ক্রমগুলিকে ধ'রে রাখে পাললিক শিলার স্তর-বিন্যাস।

তিনি বলেন যে, পাললিক শিলার স্বরূপকে চিনলেই তাকে সম্পূর্ণ জানা হয় না। তাকে পুরোপুরি চিনতে হ'লে তার গড়ন বা বিন্যাসকে জেনে নেওয়া চাই। পাললিক শিলার বিন্যাসের রহস্যকে বুঝতে হ'লে সবচেয়ে আগে সঠিকভাবে দেখতে হবে শিলান্তরটি কোন্ দিকে ঝুঁকে আছে। যেদিকে ঝুঁকে আছে, সেদিকে তার প্রসার। মাটির নিচে প্রচ্ছন্ন থাকলেও এই ঝোঁক থেকে তার বিস্তারকে অনুমান করা চলে নিভুলভাবে।

যেমন ধরা যাক মাটি ও পাথরের আবরণে লুকোনো একটি কয়লার স্তর।

নদী ও নালা যেখানে মাটি ও পাথরের আবরণকে বিদীর্ণ করেছে, সেখানে তা' ঈষৎ উন্মোচিত। সেখানে সংশ্লিষ্ট বেলেপাথর বা কাদাপাথরের সঙ্গে তার সহাবস্থানের আভাস মেলে। সেখানে তার ঝোঁকটা কোন্‌দিকে নিরূপণ করতে পারলে, কোন্‌দিকে তার প্রসার বুঝতে অসুবিধা হয় না। কয়লার স্তরের ঝোঁক জানতে পারলে খনি পত্তনের ঝুঁকি নিতে পারেন খনিবিদ্‌রা।

নদী, নালা বা পাহাড়ের গায়ে উন্মোচিত সীমাবদ্ধ সাক্ষ্য থেকে কোনও বিশেষ শিলাস্তরের সামগ্রিক রূপটি জানা সব সময় সম্ভব হয় না। কারণ, শিলাস্তরের বিস্তার মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত হয় শিল্যচ্যুতির দরুণ। এ হেন অবস্থায় জায়গায় জায়গায় মাটি-পাথরের আবরণকে ড্রিলিং ক'রে বিদীর্ণ ক'রে ভেতরকার খবর নিতে হয়। কত নিচে শিলাস্তরটি আছে, কয়েকটি জায়গায় ড্রিলিং ক'রে জেনে নিলে নির্ভুলভাবে জানা যায় তার ঝোঁক।

শিলাস্তর কোন্‌দিকে কতখানি হেলে থাকবে, পলি সঞ্চয়ের মূল আধার তা' নিয়ন্ত্রণ করে। নদীর গতিপথ, হ্রদ বা সমুদ্র, যেখানেই পলি জমুক না কেন, তাদের ভূগোল পলির স্তরে স্তরে প্রতিফলিত। নদী, হ্রদ বা সমুদ্রের খাতের ঢালের দিকে পাথরের স্তর ঝুঁকে থাকে। এইসব নদী, হ্রদ, সমুদ্র আজ নিশ্চিহ্ন।—কিন্তু তাদের স্বরূপ ছাঁচের মতো তোলা আছে সঞ্চিত পলির পরতে পরতে।

অধ্যাপনা করতে করতে হঠাৎ চ—এর অন্যমনস্কতা অধ্যাপকের নজরে এল। বক্তৃতা থামিয়ে তার উদ্দেশে তিনি বললেন, মনে হচ্ছে আমার কথায় তুমি পুরোপুরি মন দিচ্ছ না। বোধহয় আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না।

আমতা আমতা ক'রে চ— বললে, বুঝতে পারব না কেন ? আসল কথাটা ঠিকই বুঝেছি।

অধ্যাপক গম্ভীরমুখে বললেন, আসল কথাটা কী শুনি ?

একটু ভেবে নিয়ে চ— বললে, আসল কথাটা হচ্ছে, প্রথমতঃ ঘোলা জল থেকে থিতিয়ে পলি জমে।

চ—এর মুখের পানে তীব্র দৃষ্টি হেনে অধ্যাপক বললেন, শুধু পলি কেন, তোমাকেও থিতিয়ে প'ড়ে জমে যাওয়া ব'লে বোধ হচ্ছে।

অধ্যাপকের কথায় কর্ণপাতমাত্র না করে চ— ব'লে চলে, তা' ছাড়া পাথর সম্বন্ধে সবচেয়ে জরুরী কথা হচ্ছে তার ঝোঁক। কোন্‌দিকে তা' ঝুঁকে আছে জানতে পারলেই তার রহস্য জানা যায়।

অধ্যাপক বললেন, তোমার ঝোঁক কোন্‌দিকে জানতে পারলে তোমার রহস্যও বুঝতে পারতুম আমি। মনে হচ্ছে, ঝোঁক তোমার যেদিকেই থাক না কেন, আমি যা শেখাচ্ছি তার দিকে নেই।

চ— মুখ কাঁচুমাচু ক'রে চুপ ক'রে বসে থাকে।

ঝোঁক না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি পাশ করতে চ—এর কোন অসুবিধে হয়নি। শেষ পরীক্ষার বেড়া ডিঙ্গিয়ে কর্মক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হই আমরা। তারপর কেউ কেউ উচ্চতর শিক্ষার ঝোঁকে বিদেশযাত্রার প্রয়াসী হয়। কেউ কেউ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আয়োজন। অধিকাংশই অবশ্য সরকারী বা বেসরকারী সংস্থায় চাকরির উমেদারিতে লিপ্ত হয়। শুধু চ— কিছুই করে না। গড়িয়ে গড়িয়ে পরীক্ষার বেড়া ডিঙ্গিয়ে এসে কর্মহীন নির্লিপ্ততার মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করে সে। কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই তার, তাগিদ নেই জীবিকা-অন্বেষণেরও। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন সে। সবাইকে সে ব'লে বেড়ায়, এখন পর্যন্ত খাওয়া-পরার অভাব যখন নেই, তখন কী হবে কাজকর্ম করে। দুনিয়াসুদ্ধ সকলেই তো কাজ নিয়ে আছে, আমি আমার আলস্য নিয়ে থাকলে কারুর কোন ক্ষতি তো নেই।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত পারেনি চ— কর্মহীনতার মধ্যে মুক্ত থাকতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক সে কিছু করছে না জেনে তাকে তাঁর গবেষণার কাজের সহকারী ক'রে নিলেন। মাসিক যৎসামান্য বৃত্তির বিনিময়ে অধ্যাপকের নির্দেশ অনুযায়ী সামান্য কিছু কাজ। পরিশ্রমও নেই, মাথাও খাটাতে হয় না। চ— দেখল যে কর্মহীনতার গ্লানির চেয়ে কোনও একটি কাজের তকমা এঁটে অবস্থান করাটাই অনেক নিরাপদ। গবেষকের সহকারিত্বের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার অবকাশ আছে। খুশি হয়ে চ— আমাকে বললে, কাজ নেই, আমার যোগ্য এমন কাজ থাকতে পারে ভাবিনি আমি। অধ্যাপক যা বলেন অক্ষরে অক্ষরে সেটুকু ক'রে গেলেই হ'ল—তার বাইরে কিছু নেই।

আমি নিজে কর্মস্রোতে ভাসতে ভাসতে কলকাতা শহর থেকে অনেক দূরে চলে এলাম। যোগাযোগ রইল না বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে। চ—এর সঙ্গেও না। ছাত্র-জীবনের সৌহার্দ্য কর্মজীবনের তাপে গেল শুকিয়ে। দৃষ্টির আড়ালে রইল না বন্ধুত্বের দাবি। অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে হঠাৎ প্রাক্তন বন্ধুদের কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বুঝতাম যে, অন্তরের অন্তরঙ্গতার ক্ষেত্রে কোন টান পড়ছে না। হৃদয়ে হৃদয়ে আদান-প্রদানের পথ পেতাম না খুঁজে। ভব্যতার মুখোশ প'রে

সভ্যতার ভাণ ক'রে ভদ্রতা রক্ষা হয় শুধু। জীবন ক্রমশঃ হয়ে উঠল জীবিকা।

সেবারে মধ্য-প্রদেশের রেওয়া অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক সন্ধানে রত ছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে একটি চূণাপাথরের খনিতে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল চ—এর সঙ্গে।

প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি। কলকাতার বাইরে চ—এক পাও যাবে না বলেই জেনে এসেছি। সে আমাকে একদা বলেছিল যে, কলকাতার সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেকটা শামুকের সঙ্গে তার বাইরের শক্ত খোলার মতো। কলকাতার সীমা ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপায় নেই তার।

কাজেই চ—কে দেখে প্রথমে ভাবলাম এ-বুঝি চ—নয়, আর কেউ। চ— এক গাল হেসে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললে, কী ভাই, আমাকে চিনতে পারছ না?

আমি বললাম, চিনতে পারছি—কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি যে কলকাতা ছেড়ে রেওয়াতে আসবে, এ তো কল্পনাও করিনি কখনো।

চ—বললে, কোন এক কবি বলেছেন না যে মাঝে মাঝে বাস্তব সত্য অবাস্তব, কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর হয়ে দাড়ায়।

আমি বললাম, কিন্তু যে কোনও বাস্তব ঘটনার পেছনে স্পষ্ট কার্যকারণ থাকা চাই। তোমার ক্ষেত্রেও কি হয়েছিল জানতে ইচ্ছে করে।

—ঈষৎ হেসে বললে, অঘটন ঘটেছিল। কখনো কোনও দিকে ঝুঁকি নি, জানই তো উদাসীন প্রকৃতির মানুষ আমি, হঠাৎ নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। তার ফল হ'ল সাংঘাতিক। সীমাবদ্ধতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলাম—ছাড়তে হল নিজের অভ্যস্ত বৃত্ত—আসতে হ'ল কলকাতা ছেড়ে।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি—ব্যক্তিবিশেষটি কে, জানতে পারি কি?

—নিশ্চয়ই পার। একটি মেয়ে কলকাতার কোনও এক মেয়ে-কলেজের ভূগোলের অধ্যাপিকা। গবেষণার কাজে সুবিধা হবে ব'লে ভূতত্ত্বের তত্ত্ব-তালাশে আসত সে আমাদের কলেজে। ওকে দেখামাত্রই আমার স্বভাব-সিদ্ধ নির্লিপ্ততায় চিড় ধরে। হঠাৎ আমার হৃদয়-মনের সব ঝোঁক ওর ওপরে গিয়ে পড়ে। ওর প্রতি আমার আচরণ বোধ হয় শালীনতার সীমা অতিক্রম করল। স্বভাবতঃই সে প্রতিবাদ জানালে ও ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনলে। ফলে আমাকে ছাড়তে হ'ল রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি। চাকরি

ছেড়ে বাড়িতে নিজেকে গুটিয়ে বসে দেখলুম যে, ঘটনাটার বিষয় রটনা আমার বাবারও কর্ণগোচর হয়েছে। তিনি আমাকে মুখে কিছু না বললেও প্রতি মুহূর্তে টের পেতুম তাঁর বিমুখতা। কথা বলতেন না আমার সঙ্গে। তাঁর সুমুখ দিয়ে গেলেই মুখ ফিরিয়ে নিতেন। মনে মনে আঘাত পেলাম। ঠিক করলাম, কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও গিয়ে নূতন ক'রে জীবন শুরু করব। বিস্তর তদ্বির, ধরাধরি, হাঁটাহাঁটি করে পেলাম এই চাকরি—চলে এলাম সাত্‌নায় জানা-শোনা, চেনা-শোনাদের আওতার বাইরে।

আমি বললাম, চ'লে না হয় এলে, কিন্তু চাকরিটা চালাচ্ছ কী করে? কম্পাস দিয়ে কখনো তো নির্ভুলভাবে তুমি পাথরের ঝোঁক মাপতে পারতে না। এই চূণাপাথরের খনিতে চূণাপাথরের স্তরটির ঝোঁক কোন্‌দিকে বুঝতে না পারলে তোমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অদৃশ্য হবে যে তা'।

চ—বললে, মাপজোঁক যা করার, আমার আগে যিনি ছিলেন তিনিই ক'রে গেছেন। আমি তাঁর নক্সায় দাগ বোলাচ্ছি শুধু। এখানকার পাথরগুলো খুব ভদ্র ভাই—খনির সীমানার মধ্যে একদিকে একভাবে একটানা ঝুঁকে আছে—একচুল এদিক-ওদিক হয়নি। পাথর-মহলে এমন ডিসিপ্লিন সচরাচর দেখা যায় না। খনির মধ্যে যে-কোনও জায়গায় মাটির নিচে তাদের ঝোঁক অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছে তারা। এখানকার কাজকর্ম সব ছঁকে বেঁধে ফেলতে পেরেছি অনায়াসে। নির্ধারিত রুটিনে শুধু দাগ বুলিয়ে যাই।

আমি বললাম, কাজটা তা' হ'লে তোমার মনের মতোই হয়েছে। রুটিন বাঁধা কাজ, মস্তিষ্কেও চাপ পড়ে না। কাজ আর আলস্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে।

—তা' রয়েছে। আবার আগের মত নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু ব্যাঘাত ঘটেছে।

—ব্যাঘাত আবার কিসের? চূণাপাথরের স্তর যখন একদিকে একটানা ঝুঁকে থেকে তোমার সঙ্গে পুরোপুরি সহযোগিতা করছে, তখন বাধা কোথায় তোমার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার?

—কোথাও ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি হঠাৎ সেই মেয়েটি তার কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানকার মেয়েদের স্কুলে কাজ নিয়ে এসেছে।

—তা' হলে তো আর তোমার নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে ফেলে গুটি বাঁধবার উপায় নেই।

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে চ— বললে, ওর এই হঠাৎ এসে পড়ার বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠতে পারছি না। ও অবশ্য তাঁর হাবভাবে বোঝাতে চাইছে যে, নিতান্তই চাকরির ঝোঁকে এসেছে সে এখানে।

আমি বললাম, অর্থাৎ কিনা ওর মনের আসল ঝোঁকটিকে তুমিই আবিষ্কার কর—এই প্রত্যাশা সে লালন করে মনের মধ্যে।

গম্ভীর মুখে চ— বললে, সে তো আমি পারব না ভাই। একটি মেয়ের মন বিশ্ব-সংসারের সব ছেড়ে একমাত্র আমার দিকে ঝুঁকে আছে, এই অতি সাঙ্ঘাতিক সত্যটিকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে তাকে স্বীকৃতি দিতে পারি, এমন ক্ষমতা এখন আমার নেই।

এরপর আমার আর কিছু বলবার থাকে না।

চ— ব'লে চলে, তা' ছাড়া আমি তো পাথরের স্তর নই যে, যেদিকে একবার ঝুঁকেছি সেদিকেই ঝুঁকে থাকব চিরকাল।

ভাঁজ

কেওয়াই নদীর ধারে দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বায়ুসেবনে সকলে তৃপ্ত নয়, কাজেই বেড়ানোকে পিকনিক-যুক্ত করার প্রস্তাব হ'ল।

দলের মধ্যে কেউ কেউ পিকনিক-এর পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু অধিকাংশের আগ্রহাতিশয্যে তাঁদের ক্ষীণ আপত্তি টিকল না।

আমি তখন বিকল্প প্রস্তাব পেশ করলাম, পিকনিক-এর হাঙ্গামা না ক'রে টিকনিক করা যাক্ না।

দলের একজন মহিলা ভুরু কুঁচকে বললেন, টিকনিক! তার মানে?

কালো ভুরু দুটির সরল রেখায় একটা সাদাসিধা ড্রইং-এর সহজবোধ্যতা ছিল। কিন্তু কুঞ্চনে ছবিটা হ'ল জটিল—সরলতার ভারসাম্য গেল কেটে।

মানুষের মুখ তার মনের প্রতিবিম্ব। মুখের পটে মনের তুলি চলে। ভাবলেশহীন মুখের শূন্য পট মনের নিষ্ক্রিয়তার বাহন। মন সক্রিয় হ'লে মুখের ওপর তার স্বাক্ষর পড়ে। হর্ষ, বিষাদ, উদ্বেগ, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি প্রত্যেকটি ভাবের নিজস্ব প্রকাশ আছে। সরল দুটি ভুরুর রেখায় ভাঁজ পড়লে মনের মধ্যে অনুরূপ কুঞ্চনের আভাস মেলে।

আমার চোখের সামনে একজোড়া ভুরুর ভাঁজে একটা সন্দিগ্ধ প্রশ্ন যেন উদ্যত হয়ে ওঠে।

বাইরের প্রকাশ্য অবয়ব ও ভেতরকার প্রচ্ছন্ন মন মিলিয়ে মানুষের সমস্ত সত্তা আসলে একটা সরল মোলায়েম জমি। ভাবের স্পন্দনে তার বিকার। ভাবের উগ্রতায় মনের উদার ক্ষেত্র হয় সঙ্কুচিত। ভেতরকার সঙ্কোচন বাইরে ভুরুর ভাঁজে, কপালের খাঁজে ও ওষ্ঠাধরের কুটিল কুঞ্চনে হয় প্রতিফলিত।

আমার নীরবতাকে ঠাট্টা অনুমান ক'রে ভদ্রমহিলার ভুরু দুটি আরও বেঁকে যায়। বললেন, কী, চুপ ক'রে রইলেন যে! আপনার 'টিকনিক'টি কোনও অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে ব'লে তো বোধ হচ্ছে না।

আমি জবাব দিলাম, অভিধানে কি সব শব্দ থাকে! আমার 'টিকনিক' পিকনিক-এরই যমজ ভাই বলতে পারেন। মানে পিকনিক টিকনিক এই আর কী।

ভুরুর ভাঁজ খানিকটা শিথিল হ'ল। ভদ্রমহিলা ঈষৎ মোলায়েম স্বরে বললেন, 'টিকনিক' তা'হলে পিকনিক-ই।

মধ্যপ্রদেশের ছিন্দোয়াড়া জেলার একটি ছোট্ট শহর কোৎমা। এমনিতে নগণ্য, কিন্তু কয়লাখনির জন্য কিছুটা গণনীয়। শহরের পশ্চিমে ও দক্ষিণে দুটি কয়লার খনি আছে। আরও কয়লাখনি পত্তনের সম্ভাবনা আছে কিনা পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম আমরা।

আমাদের দলটা বড়। প্রায় একশ' জনের সমষ্টি। অনেকেই সপরিবারে এসেছেন। সাকোলার আমবাগানে শিবির স্থাপন করেছি আমরা।

কোৎমার পূর্বদিকে কেওয়াই নদী। স্থানীয় লোকেরা ছাড়া কেউই এই নদীকে চেনে না। ভূগোল-বৃত্তান্তে এর স্থান নগণ্য। আর পাঁচটা পাহাড়ী নদীর মতো এই নদীটি। বালি ও পাথরের স্থিরচিত্রের ওপরে তরলিত গতির চলচ্চিত্র পাথরে প্রতিহত সঙ্গীতে সবাক। বিশেষ বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু নদীটিকে আমাদের ভালো লাগে।

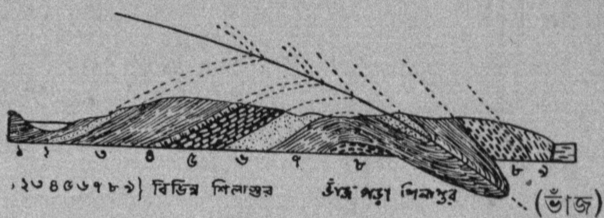
নির্দিষ্ট দিনে সকালবেলায় দলের মহিলাদের ইচ্ছেমত রান্নাকরা খাদ্যসম্ভার নিয়ে কেওয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম আমরা।

কেওয়াইয়ের ধারে যে জায়গাটি আমাদের সকলের পছন্দসই, সেখানে পৌঁছতে হ'লে কোৎমার দক্ষিণ দিকের কোলিয়ারি-র মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কোলিয়ারি-র মধ্য দিয়ে যেতে হবে, কাজেই কোলিয়ারি-র এঞ্জিনিয়ার শ্রীব— আমাদের অনুরোধ করেছিলেন, যাওয়ার পথে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিতে। শ্রীব— এখানে সদ্য এসেছেন তাঁর সদ্য-পরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে। স্ত্রীর রূপের খ্যাতি ছিল, কাজেই ব—বাবু এখানে আসামাত্রই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ অবশ্য তাঁর এই খ্যাতির সূত্রে নয়। আমাদের এক সহকর্মীর স্ত্রী শ্রীমতী ম— শ্রীমতী ব—এর সহপাঠিনী ছিলেন—তাঁহাদের দু'জনের বন্ধুত্ব এই দম্পতিটিকে আমাদের সকলের পরিচয়ের গণ্ডীতে টেনে এনেছিল। শ্রীব— খুব মিশুক, কোলিয়ারি-র খোলসবদ্ধ হয়ে থাকতে চান না। কাজেই আমাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব জমে উঠতে দেরি হয় নি।

নির্দিষ্ট সময়ে ব—বাবুর বাড়িতে এসে দেখলাম যে শ্রীমতী ব— সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে তাঁদের বাড়ির বাগানে বসে আছেন। ব—বাবুকে দেখা গেল না।

আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীমতী ব— সহাস্য অভ্যর্থনায়।

শ্রীমতী ম—বললেন, ব—বাবুকে তো দেখতে পাচ্ছি নে। তিনি বুঝি





শিলাস্তরে ভাঁজ (ভাঁজ)

শিল্পী—এম. এস. আনন্দ

তৈরী হন নি এখনো! তোমাদের দেখছি উল্টো ব্যাপার। গিন্নী তৈরি, কিন্তু কর্তার সাজগোজ শেষ হয় নি।

শ্রীমতী ব— ঈষৎ বিষণ্ণমুখে বললেন, উনি তো বেরিয়ে গেছেন। এইমাত্র ম্যানেজার সাহেবের জরুরী তলব পেয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি বললাম, তা'হলে ম্যানেজারের বাড়িতে ছুটে গিয়ে ব—বাবুকে ছুটি পাইয়ে দিতে হচ্ছে।

শ্রীমতী ব— বললেন, না, তার দরকার নেই। উনি ব'লে গেছেন যে শিগ্‌গিরই ফিরে আসবেন। তবে আপনাদের এগিয়ে যেতে বলেছেন। জায়গাটি তো জানাই আছে, একটু বাদে আমরা গিয়ে হাজির হব।

শ্রীমতী ম— বললেন, না, সে হবে না। আমরা এগিয়ে যাব, আর তুমি বসে বসে অপেক্ষা করবে—তা' হতে দেবো না।

শ্রীমতী ব— ব্যস্তসমস্ত হয়ে ব'লে উঠলেন, অপেক্ষা করতে আমার তো কষ্ট হবে না ভাই। তোমরা কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছ?

শ্রীমতী ম— মুখ টিপে হেসে বললেন, কষ্ট হবে না জানি। আমাদের সঙ্গে যাওয়ার অপেক্ষা তোমার এই অপেক্ষা করায় যে অনেক বেশি সুখ, তা' বুঝেছি। কিন্তু আজকের দিনটা তোমাকে সেই সুখ পেতে দেব না। অপেক্ষা তো রোজই কর, আজ না হয় ভদ্রলোককে একটু উপেক্ষাই করলে।

শ্রীমতী ব—এর মুখের শুভ্রতায় রক্তিম আভা পরিস্ফুট হ'ল। ইজেল-এ টানা ক্যানভাস-এর মত মসৃণ মুখখানা যেন এই রক্তরাগে রঞ্জিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। মুখখানার একটানা কমনীয়তায় কোথাও কোন ছেদ নেই। নেই কোন রেখার বাধা। মসৃণতার গতি ব্যাহত হয় নি কোথাও। রেখার বাঁধন-মুক্ত একটানা ছবি যেন একটি। পরিমিত পরিধির মধ্যে অপরিমেয় যেন প্রকাশ পাচ্ছে। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যে মেলানো একটা নিখুঁত সম্পূর্ণতা যেন। ভুরুর কালো রেখার নিচে আয়ত চোখ, টিকোলো নাক, সুডৌল চিবুক মুখের কমনীয়তার সঙ্গে ছন্দ মেলানো একটি কবিতা যেন।

শ্রীমতী ম— বক্তব্য শেষ করলেন, আমাদের সঙ্গেই তোমাকে যেতে হবে। কর্তৃকারক একাই না হয় যাবেন।

শ্রীমতী ব— শেষ পর্যন্ত আমাদের অনুগামী হলেন।

কেওয়াই নদীর ধারে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে পৌঁছতে বেলা হয়ে গেল।

নদীর কিনারায় কিছু গাছপালার সমাবেশে খানিকটা জায়গা ছায়াচ্ছন্ন ছিল। সেখানে গিয়ে সমবেত হলাম।

নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হওয়ার পর আর কিছু করার থাকে না। রান্না-করা খাবার নিয়ে আসা হয়েছে। সময়মত খেয়ে নিলেই হ'ল। ভোজনেই বনভোজন সমাধা হবে।

সময়ের ভার বিস্মৃত হবার জন্য সকলে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। পুরুষরা মহুয়া গাছের তলায় বসে তাস ও দাবা খেলায় মাতেন। মহিলারা পা ছড়িয়ে বসে গল্পগুজব করেন। সরব গুঞ্জন থেকে শুরু ক'রে নিঃশব্দ কানাকানি—মাঝে মাঝে রহস্যের ঝোঁকে পরস্পরের গায়ে সহাস্যে গড়িয়ে পড়া।

তাস বা দাবায় আমার ঝোঁক নেই, পুরুষদের বৈঠকে তাই পংক্তি পাইনি। মহিলাদের মজলিসেও প্রবেশাধিকার নেই। কাজেই একা একা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াই অভ্ররোদ গায়ে মেখে।

নদীর ধারা জায়গায় জায়গায় বেলেপাথরের পাঁজায় বড় বড় গহ্বর সৃষ্টি করেছে। গহ্বরের মধ্যে স্বচ্ছ জল টলমল করেছে নদীর মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

জলের সঙ্গে জমেছে জলে ভেসে-আসা বালির কণা—নদীর স্রোতের বেগে স্থাবর পাথরের পাঁজা থেকে মুক্তি পেয়ে গতিহীন জলের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে। জলের নিচে বিচ্ছিন্ন কণাগুলি জমতে জমতে সংহত হয়েছে একটি সুসংবদ্ধ স্তরে। শ্যাওলাধরা পাথর চাপা প'ড়েছে বালির আবরণে। জলকে ভর ক'রে আসা বালি জলের জায়গাটিকে করেছে দখল। বেদখল অবশ্য বলা চলে না। কারণ প্রকৃতির নিয়মেই ঘটেছে এই স্থানবদলের পালা। জলের তরলতা আয়তনের সীমা মানে না। কাজেই জড়ের নির্দিষ্ট আয়তনকে স্থান ক'রে নিতে নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম ক'রে যেতে হয় তাকে। এমনি ক'রে পাথরের গহ্বরের শূন্যতা বালির স্থূল সঞ্চয় দিয়ে ভ'রে তুলে জল গিয়েছে স'রে। একদা যে এখানে জল ছিল শুকনো বালির কণার মধ্যে তার সাক্ষ্য চাপা পড়েছে।

ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম যে পাথরের গহ্বরগুলোর মধ্যে বালির সঞ্চয় নিতান্তই স্বল্প। ব্যাপকতর সঞ্চয় জলের মুক্ত স্রোতেই চলছে। নদীর খাত বালিতে আচ্ছন্ন। উদ্ধত পাথরগুলোকে পুরোপুরি চাপা দিতে না পারলেও

সাদা বালি প্রায় বালিয়াড়ির মত বিস্তৃত। এই বালি নদীর ধারা থেকেই ধরা পড়েছে নদীর খাতে। জলস্রোতের ভাঙ্গনের পথ ধ'রে যারা এল, স্তিমিত স্রোতের রক্ষণশীলতা তাদের জমিয়ে তুলেছে।

নদীর স্রোতের বেগ কমলে তার ধারণের শক্তিও কমে। তখন ভেসে-আসার দল জমতে থাকে। নদীর স্রোতের বেগে বড় বড় পাষাণস্তূপ ভেঙে চুরমার হয়। রাশি রাশি শিলা তার প্রবাহে বাহিত হয়। ভাসিয়ে নেওয়ার মধ্যেও ভাঙ্গনের লীলা সক্রিয়। প্রবাহের বেগে শিলাস্তূপ বিশ্লিষ্ট হয় বালির কণায়। জলের কণার সঙ্গে বালির কণা মিলেমিশে একাত্ম হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

জলের গতি কমে এলে জলের সঙ্গে পাথরের সহাবস্থান টেঁকে না। জলের সংযোগ থেকে তারা বিযুক্ত হয়ে নদীর খাতে জমতে থাকে। জলের সঙ্গে প্রথমে পাথরের বড় টুকরোগুলোর ঐক্য ঘুচে যায়। তারপর সূক্ষ্ম বালির কণাগুলিও থিতিয়ে পড়ে।

শীতের কেওয়াইয়ের ধারা ক্ষীণ রূপালী রেখায় সঙ্কুচিত হয়ে আছে। স্রোতের বেগও স্তিমিত। জলের গতি থেকে মুক্ত হয়ে স্থিতিতে থিতিয়ে পড়ছে বালির স্তর। জমতে জমতে পুরু হচ্ছে। আয়তনে বাড়লেও ঢিলে ও আলগা হয়ে আছে। সম্প্রসারণশীল জড়তা—কঠিনের সীমাবদ্ধতা নেই।

কিন্তু এই আলগা বালি কালক্রমে জড়তায় সংহত হবে। জলে-জমা বালির জড় রূপান্তর নদীর খাতে ও দুই তীরে বেলেপাথর ও কাদাপাথরের স্তরে প্রকট হয়ে আছে। কোটি কোটি বছর আগে এমনি জলে ভেসে-আসা পলি থেকে বালি ও কাদা স্তরে স্তরে জমেছিল—তারপর পৃথিবীর বুকের তাপে সংহত হয়েছিল কঠিন পাষাণস্তূপে। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ করি কেওয়াই নদীর খাতে। কোটি কোটি বছর আগেকার পাথরের আবরণকে ভেঙ্গে আবার পলি সঞ্চয়ের পালা চলছে নদীর স্রোতের পথ ধ'রে। আবার নরম ভেজা বালির স্তরে স্তরে সঞ্চয় চলছে কঠিন জড়তার ঐক্যে আবদ্ধ হওয়াকে লক্ষ্য করে।

কেওয়াই নদীর ধারে বেলেপাথরের স্তরে স্তরে ভাঁজ পড়েছে। পাথরের স্তরের একটানা প্রসারের সরল রেখা বেঁকে গেছে অনেক জায়গায়। কোটি

কোটি বছর আগে বালির বুকে জলের ধারা যে-সব চিহ্ন এঁকেছিল, সেই চিহ্নগুলি ধরা আছে পাথরের সূক্ষ্ম ভাঁজে ভাঁজে। মূল বালিতে আঁকা বলিরেখাগুলি ছাড়াও আছে স্থূল ভাঁজের পরুষ প্রকাশ। বালি যখন পাথরে জমাট বাঁধছিল, তখন ভূগর্ভের বিপর্যয়ের চাপে তার ধারাবাহিকতা হয়েছিল ক্ষুণ্ণ। সরলরেখা ধ'রে গ'ড়ে ওঠার পরিকল্পনা গিয়েছিল দুমড়ে মুচড়ে।

বালি যেখানে জমছে, সেখানকার রুক্ষ অসমতাকে মিলিয়ে দিচ্ছে সমতলের আবরণ টেনে। যেখানে যত বন্ধুরতা আছে, সব কিছুকে একাকার ক'রে সমন্বয় করে দিচ্ছে। বর্ষাস্নাত সবুজ মাঠের মত একটানা কমনীয়তা প্রকাশ পাচ্ছে। সরল মোলায়েম সঞ্চয়ে কোথাও কোন ভাঁজ পড়েনি।

শ্রীমতী ব— মহিলাদের আলাপচারিতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে জলের ধারে একটি পাথরের উপরে বসেছিলেন। তাঁর মুখের সঙ্গে বালির স্তরের কমনীয়তার সাদৃশ্য দেখতে পাই। বালির স্তরের মতো নিভাঁজ মসৃণতা—সুষমাসৌষ্ঠবের সুষ্ঠু প্রকাশে কোথাও বাধা নেই।

আকাশে তখন মেঘ জমেছে টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্নভাবে। সূর্য ঢাকা পড়ে। জলের ওপরে লক্ষ চুমকির ফুলঝুরি নিষ্প্রভতায় হারিয়ে যায়। জলের নিচে বালির স্তরের শুভ্রতাও ম্লান হয়ে যায়।

ম্লান দেখায় শ্রীমতী ব—এর মুখখানাও। আকাশের মেঘের ছায়া যেন তাঁকেও আচ্ছন্ন করেছে।

আকাশের মেঘের টুকরোগুলো পরস্পরের মধ্যে ঐক্য সন্ধানে রত হয়। মেঘের শুভ্রতায় ধূসর রংয়ের ছোপ এসে লাগে। অল্প অল্প জোলো বাতাস বইতে থাকে।

বুঝি বৃষ্টি হবে। আমরা তাড়াতাড়ি পিকানকের সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে নিয়ে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করি।

এমন সময় কোলিয়ারি ম্যানেজার মালহোত্রা ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ব—বাবু এসে হাজির হলেন সিল্‌হারার দিক থেকে।

ব—বাবু আমাদের বললেন, মালহোত্রা সাহেব আর একটি পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন। আমাকে একরকম জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেলেন কোনও আপত্তি না শুনে।

তারপর তাঁর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বললেন, তোমাকেও নিয়ে যাবার জন্য মিসেস মালহোত্রা নিজেই আমাদের বাংলোতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি গিয়ে পৌঁছবার আগেই তুমি এঁদের সঙ্গে চলে এসেছ। অবশ্য এঁদের সঙ্গেই আমাদের আসার কথা।

হঠাৎ বাতাসের বেগ বাড়ল। কেওয়াইয়ের শান্ত জলের ধারায় ঢেউয়ের আবর্ত জাগে। জলের নিচে বালির স্তরে ছোট ছোট ভাঁজ পড়ে।

শ্রীমতী ব—এর মুখের কোমল কমনীয়তায় কুঞ্চনের আভাস জাগে—মসৃণ কপালে কয়েকটি ভাঁজের রেখা। টানা টানা ভুরু দুটি বেঁকে যায়। একটা নিখুঁত চিত্রপট যেন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

উগ্র আবেগের খোঁচায় লাবণ্যের ছন্দপতন ঘটল। ব—বাবুর উদ্দেশে উদ্যত হ'ল বর্শার মত সুতীব্র দৃষ্টির খোঁচা। কমনীয়তার মসৃণ সমতল ধারালো কতকগুলি ভাঁজ হ'ল বন্ধুর।

ঝোড়ো বাতাসে এলোমেলো হয় নদীর জল—বিশৃঙ্খল হ'ল জলের নিচে বালির বিন্যাস। তেমনি অবরুদ্ধ রোষে একটি সুন্দর মুখের কোষে কোষে সংক্ষোভ জাগে। একটা পরিপূর্ণ লাবণ্য ভেঙ্গে ভেঙ্গে হয় বিপর্যস্ত।

শ্রীমতী ব—এর মুখখানাকে সৌন্দর্যের ধ্বংসাবশেষের মত দেখায়।

চ্যুতি

মধ্যপ্রদেশের সুদূর অরণ্য-অঞ্চলে একটি কয়লাক্ষেত্র। আশপাশে দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও পাহাড়। পঞ্চাশ বছর আগেও এখানে রেলপথ ছিল না। এই দুর্গম অঞ্চলটি রেলপথ দিয়ে সহজগম্য হওয়ার পর এখানকার কয়লা দেশের শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুটিকয়েক কয়লাখনি গ'ড়ে ওঠে এখানে ধীরে ধীরে। তাদেরই একটির মালিক তাঁর খনির সম্প্রসারণ কামনা করেছিলেন। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাগিদে স্থানীয় ভূতত্ত্বের তত্ত্বতালাশের জন্য শ্রীদ—কে নিয়োগ করা হয়েছিল।

শ্রীদ— একজন অভিজ্ঞ ভূতাত্ত্বিক। ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রেরণায় একটানা প্রায় বিশ বছর বনে বনে কেটেছে তাঁর। তিনি বলতেন যে, বনেই তাঁর মনের পক্ষপাত—জনপদ তাঁর কাছে আপদ। মানুষের সঙ্গ-বিবর্জিত আরণ্যক পরিবেশে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কাটিয়ে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে উপনীত হয়েছেন তিনি। বাকি জীবনটাও বনের বিজনে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকার সাধ তাঁর।

কাজে যোগ দিয়েই শ্রীদ— তাঁর কাজ শুরু করেন।

কোলিয়ারিতে একটিমাত্র কয়লার স্তর থেকে কয়লা কেটে বের করা হচ্ছে। প্রায় আঠারোশ' ফুট উঁচু মালভূমির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে তার অবস্থান। দক্ষিণ দিকে নিচু জমিতে যেখানে মালভূমিটি নতমুখী হয়েছে, সেখানে বাইরে আত্মপ্রকাশ ক'রে খনিবিদ্‌দের সহজ নাগালের মধ্যে এসেছে। এখানেই কয়লাখনির সূচনা। এখান থেকে কয়লার স্তরে সুড়ঙ্গ কাটা শুরু করা হয়েছে।

কয়লার স্তরটি কোন্ দিকে হেলে আছে জেনে নিয়ে স্তরটির প্রসারকে অনুসরণ করেন শ্রীদ—। মাটির নিচে প্রচ্ছন্ন, কাজেই কোন্ দিকে প্রসারিত হচ্ছে তা' প্রত্যক্ষগোচর নয়। কিন্তু নালার খাত ও গহ্বরে এখানে ওখানে তাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন আত্মপ্রকাশগুলিকে একত্র ক'রে সম্পূর্ণ প্রসারকে কল্পনা করেন শ্রীদ—।

শ্রীদ— দেখলেন যে, কয়লার স্তরটি একটানা উত্তরদিকে প্রসারিত। এই প্রসারকে অনুসরণ করতে করতে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন তিনি। এখানে সবুজ জমাট আচ্ছাদন দিনের আলোকে ছাড়পত্র দেয়নি। রাত ও দিনের পার্থক্যও খুব স্পষ্ট নয় এখানে। প্রকৃতি এখানে অবগুণ্ঠিত—কুণ্ঠিত নিজেকে ব্যক্ত করতে। এখানকার নিবিড় বন্যতার মধ্যে বন্য পশুরা পেয়েছে সহজ অবস্থানের ছাড়পত্র, কিন্তু মানুষের প্রবেশের পথ নেই।

এই বনের মধ্যে ঢুকে শ্রীদ— এর মনে হ'ল তিনি যেন অনধিকার প্রবেশ করেছেন। বনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ঐক্য সন্ধানে তিনি উৎসুক হ'লেও বন যেন তাঁকে মেনে নিতে চায় না।

তবু বনকে বশ মানাবার মানসে গভীর বনের মধ্যে বাস করতে শুধু করলেন তিনি। একটি ঝর্ণার ধারে তাঁবু খাটিয়ে কিছুদিন কাটালেন। তারপর সন্ধান পেলেন বনের মধ্যে বাইগাদের একটি গ্রামের।

গ্রামটি বনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে আছে। গ্রাম হ'লেও পারে নি বনকে অতিক্রম করতে। বনকে মেনে নিয়ে এ-গ্রামের মানুষরা বন-মানুষ হয়ে উঠেছে। এদের কাছ থেকে বন্যতার দীক্ষা নিতে উৎসুক হলেন শ্রীদ—।

গ্রামের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এ-গ্রামে আশ্রয় নেবার অভিলাষ ব্যক্ত করলেন শ্রীদ—।

শ্রীদ—এর আপাদমস্তকে গাঁ-বুড়োর ধারালো দৃষ্টির অস্ত্রোপচার চলে কিছুক্ষণ। শ্রীদ—এর ক্রিয়াকলাপ যে বনের মধ্যে কয়লাখনি সম্প্রসারণের পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা' সে জানে। সে বনের মানুষ। বনের বিকল্প কোন কিছুকেই মেনে নিতে সে রাজি নয়। কাজেই শ্রীদ—এর উপস্থিতিকে অবাঞ্ছিত ব'লেই মনে করে সে।

সে শ্রীদ—কে বললে, এ গাঁয়ে যদি থাকতে চাও, বনের মধ্যে কয়লাখনি করার চেষ্টা তোমাকে ছাড়তে হবে। আমরা বনের মানুষ—আমাদের মনের মানুষ যদি হতে চাও, এ বনকে মেনে নিতে হবে পুরোপুরি।

শ্রীদ— বললেন, বনকে মেনে নিতেই তো চাই। কিন্তু কাজ কী ক'রে বন্ধ করি বল ? চাকরির জোয়ালে আমি যে বাঁধা। অবশ্য কয়লাখনি করার দায়িত্ব আমার নয়।

গাঁ-বুড়ো গম্ভীরমুখে বললে, তুমি কয়লা না খুঁজলে কেউ পারবে না এ বনে কয়লাখনি করতে।

কাছেই ছিল গাঁ-বুড়োর যুবতী নাতনী। সে বললে, ওর চাকরিই তো কয়লা খোঁজা—চাকরি ছাড়বে কী ক'রে বল! ঝর্ণার ধারে একা-একা থাকতে বোধ হয় ওর ভয় করে—তাই আমাদের গাঁয়ে এসে থাকতে চায়। আমাদের একখানা ঘর তো খালিই প'ড়ে আছে দাদু—দাও না ওখানে থাকতে ওকে।

নাতনীর গলার স্বরে অনুনয় ফুটে ওঠে।

গাঁ-বুড়ো মাথা নেড়ে বললে, না। আমাদের বন-ছাড়া করার জন্ত কাজে লেগেছে—আর আমি ওকে ঠাঁই দেব! সে হয় না।

শ্রীদ— বললেন, আমার কাজের দরুণ বন-ছাড়া হবে কেন? বন কেটে কয়লা-খনি করলে সে কয়লাখনিতে তোমাদের কাজ দেব।

গাঁ-বুড়োর চোখ দুটিতে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। গলার স্বর চড়া ক'রে সে বললে, চাই না কাজ। আমাদের এ-গাঁয়ে কেউ কখনো চাকরি করেনি—করবেও না। বনের মানুষ আমরা—বনেই থাকব। এ-বন কেটে যদি ফেল, তোমাদের সবাইকে কেটে ফেলব আমরা।

গাঁ-বুড়োর চোখ দুটি জ্বলতে থাকে হিংস্র শ্বাপদের মতো। আতঙ্কে শ্রীদ—এর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। দ্রুত পদক্ষেপে সে ফিরে চ'লে আসে নিজের আস্তানায়।

শ্রীদ— ভেবেছিলেন, উত্তরে বনের মধ্যে কয়লার স্তরটির প্রসারে কোন ছেদ নেই। কিন্তু বনে ঢুকেই সে দেখল যে তার অনুমান ভুল। বনের সূচনাতেই কয়লা ও সংশ্লিষ্ট শিলাস্তরগুলিতে চ্যুতি ঘটেছে। মূল প্রসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক শ' ফুট নিচে নেমে গেছে তারা।

স্তরে স্তরে পলি সঞ্চিত হয়ে শিলাস্তর রচনার সূচনাতে স্তরের বিন্যাসে থাকে একটানা ঐক্য, কিন্তু পাথরে জমাট বাঁধতে গিয়ে স্তরগুলি গুটিয়ে আসে। ফলে শিলাস্তরে চাপ পড়ে। এই চাপের দরুণই হয় পাথরে ভাঁজ পড়ে, নয়তো ফাটল ধরে।

ফাটলে বিশ্লিষ্ট হ'লে শিলাস্তরের প্রসার হয় বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছেদ রেখার এক পাশের শিলাস্তর অন্য পাশের শিলাস্তরের সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। একটানা বিন্যাসের ঐক্যবন্ধন থেকে বিযুক্ত হয়ে তারা বিচ্যুত হয়। ফাটল যেদিকে হেলে থাকে, সেদিকের স্তরগুলির পতন ঘটে। ঐক্যবন্ধনের দায় থেকে বিমুক্ত হয়ে চ্যুতির মধ্যে স্থিতিলাভ করে তারা।

পাথরের স্তরে স্তরে বিচ্যুতির পালা চ'লে আসছে কোটি কোটি বছর ধ'রে। এমনি ক'রে জড় প্রকৃতি যেন নিজের জড়তাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে।

শিলাস্তরের চ্যুতি মাটির নিচে প্রচ্ছন্নভাবে ঘটলেও পাথরের স্তরের পতনের বেগে মাটি কাঁপে। ভূমিকম্পের মধ্য দিয়ে এই চ্যুতির অভিব্যক্তি ঘটে। শিলাচ্যুতির তীব্রতার প্রমাণ হ'ল প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প।

শ্রীদ— দেখলেন উত্তরদিকে শালবনের শুরুতে কয়লার স্তর বিচ্যুত হয়ে এত নিচে নেমে গেছে যে, তাকে খুঁড়ে তোলার জন্য পৃথক কয়লার খনি করতে হবে। দক্ষিণদিকের কয়লাখনির সুড়ঙ্গ পথকে প্রসারিত করলেও এই চ্যুতিতে এসে থামতে হবে।

আলাদা একটা খনি!—কয়লাখনির মালিকের ভুরু দুটো কুঁচকে ওঠে।

শ্রীদ—বললেন, আলাদা খনি না ক'রে উপায় কী! আপনার কোলিয়ারী থেকে একটানা সুড়ঙ্গ টেনে তো আর এই বনের এলাকায় কয়লার নাগাল পাওয়া যাবে না। মাটির নিচে প্রায় আড়াইশ' ফুট সুড়ঙ্গ করলে তবে এখানে কয়লা পাবেন।

আড়াই শ' ফুট সুড়ঙ্গ! সে যে অনেক টাকার ধাক্কা!—আঁতকে ওঠেন কয়লাখনির মালিক।—অত টাকা কোথায় পাব!

শ্রীদ—দমে গিয়ে বললেন, তা' হ'লে তো—

—হ্যাঁ, তা'হলে আর অনর্থক আপনি খোঁজাখুঁজি করেন কেন। চুক্তিমতো অবশ্য আপনাকে একমাস নোটিশ দেওয়ার কথা, তার বদলে আগাম এক মাসের মাইনে দিয়ে দিচ্ছি।

শ্রীদ—ম্লান হেসে বললেন, কয়লার স্তরের চ্যুতির জন্য আমার পদচ্যুতি ঘটল।

মালিক বললেন, কী করব বলুন—কয়লার স্তরের চ্যুতির দরুণ আমার খনি বাড়াবার পরিকল্পনারও চ্যুতি হ'ল।

তাঁবু গুটিয়ে ফেলে বিদায়ের আয়োজন করছেন শ্রীদ—, এমন সময় গাঁ-বুড়োর নাতনী এসে বললে, শুনলাম এ বনে কয়লাখাদান হবে না—তাই তোমার চাকরিও গেল।

শ্রীদ—বললেন, গেল বইকি। আমিও তাই যাওয়ার উদ্যোগ করছি।

শ্রীদ—এর মুখের ওপরে নিবিড় দৃষ্টি স্থাপন ক'রে গাঁ-বুড়োর নাতনী বললে, যাবে কেন? থাকো এসে আমাদের গাঁয়ে। দাদু তো আমাকে বললে যে, কয়লা যখন আর খুঁজছ না, আমাদের গাঁয়ে তোমাকে থাকতে দেওয়া যেতে পারে।

—চাকরি যাবার পর এখানে আর থাকব কোন্ যুক্তিতে?

—তুমি যে দাদুকে বলেছিলে এ-বন তোমার ভাল লেগেছে, তুমি এখানে থাকতে চাও।

বন্য যুবতীর দু' চোখে নিবিড় অরণ্যের হাতছানি। দ-এর মনে হ'ল যেন তার আকর্ষণ সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কারের সব আবরণ ভেদ ক'রে তাঁর ভেতরকার আদিম মানবসত্তাকে গিয়ে স্পর্শ করেছে।

বাইগাদের গাঁয়ে এসে বসবাস শুরু করলেন শ্রীদ—। শোনা গেল যে, গাঁ-বুড়োর নাতনীকে তিনি বিয়েও করেছেন।

শ্রীদ—এর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সবাই বলাবলি করে, এমন অধঃপতন যে কারুর হতে পারে, কল্পনা করা যায় না। পদচ্যুতি তো অনেকেরই হয়, কিন্তু তার জন্য এমন বিচ্যুতি!

পরে বিলাসপুরের ডাকবাংলোতে একদিন শ্রীদ—এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তাঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে বুনো বাইগাদের গাঁয়ে বসবাস শুরু করতে পারলেন কী ক'রে বলুন তো!

শ্রীদ—জবাব দিলেন, নিজের অভ্যস্ত পরিবেশ ও গতানুগতিক জীবনযাত্রার সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। বুনোদের মধ্যে বিচ্যুত হয়েই যেন স্থায়ী স্থিতিলাভ করলাম। পাথরের বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতি যেমন নিজের জড়তা অতিক্রম করছে, মনে হচ্ছে এই চ্যুতির ফলে নিজেও নূতন হয়েছি আমি।

ভেতরের খবর

মানুষ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত জীবিত মাত্রেরই আশ্রয় হ'ল মাটি। মাটিতে জীবনের উৎপত্তি ও পুষ্টি। মানুষের সভ্যতার ভিত্তি হ'ল মাটি। মাটিকে আশ্রয় করেছে ব'লে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হতে পেরেছে। মাটিকে আঁকড়ে পরিপাটিভাবে বাস করি আমরা এই বিশ্বাসে যে আমাদের পায়ের নিচে মাটি কখনো সরবে না।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সর্বদা বিপর্যস্ত হচ্ছে। মাটি যে শুধু পৃথিবীর জড় অনড় গোলকের আবরণ নয় তা' প্রমাণ করছে সে থেকে থেকে কেঁপে উঠে। তার কাঁপনে মানুষের অস্তিত্ব মূলসুদ্ধ নাড়া খাচ্ছে। মাটিকে টুকরো টুকরো করে ভাগ ক'রে ভোগ করে মানুষ, মাটির ওপরে নিজের স্বত্ব চিরস্থায়ী সত্য ব'লে জানে। জমিতে জমিয়ে বসে সে ঘরবাড়ি গ'ড়ে তোলে। কিন্তু ভূমিকম্প মাটির ওপরে মানুষের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে মাটি ক'রে দেয়। ১৯৬৬ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে পূর্ব তুরস্কে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল, তা' প্রায় চার হাজার মানুষের প্রাণহানি ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি, প্রায় বিশ লক্ষ লোককে তাদের আশ্রয় থেকে বিচ্যুত ক'রে মাটির কাছাকাছি এনে দিয়েছিল।

পূর্ব তুরস্কের এই ভূমিকম্প প্রচণ্ডতার পরিমাপে পৃথিবীর বড় বড় ভূমিকম্পের পাশে স্থান পাওয়ার যোগ্য। ভূমিকম্পটি ভয়াবহ হ'লেও অন্যান্য বড় বড় ভূমিকম্পের সঙ্গে তার তফাত হ'ল এই যে, তা' বিনা ভূমিকায় হঠাৎ আসে নি। তুরস্কের ভূমিকম্পের আগে চার মাস ধরে মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারতজোড়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মাটি থেকে থেকে কেঁপে উঠেছে। মাটির এই কাঁপনগুলিকে ভূবৈজ্ঞানিকরা যদি বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করতেন, তা'হলে তাঁরা হয়তো বুঝতে পারতেন যে মাটির নিচে প্রচ্ছন্ন ভূস্তরে খুব ভয়াবহ একটা ভূমিকম্পের অমোঘ অস্ত্র প্রায় একটানা চার মাস ধ'রে শানিত হচ্ছিল।

পূর্ব তুরস্কের মুস্ প্রদেশের এমাল আইটাক পূর্ব তুরস্কের ভূমিকম্পের দু'মাস আগে তুরস্কের পার্লামেণ্টে এই ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তিনি তুরস্ক সরকারকে ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধও জানিয়েছিলেন। তাঁর কথা তুরস্ক সরকারের কেউ কানেও তোলেন নি, কারণ ভাগ্য-গণনা এমাল আইটাকের পেশা ও নেশা, কিন্তু এমাল আইটাক বলেছেন যে, তাঁর পূর্বাভাসের ভিত্তি হ'ল বিদেশী ভূতাত্ত্বিকদের পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা।

এমাল আইটাকের কথা যদি সত্য হয়, তা' হলে আধুনিক ভূবিজ্ঞানীদের সমীক্ষা ভূস্তরের বিন্যাসের মধ্যে আসন্ন বিচ্যুতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে সমর্থ হবে।

প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা ছিল যে কোনও এক বিপুলকায় দানব পৃথিবীকে ধারণ ক'রে আছে। সে মাথা নাড়ালেই ভূমিকম্প হয়। ধরণীর ধারক হিসেবে ভারতে মহাসর্প বাসুকী, জাপানে মহাকায় মাকড়শা, দক্ষিণ আমেরিকায় তিমি, উত্তর আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কচ্ছপ এবং মঙ্গোলিয়াতে পরম ব্যাঙের কল্পনা করা হয়েছিল।

গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টট্ল্ ভাবতেন যে, ভূগর্ভ থেকে বায়ু যখন বেগে উত্থিত হয়, তখনই ভূমিকম্প ঘটে। তাঁর মতে ভূমিকম্পের সময় বাতাস ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্ক এ্যারিস্টটলের ধারণার ভিত্তি হল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। আগ্নেয়গিরি আগুনের সঙ্গে গরম গ্যাসও উদ্গার করে। গ্যাসের প্রচণ্ড বেগ মাটির স্তরকে কাঁপিয়ে দেয়। ফলে আগ্নেয়গিরির চারপাশে ভূমিকম্প হতে পারে।

ভূমিকম্পের আসল কারণ হ'ল শিলাস্তরের চ্যুতি। কিন্তু পৃথিবীর সব শিলাস্তরে চ্যুতি ঘটার মতো দুর্বলতা নেই। যা শক্ত ও ঋজু, তা' সহজে নোওয়ায় না। কিন্তু যা নম্র বা যার মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছে, চাপ পড়লেই তা' বিচ্যুত হয়।

পৃথিবীর মধ্যে দুটি নির্দিষ্ট অঞ্চল আছে, ভূপৃষ্ঠ যেখানে চঞ্চল। এ দুটি অঞ্চলে থেকে ভূমিকম্প হয়। অঞ্চল দুটির শিলাস্তরে দুর্বলতা আছে। এদের মধ্যে একটি হ'ল প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে। প্রশান্ত মহাসাগরের শান্ত জলকে বেষ্টন করেছে অশান্ত ডাঙ্গা। পৃথিবীর শতকরা প্রায় আশি ভাগ ভূমিকম্প এই বৃত্তাকৃতি অঞ্চলে হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে অবস্থিত জাপান, পশ্চিম মেক্সিকো এবং ফিলিপাইন্স-এ ভূমিকম্পের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

ভূমিকম্প-বিক্ষুব্ধ অন্য অঞ্চলটি ব্রহ্মদেশ থেকে শুরু করে হিমালয় পর্বত ও বেলুচিস্তান, ইরান, তুরস্ক ও আল্প্স পর্বতমালার মধ্য দিয়ে পশ্চিমে স্পেন ও পর্তুগাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভূমিকম্পের ফলাফল সম্বন্ধে আমরা সকলেই মোটামুটি ওয়াকিবহাল। ভূমিকম্প মাটিকে প্রচণ্ডভাবে এবং প্রচণ্ড রবে কাঁপায় এবং মাটির ওপরে গাছপালা ও ঘরবাড়িকে উপড়ে ফেলে দিয়ে প্রাণহানি ঘটায়। ভূমিকম্প-কবলিত শহর

মাটিতে প'ড়েই ক্ষান্ত হয় না, আগুনেও পোড়ে। ভূমিকম্প শুধু মাটিতে সীমাবদ্ধ নয়, সমুদ্রকেও সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। সমুদ্রের তীরবর্তী কোথাও ভূমিকম্প হ'লে সমুদ্র ফেঁপে-ফুলে নিজের সীমা পেরিয়ে ডাঙ্গাকে আচ্ছন্ন করে।

ভূমিকম্পের বেগে ভূবিন্যাস অবিন্যস্ত হয়। কম্পিত হ'লে ভূমির উচ্চতা বাড়ে। বিচ্যুতির পরিমাণ প্রতি ভূমিকম্পের হিসেবে বেশি না হ'লেও, দীর্ঘ মেয়াদের হিসেবে ভূগোলে গণ্ডগোল বাধাতে পারে। টোকিওর অদূরে সমুদ্রের উপকূলবর্তী জমি ভূমিকম্পের ফলে ১,৮৯০ বৎসরে প্রায় ৪৫ ফুট উঠেছে। প্রায় দু'হাজার বছরে পঁয়তাল্লিশ ফুট উত্থান হয়তো নগণ্য, ভূবিন্যাসে হয়তো তা' দৃশ্যতঃ কোন পরিবর্তন আনবে না, কিন্তু এমনি উত্থান যদি দুই লক্ষ বছর ধরে চলে, টোকিওর উপকূলবর্তী ডাঙ্গা দুই লক্ষ বছরে প্রায় এক মাইল উঁচু হয়ে উঠবে।

ভূমিকম্প পাহাড় থেকে ধস নামায় এবং মাটিকে ফাটিয়ে ফুটিফাটা করে। ভূমিকম্পের ফাটল যে কতখানি গভীর হতে পারে তা' নির্ণয় করা হয় নি। ধরণী যে দ্বিধা হয়ে সীতাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে ভূমিকম্পের কোন সম্পর্ক আছে বলে জানা নেই। ক্যালিফোর্নিয়াতে ১৯০৬ সালে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট একটি ফাটলে একটি গরু প'ড়ে গিয়েছিল। গরুটি পুরোপুরি ফাটলের মধ্যে ঢুকে গেলেও ল্যাজটি বাইরে বেরিয়ে ছিল। ভূমিকম্পের ফলে মাটি প্রচণ্ড রকম টললেও তার মধ্যে খুব গভীর ফাটল বোধ হয় দেখা দেয় না।

ভূমিকম্পে মানুষের হিত না থাকলেও ভূবিজ্ঞানীদের কিঞ্চিৎ লাভ আছে।

ভূমিকম্পের মূলকেন্দ্র (epicentre) অর্থাৎ যেখানে শিলাস্তরে বিচ্যুতি ঘটেছে, সেখান থেকে মাটির কাঁপন মাটি ও পাথরের স্তরের মধ্য দিয়ে ঢেউয়ের মত চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। মাটির এই স্পন্দন পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত ভূমিকম্পের খবর পৌঁছে দেয়। ভূমিকম্প-বিক্ষুব্ধ অঞ্চল থেকে অনেক দূরে যে আছে, সে অবশ্য পারে না এই স্পন্দনকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে। সেখানে ভূকম্পমাপনী যন্ত্রের (Seismograph) সাহায্য দরকার হয়। এই যন্ত্রে মাটির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পনও ধরা পড়ে।

ভূমিকম্পের স্পন্দন মাটি ও পাথরের স্তরের মধ্য দিয়ে শুধু সোজা চলে না, মাটি ও পাথরের আচ্ছাদন ভেদ ক'রে পৃথিবীর ভেতরেও প্রবেশ করে—পৃথিবীর কেন্দ্রকে বিকীর্ণ ক'রে এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে পৃথিবীর বিপরীত প্রান্তে গিয়ে ভূপৃষ্ঠে উপনীত হয়। ধরণীর মর্মবিদারী এই স্পন্দনও ভূকম্পমাপনী যন্ত্রে ধরা পড়ে। যন্ত্রে চিহ্নিত স্পন্দনের বিন্যাস থেকে জানা যায় ভূমিকম্প কত দূরে, কোথায়

ঘটেছিল। তা' ছাড়া যন্ত্রের গায়ে পৃথিবীর ভেতরকার খবরও স্পন্দনের রেখায় লেখা হয়ে থাকে।

ভূকম্পমাপনী যন্ত্রে চিহ্নিত ভূমিকম্পের স্পন্দনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পৃথিবীর ভেতরকার গোপন কথাটি। এই স্পন্দন বিশ্লেষণ ক'রে জানা যায় যে, পৃথিবীর বাইরের স্তর বা ভূত্বকটি কুড়ি থেকে ত্রিশ মাইল পুরু। পৃথিবীর এই ওপর-তলার শীর্ষস্থানটিতে গ্র্যানিট (Granite) জাতীয় হালকা শিলার আবরণ আছে। তার নিচে রয়েছে ব্যাসল্ট (Basalt) জাতীয় ভারী পাথর। গভীর সমুদ্রের নিচে ভূত্বকের এই নিম্নাঙ্গটির নাগাল পাওয়া যায়।

নাগাল অবশ্য মেলে না ভূত্বকের নিচের স্তরটির। পৃথিবীর কেন্দ্রগোলকের (core) ওপর পর্যন্ত তার বিস্তার। তবে ভূকম্পের স্পন্দন থেকে তার সম্পর্কে পরোক্ষ জ্ঞান পাওয়া যায়। তা' থেকে জানা যায় যে, ভূত্বকের তুলনায় এই স্তরটি অনেক বেশি ভারী। তার মধ্যে লোহা ও ম্যাগনেশিয়াম (magnesium)-যুক্ত খুব ভারী খনিজ পদার্থ ঘনীভূত হয়ে আছে।

আঠারশো মাইল পুরু এই ভারী খনিজের স্তরটি পৃথিবীর কেন্দ্রকে আচ্ছাদন ক'রে রেখেছে। কেন্দ্রের এলাকায় প্রকাণ্ড একটি গোলক আছে, যা একটু গোলমেলে। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুটি ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৯৫০ মাইল নিচে অবস্থিত। কেন্দ্রগোলকের ব্যাস হ'ল প্রায় ৪৩০০ মাইল। গোলকটি তাঁর ওপরওয়ালাদের তুলনায় অনেক বেশী ভারী। তার আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় পনরোর কাছাকাছি। ভারী হ'লেও তা তরল অবস্থায় অবস্থান করছে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ তরলতার খবরও এনে দিয়েছে ভূমিকম্পের স্পন্দন। সম্ভবত ওপরের চাপ ও ভেতরকার তাপ দুয়ে মিলে কেন্দ্রকে জড়ীভূত হতে দেয় নি। আপেক্ষিক গুরুত্বের (specific gravity) হিসেবে কেন্দ্রগোলকটি লোহা, নিকেল ও কোবাল্ট দিয়ে গড়া ব'লে অনুমান করা হয়।

আমার একজন পদার্থবিদ্ বন্ধু আছেন, যিনি বিদেশে ভূকম্প নিয়ে গবেষণা করছেন। মাটির কাঁপনের সাহায্যে মাটির নিচের গুপ্ত খবর জানার জন্য তিনি ব্যস্ত। ভূবিজ্ঞানীরা যতটা জেনেছেন এ পর্যন্ত, তার চেয়েও বেশি জানার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব।

কী একটা কনফারেন্স-এ যোগ দিতে তিনি সম্প্রতি এ-দেশে এসেছিলেন। ভুবনেশ্বরের বিমান বন্দরে তাঁর সঙ্গে হঠাৎ সেদিন দেখা হয়ে গেল। হঠাৎ দেখা অনেকটা যেন সারপ্রাইজ প্রাইজ পাওয়ার মত। মামুলী কুশল বিনিময়ের

পর তাঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কী খবর বল এবার। কাজকর্ম চলছে কেমন?

খবর খুবই ভালো।—বন্ধুবর গদগদ স্বরে বললেন, তাসখন্দ ও পূর্ব তুরস্কে অমন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল, খুবই উপকার হ'ল আমার।

বন্ধুবরের কথায় আমি যেন ভূমিকম্পের মত জোরালো ধাক্কা খেলাম। স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে থেকে আমি বললাম, ভূমিকম্প ভালো খবর! কী বলছ তুমি!

বন্ধুবর বললেন, আমার দিক থেকে ভালো খবর বই কি। এরকম প্রচণ্ড ভূমিকম্প হ'ল বলেই না পৃথিবীর ভেতরকার অনেক খবর পেয়ে গেলাম।

এক পৃথিবী

আমার এক বন্ধুর ছোট ভাই কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ ক'রে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিল অস্ত্র-চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য। সেখানে শিক্ষায় পাঠ সমাপ্ত ক'রে শিক্ষানবিশি করেছে সে কোনও এক কাউন্টি-র হাসপাতালে। হাসপাতালটিতে একবছর কাজ করার পর তার দেশে ফেরার কথা।

কিন্তু দেশে ফেরা হ'ল না তার। হাসিখুসি একটি ইংরেজ মেয়ে হাসপাতালে নার্সের কাজ করত। মেয়েটির হাসি তার মনে যেন বাঁশি বাজায়। সিন্ধুপারের বিদেশিনী দেখতে দেখতে তার একান্ত আপনার ও অন্তরতমা হয়ে ওঠে। বিদেশ আর তার কাছে বিদেশ থাকে না। স্বদেশে ফেরার তাগিদও আর সে অনুভব করে না। সেই কাউন্টি র হাসপাতালে পাকা চাকরি নিল সে।

কিন্তু বিপদে পড়ে সে বিয়ের কথা উঠতে। তার মায়ের অমতে বিয়ে করতে চায় না সে। কিন্তু তার মনোনীতা বিদেশিনী। কাজেই তার মায়ের মনের মতো হতে পারে না কখনো। তার বিপন্ন ভাব দেখে বেদনা বোধ করে মেয়েটি। সে বললে যে সে নিজে তার মায়ের কাছে গিয়ে মত আদায় করবে।

মেয়েটির যেমন কথা তেমনি কাজ। নিজের খরচে প্লেনের টিকিট কিনে উড়ে এল সে দিল্লী। দিল্লী থেকে গেল সে উত্তর প্রদেশের এক শহরে, ছেলেটির মা যেখানে থাকেন।

ছেলেটির মাকে মা বলে ডাকে মেয়েটি। তাঁকে বোঝায় যে দেশে দেশে বিভেদটা কৃত্রিম। আসলে সব দেশই মাটি দিয়ে গড়া—সব দেশের মানুষই এক। চামড়ার রঙে পার্থক্য থাকলেও এদেশের মেয়েদের থেকে পৃথক নয় সে। তাঁর ছেলেকে ভালবেসে সে এদেশেরই মেয়ে হয়ে গিয়েছে। তা' ছাড়া পৃথিবীটাও ক্রমশ: ছোট হয়ে আসছে, দেশে দেশে ব্যবধানও সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠছে। বিলেত থেকে দিল্লী উড়ে আসতে তার ঘণ্টা বারো লেগেছে। আরও কয়েক ঘণ্টা উড়লে সে টোকিও পৌঁছে যেত। দেশে দেশে এত যখন ঘেঁষাঘেঁষি, তখন মানুষে মানুষে অন্তরঙ্গ মেশামেশি অবশ্যম্ভাবী।

মেয়েটির সব কথা ছেলেটির মা বুঝতে না পারলেও মেয়েটিকে তাঁর ভাল লেগে যায়। তাকে তিনি একটি বেনারসী শাড়ি কিনে দেন, আশীর্বাদও করেন।

বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর কাছ থেকে এই বিদেশিনী মেয়েটির গল্প শুনে ১৯১০ সালে কয়েকজন ভূবিজ্ঞানী যে তত্ত্ব উত্থাপন করেছিলেন, তার কথা মনে প'ড়ে গেল।

তত্ত্বটি হ'ল ঐক্যতত্ত্ব। প্রায় কুড়ি কোটি বছর আগে পৃথিবীর সব ক'টা মহাদেশ নাকি এক ছিল। ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়ায় ক্রমশঃ এই ঐক্যে ভাঙন ধরে—বিভিন্ন মহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভাসতে ভাসতে আলাদা হয়ে যায়।

জলে নৌকা বা জাহাজের ভাসার মত মহাদেশের ভেসে চলাটা গাঁজাখুরী গল্প ব'লে মনে হতে পারে। পৃথিবীর জড়পদার্থের অন্তর্নিহিত কাঠিন্য সম্বন্ধে যাঁদের ভাসা-ভাসা জ্ঞানও আছে, ভাসমান মহাদেশ তাঁদের বুদ্ধিগ্রাহ্য হবে না।

কিন্তু তত্ত্বটি পুরোপুরি অলৌকিক বা অলীক নয়। আটলান্টিক মহাসাগরের অতলান্তিক জলের ব্যবধানের দু-পাশে আছে চারটি মহাদেশ। পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পূর্বে য়ুরোপ ও আফ্রিকা। দুই আমেরিকা এবং য়ুরোপ ও আফ্রিকা যোজক দিয়ে যুক্ত। পূর্ব মহাদেশ এসিয়া য়ুরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। পশ্চিমে আমেরিকা দুটির জুটি এবং পূর্বে এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ুরোপের যুক্ত রূপ, এই দুটি ভূভাগকে দু-ভাগ করেছে আটলান্টিক মহাসাগর। এই দুটি ভূভাগকে মেলালেই অস্ট্রেলিয়া এবং কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জমি জমাট বাঁধবে অখণ্ড ঐক্যে।

আটলান্টিক মাহাসাগরের দু-পাশের দুই উপকূলের রেখাকে অনুসরণ করলে মনে হয় যেন উপকূল দুটিকে মেলাতে গেলে খাঁজে খাঁজে মিলে যাবে তারা। তা'ছাড়া আটলান্টিকের দু-পাশে শিলাস্তরগুলির প্রকৃতি গঠনবিন্যাসেও ঐক্য আছে। মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে আফ্রিকা ও য়ুরোপের সঙ্গে মোটামুটি জুড়ে দেওয়া যেতে পারে।

ভাসমান মহাদেশের তত্ত্ব অনুযায়ী কুড়ি কোটি বছর আগে আটলান্টিক মহাসাগরের দু-পাশের ভূভাগ দুটি জোড়া ছিল। কালক্রমে জোট ভেঙে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা পশ্চিম দিকে ভেসে গেছে। ফলে ভূভাগ দুটির মাঝখানে যে গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে তা জলে ভরে আটলান্টিক মহাসাগরের উৎপত্তি হয়েছে। পশ্চিম দিকে ভেসে যাওয়ার সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে প্রচণ্ড রকম ঘষা লেগে ভাঁজ পড়েছে। এই ভাঁজগুলি রকি ও আন্দেজ পর্বতের আকার নিয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—ভেসে গেল কী করে। ভেসে যেতে হ'লে কোনও এক তরল পদার্থের ওপরে ভেসে থাকা দরকার। কী সে তরল পদার্থ? তা'ছাড়া দু-দুটো মহাদেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে প্রচণ্ড শক্তিরও প্রয়োজন। এই শক্তিই বা এল কোথা থেকে?

প্রশ্ন দুটির উত্তর দেবার চেষ্টা ভূতাত্ত্বিকরা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, পৃথিবীর তপ্ত কেন্দ্রের ওপরকার স্তর গলিত অবস্থায় ছিল। এই গলিত শিলাপুঞ্জের ওপরে ভাসমান ছিল মহাদেশগুলি। অত্যধিক তাপের প্রভাবে গলিত স্তরটিতে প্রচণ্ড আবর্তের সঞ্চার হয়েছিল। আবর্তের বেগে ঐক্যবদ্ধ মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হ'ল এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা পশ্চিম দিকে ভেসে চলে গেল।

কিন্তু আবর্তের বেগ যতই দুর্বার হোক না কেন, বিপুল আকার মহাদেশকে তা' ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তা'ছাড়া হাজার হাজার মাইল ধ'রে ভেসে চলতে হ'লে পৃথিবীর ভেতরটাকে শুধু তরল নয়, দুর্বল বলেও কল্পনা করতে হবে। অথচ ভাসতে গিয়ে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছে ব'লেও অনুমান করা হয়, নচেৎ পর্বতমালার সৃষ্টি সম্ভব হত না।

পৃথিবীতে অনেক পর্বতমালা আছে, যেগুলির সৃষ্টি, যে সময়ে মহাদেশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়েছে ব'লে ধরা হয়, তারও অনেক আগে হয়েছে। যদি মহাদেশগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে চলার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে ব'লে অনুমান করা হয়, কুড়ি কোটি বছরেরও আগে যে-সব পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে, তাদের উত্থানের মূলে অন্য কোনও কারণ আছে ব'লে ধ'রে নিতে হবে।

সম্প্রতি কয়েকজন ভূবিজ্ঞানী পরীক্ষা ক'রে বলেছেন যে, আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল পরস্পর অনুকূল নয়। মেলাবার চেষ্টা করলে তারা ঠিক মেলে না। যথেষ্ট গরমিল তাদের মধ্যে।

মহাদেশগুলি একদা এক ছিল কিনা এ বিষয়ে ভূবিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। বিশিষ্ট কয়েকজন বিজ্ঞানী এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তাঁদের গবেষণার ফলে পৃথিবীর স্থলভাগগুলি কদাপি ঐক্যবদ্ধ ছিল না ব'লেও যদি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়, তাতে কিছু এসে যাবে না। কারণ জল ও স্থল মিলিয়ে পৃথিবীব্যাপী এক অখণ্ড ঐক্য বিরাজ করছে। তা'ছাড়া জলে বা স্থলে যত ব্যবধান বা দুর্গমতা থাকুক না কেন, কোন কিছুই মানুষে মানুষে মেলার অন্তরায় নয়—অন্তরে অন্তরে সব মানুষই এক।